

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র • রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইংলন্ড্‌-গমন ও প্রবাসযাপনের (১৮৭৮ - ৮০) বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থে সংকলনের পূর্বে ভারতী পত্রিকার বৈশাখ ১২৮৬ - শ্রাবণ ১২৮৭ সংখ্যায় ইহার ধারাবাহিক প্রচার। কবির জীবনকালে এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত সারাংশ মাত্র, অনুরূপ-ভাবে সম্পাদিত 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র সারাংশ -সহ, ১৩৪৩ আশ্বিনে 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' গ্রন্থরূপে প্রচারিত হয়। বর্তমানে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র ন্যায় 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'ও প্রথম সংস্করণের অনুসরণে পুনর্মুদ্রিত হইল। পাশ্চাত্যভ্রমণ গ্রন্থের 'ভূমিকা' ও বর্তমান-গ্রন্থ-সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য গ্রন্থশেষে সংকলিত।

প্রথম প্রকাশ : ১২৮৮ : ১৮০৩ শক

'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী' -ভুক্ত পুনর্মুদ্রণ : ১৩১১

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ : পৌষ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ : ১৮৮২ শকাব্দ
পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৯৩ : ১৯০৮ শক

বিষয়সূচী

চিত্র

রবীন্দ্রনাথ। সতেরো বৎসর বয়সে

বিলাতে রবীন্দ্রনাথ



রবীন্দ্রনাথ। সতেরো বৎসর বয়সে

প্রথম প্রকাশের

ভূমিকা

বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল— কারণ, কয়েকটি ছাড়া বাকি পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই; বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে, আর কোনো উপকার হউক বা না হউক, একজন বাঙালি ইংলন্‌ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।

আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখামুখি এক-প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর-এক-প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়।

পূজনীয় ভারতীর সম্পাদক মহাশয় আমার পত্রের উত্তরে তাঁহার যে-সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও পুস্তকে নিবিষ্ট হইল। সকল বিষয়েরই দুই পক্ষ আছে। উভয় পক্ষই পাঠকদের দেখা আবশ্যক।

এই পুস্তক ছাপা হইবার সময় নানা কারণে আমি কোনোমতেই নিজে তদারক করিতে পারি নাই, এই নিমিত্ত ইহাতে ভুল আছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। এই অপরিহার্য ত্রুটি পাঠকেরা মার্জনা করিবেন।

গ্রন্থকার

উপহার

ভাই জ্যোতিদাদা,

ইংলন্‌ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।

স্নেহভাজন

রবি

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

প্রথম পত্র

বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা 'পুনা' স্টীমারে উঠলেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তট-রেখা মিলিয়ে গেল। চারি দিকের লোকের কোলাহল সহিতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখছি নে, আমার মনটা বড়োই কেমন নির্জীব অবসন্ন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দূরে হোক্‌গে—ওসব করুণরসাত্মক কথা লেখবার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই; আর লিখলেও, হয় তোমার চোখের জল থাকবে না, নয় তোমার ধৈর্য থাকবে না।

সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ। ২০শে থেকে ২৬শে পর্যন্ত যে ক'রে কাটিয়েছি তা আমিই জানি! 'সমুদ্রপীড়া' কাকে বলে অবিশ্যি জানো, কিন্তু কিরকম তা জানো না। আমি সেই ব্যামোয় পড়েছিলেম, সে কথা বিস্তারিত করে লিখলে পাষাণেরও চোখে জল আসবে। ৬টা দিন, মশায়, শয্যা থেকে উঠি নি। যে ঘরে থাকতেম সেটা অতি অন্ধকার, ছোটো; পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চারি দিকের জানলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অসূর্যম্পশ্যরূপ ও অবায়ুস্পর্শদেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র। প্রথম দিন সন্ধ্যে বেলায় আমাদের একজন সহযাত্রী আমাকে

জোর করে বিছানা থেকে উঠিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন। যখন উঠে দাঁড়ালেম তখন আমার মাথাটার ভিতর যেন একটা বিপর্যয় ব্যাপার বেধে গেল; মাথার ভিতর যা-কিছু আছে সবাই মিলে যেন মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করে দিলে; চোখে দেখতে পাই নে, পা চলে না, সর্বাঙ্গ টলমল করে। দু পা গিয়েই একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লেম। আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি করে জাহাজের 'ডেকে' অর্থাৎ ছাতে নিয়ে গেলেন। একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম। তখন অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে— সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত করতে করতে আমাদের জাহাজ একলা চলেছে, যেখানে চাই সেই দিকেই অন্ধকার, সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে— সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য। জাহাজ যখন চলে তখন তার দুই দিকে যেন আগুন ভেঙে পড়ে, অন্ধকার রাত্রে সে বড়ো সুন্দর দেখায়। একেই phosphorescence বলে।

সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেম না। ভয়ানক মাথা ঘুরতে লাগল। ধরাধরি করে আবার আমার ক্যাবিনে (ঘরে) এলেম। সেই-যে বিছানায় পড়লেম, ছ দিন আর এক মুহূর্তের জন্যও মাথা তুলি নি। আমাদের যে স্টুয়ার্ড্ ছিল (যাত্রীদের সেবার জন্য জাহাজে যেসব চাকর থাকে)—কারণ জানি নে— আমার উপর তার কেমন বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দিনের মধ্যে যখন-তখন সে আমার জন্যে খাবার নিয়ে উপস্থিত করত; না খেলে কোনো মতেই ছাড়ত না। সে বলত, না খেলে আমি ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়ব (weak as a rat)। সে বলত সে আমার জন্যে সব কাজ করতে পারে। আমি তাকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিতেম, এবং জাহাজ

ছেড়ে আসবার সময় সাধুবাদের চেয়ে আরও কিঞ্চিৎ সারবান পদার্থ দিয়েছিলেম।

ছ দিনের পর আমরা যখন এডেনের কাছাকাছি পৌঁছলেম, তখন সমুদ্র কিছু শান্ত হল। সে দিন আমার স্টুয়ার্ড্ এসে ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াবার জন্যে আমাকে বারবার অনুরোধ করতে লাগল। আমি তার পরামর্শ শুনে বিছানা থেকে তো উঠলেম, উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছি। মাথাটা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভালোরকম বনে না; চুরি-করা কাপড়ের মতো শরীরটা যেন আমার ঠিক গায়ে লাগছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে পড়লেম। অনেক দিনের পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম। দুপর বেলা দেখি একটা ছোটো নৌকা সেই সমুদ্র দিয়ে চলেছে। চার দিকে অনেক দূর পর্যন্ত আর ডাঙা নেই, জাহাজ-সুদ্ধ লোক অবাক। তারা আমাদের স্টীমারকে ডাকতে আরম্ভ করলে; জাহাজ থামল। তারা একটি অতি ছোটো নৌকায় করে কতকগুলি লোক জাহাজে পাঠিয়ে দিলে। এরা সকলে আরব-দেশীয়, এডেন থেকে মস্কটে যাচ্ছে। পথের মধ্যে দিক্‌ভ্রম হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে যা জলের পিপে ছিল তা ভেঙে গিয়ে জল সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ যাত্রী অনেক। আমাদের জাহাজের লোকেরা তাদের জল দিলে। একটি ম্যাপ খুলে কোন্ দিকে ও কত দূরে মস্কট তাদের দেখিয়ে দিলে, তারা আবার চলতে লাগল। সে নৌকো যে মস্কট পর্যন্ত পৌঁছবে, তাতে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল।

২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের সম্মুখে সব পাহাড় পর্বত উঠেছে। অতি সুন্দর পরিষ্কার প্রভাত; সূর্য সবে মাত্র উঠেছে, সমুদ্র অতিশয় শান্ত। দূর

থেকে সেই পর্বতময় ভূভাগের প্রভাতদৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কী বলব। পর্বতের উপর রঙিন মেঘগুলি এমন নত হয়ে পড়েছে যে মনে হয় যেন, অপরিমিত সূর্যকিরণ পান করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্বতের উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আয়নার মতো পরিষ্কার শান্ত সমুদ্রের উপর ছোটো ছোটো পাল-তোলা নৌকোগুলি আবার কেমন ছবির মতো দেখাচ্ছে!

এডেনে পৌঁছে বাড়িতে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেম কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি যে, এই ক'দিন নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উল্‌টোপাল্‌টা হয়ে গেছে, বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘটেছে— কী করে লিখব ভালো মনে আসছে না। ভাবগুলো যেন মাকড়সার জালের মতো, ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে। কিসের পর কী লিখব তার একটা ভালো রকম বন্দোবস্ত করতে পারছি নে। এই অবস্থায় লিখতে আরম্ভ করলেম, এমন বিপদে পড়ে তোমাকে যে লিখতে পারি নি তাতে তোমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নেই।

দেখো, সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হয়েছে। কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলে না। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান্ বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তার কারণ আছে। আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতাম তখন দেখতেম, দূর দিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে; কল্পনায় মনে করতেম যে, একবার যদি ঐ দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি— ঐ দিগন্তের যবনিকা উঠাতে পারি— অমনি আমার সুমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে। ঐ দিগন্তের পর যে কী আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকত, তখন মনে

হত না ঐ দিগন্তের পরে আর-এক দিগন্ত আসবে। কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডীর মধ্যে বসে আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সংকীর্ণ যে মন কেমন তৃপ্ত হয় না। কিন্তু দেখো, এ কথা বড়ো গোপনে রাখা উচিত। বাল্মীকি থেকে বায়রন্ পর্যন্ত সকলেরই যদি এই সমুদ্র দেখে ভাব লেগে থাকে, তবে আমার না লাগলে দশজনে যে হেসে উঠবে; গ্যালিলিওর সময়ে এ কথা বললে হয়তো আমাকে কয়েদ যেতে হত। এত কবি সমুদ্রের স্তুতিবাদ করেছেন যে, আজ আমার এই নিন্দায় তাঁর বোধ হয় বড়ো একটা গায়ে লাগবে না। যখন তরঙ্গ ওঠে তখন বোধ করি সমুদ্র বেশ দেখায়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রে তরঙ্গ উঠলেই আমার এমন মাথা ঘুরতে থাকে যে আমার দেখাশুনো সব ঘুরে যায়।

আমি যখন ঘর থেকে বেরোতে আরম্ভ করলেম তখন জাহাজের যাত্রীদের উপর আমার নজর পড়ল ও আমার উপর জাহাজের যাত্রীদের নজর পড়ল। আমি স্বভাবতই 'লেডি'-জাতিকে বড়ো ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁষতে গেলে এত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা যে, চাণক্য পণ্ডিত থাকলে 'লেডি'দের কাছ থেকে দশ সহস্র হস্ত দূরে থাকতে পরামর্শ দিতেন। এক তো মনোরাজ্যে নানাপ্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা— তা ছাড়া সর্বদাই ভয় হয় পাছে কী কথা বলতে কী কথা বলে ফেলি, আর আমাদের অসহিষ্ণু কোমলস্বভাব লেডি তাঁদের আদব-কায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে মূর্ছা যান, আর দশ দিক থেকে দশটা জেন্ট্‌ল্‌ম্যান একেবারে হাঁ হাঁ করে এসে পড়েন। পাছে তাঁদের

গাউনের অরণ্যের মধ্যে পথহারা হয়ে একেবারে ত্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই, পাছে রাস্তায় পা ফেলতে তাঁদের গাউনের উপর পা ফেলি— পাছে আহারের সময় তাঁদের মাংস কেটে দিতে হয়, পাছে মুরগীর মাংস কাটতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে বসি—এই রকম সাত পাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের কাছ থেকে অতি দূরে থাকতেম। আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না, কিন্তু জেণ্ট্‌ল্‌ম্যানেরা সর্বদা খুঁৎখুঁৎ করতেন যে, তার মধ্যে অল্পবয়স্কা বা সুশ্রী এক-জনও ছিল না। একজন এত লম্বা, তাঁর ঠোঁট এত বন্ধুর, তাঁর মুখে এত দাগ, তাঁর দাঁতের এত দৈর্ঘ্য, তাঁর আহারের পরিমাণ এত অপরিমিত যে, তেমন দুটো পুরুষ সচরাচর খুঁজলে পাওয়া যায় না। একজন আছেন তাঁকে জ্যামিতিশাস্ত্রের রেখা (length without breadth) বলা যেতে পারে। তাঁর শরীর লম্বা, মুখ লম্বা, হাত লম্বা, পা লম্বা, চোখ ছোটো, নাক ছোটো, মাথা ছোটো। একজনের দাঁতের সম্পূর্ণরূপে অভাব ছিল, কিন্তু আহারকালে দন্তবান ব্যক্তিরা তাঁর কাছে পরাস্ত মানত। জাহাজে কেবল একজন যুবতী আছেন মাত্র, কিন্তু জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান্‌দের পোড়া অদৃষ্ট-বশতঃ যাঁরা অধিকবয়স্কা ছিলেন তাঁরাই যৌবনের মুখোষ প'রে নানাপ্রকার হাবভাব ক'রে পুরুষদের হৃদয়রাজ্যে একটা গোলমাল বাধাবার জন্যে যথাসাধ্য বলপ্রয়োগ করতেন, আর যুবতীটি ছিব্‌লামির বয়স গিয়েছে মনে ক'রে ঘোমটা (veil) টেনে এক প্রান্তে সারাদিন বাইবেল পড়তেন। পুরুষদের মন লুটপাট করবার জন্যে এই দিদিমার বয়সী লেডিগণ যে রকম প্রাণপণে যত্ন করতেন তা দেখলে তোমার মায়া হত। পুরুষের কাছে তাঁদের সেই অতি-মধুর ললিতগলিত ভাবের হাসি, অতি ঢলঢল ভাবের অঙ্গভঙ্গী দেখে আমার প্রচুর পরিমাণে হাস্য ও করুণ রসের আবির্ভাব হত।

কাপড়ে-চোপড়ে রঙে-চঙে তাঁরা তাঁদের ভাঙাচুরো রূপকে কোনো প্রকারে ঠেকো দিয়ে রেখেছেন মাত্র।

পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। ব—মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনি লোক বড়ো ভালো। এমন ধাঁচের লোক বড়ো সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর কথা অনর্গল, হাসি অজস্র, আহার অপরিমিত। সকলের সঙ্গেই তাঁর আলাপ, সকলের সঙ্গেই তিনি হাসি-তামাসা করে বেড়ান। তাঁর একটা গুণ আছে, তিনি কখনও বিবেচনা ক'রে, ভেবে-চিন্তে, মেজে-ঘ'ষে কথা কন না; ঠাট্টা করেন, সকল সময়ে তার মানে না থাকুক তিনি নিজে হেসে আকুল হন। তিনি তাঁর বয়সের ও পদমানের গাম্ভীর্য বুঝে হিসাব করে কথা কন না, মেপেজুকে হাসেন না ও দু দিক বজায় রেখে মত প্রকাশ করেন না—এই-সকল কারণে তাঁকে আমার বড়ো ভালো লাগত। তাঁর মনটা এখনও হামাগুড়ি দিচ্ছে— কত প্রকার যে ছেলেমানুষি করেন তার ঠিক নেই; ঘোরতর বিজ্ঞতার আতিশয্যে মুখটা অন্ধকার করে তাঁকে মোটা গলায় কথা কইতে কখনও শুনি নি। বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি ও বালকত্বের শাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব একত্রে দেখলে আমার বড়ো ভালো লাগে। তাঁর একটা স্বভাব আছে যে কাকেও তিনি তার পিতা-মাতা-প্রদত্ত নাম ধরে ডাকেন না— তিনি নিজে স্বতন্ত্র নামকরণ করেন। আমাকে তিনি 'অবতার' বলতেন, Gregory সাহেবকে 'গড়গড়ি' বলতেন, জাহাজের আর-এক যাত্রীকে 'রুহিমৎস্য' বলে ডাকতেন— সে বেচারির অপরাধ কী তা জানো? সাধারণ মানুষদের চেয়ে তার ঘাড়ের দিকটা কিছু খাটো ছিল, তার মাথা ও শরীরের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র যোজকপদার্থ ছিল না বললেও হয়। এই জন্যে ব—মহাশয় তাকে মৎস্যশ্রেণীভুক্ত করেছিলেন।

কিন্তু আমি যে কেন অবতার-শ্রেণীর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেম তার কারণ-সম্বন্ধে নির্দেশ করা যায় না। খাবার সময়ে তাঁর এক গল্প ছিল যে, একজন নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল, তার অপরিমিত আহার দেখে তার পাশের এক জন ভদ্রলোক বললেন —'মহাশয়, পরের খরচে আহার কচ্ছেন অতএব বড়ো ভাবনার বিষয় নেই বটে, কিন্তু মনে রাখবেন পেটটি আপনার।' কিন্তু ব—মহাশয় নিজে সকল সময় সেইটি মনে রাখেন না।

আমাদের জাহাজের T—মহাশয় কিছু নূতন রকমের লোক। তিনি ঘোরতর ফিলজফর মানুষ। তাঁকে কখনো চলিত ভাষায় কথা কইতে শুনি নি। তিনি কথা কইতেন না, বক্তৃতা দিতেন। এক দিন আমরা দুই চার জনে মিলে জাহাজের ছাতে দুই দণ্ড আমোদ-প্রমোদ করছিলেম, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ব—মহাশয় তাঁকে বললেন 'কেমন সুন্দর তারা উঠেছে'। এই আমাদের ফিলজফর মহাশয় তারার সঙ্গে মনুষ্যজীবনের সঙ্গে একটা উৎকট সম্বন্ধ বাধিয়ে দিয়ে বক্তৃতা শুরু কল্লেন— আমরা বেচারিরা 'মূর্খেতে চাহিয়া থাকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া' রইলেম। গল্পসল্প ঘুচে গেল, গানবাজনা থেমে গেল, জন দুয়েক ঢুলতে আরম্ভ করলেন, জন দুয়েক হাই তুলতে আরম্ভ করলেন— সমস্ত মাটি হয়ে গেল।

আমাদের জাহাজে একটি আস্ত জনবুল ছিলেন। তাঁর তাল-বৃক্ষের মতো শরীর, ঝাঁটার মতো গোঁফ, সজারুর কাঁটার মতো চুল, হাঁড়ির মতো মুখ, মাছের চোখের মতো ভাববিহীন ম্যাড়্‌মেড়ে চোক, তাঁকে দেখলেই আমার গা কেমন করত, আমি পাঁচ হাত তফাতে সরে যেতেম। এক-এক জন কোনো অপরাধ না করলেও তার মুখশ্রী যেন সর্বদা অপরাধ করতে থাকে। প্রত্যহ সকালে উঠেই শুনতে পেতেম তিনি ইংরিজি ফ্রেঞ্চ্ হিন্দুস্থানি প্রভৃতি যত ভাষা

জানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের সমস্ত চাকর-বাকরদের অজস্র গাল দিতে আরম্ভ করেছেন ও দশ দিকে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে কখনো হাসতে দেখি নি ; কারও সঙ্গে কথা নেই বার্তা নেই, আপনার ক্যাবিনে গোঁ হয়ে বসে আছেন। কোনো-কোনো দিন 'ডেকে' বেড়াতে আসতেন, বেড়াতে বেড়াতে যার দিকে একবার কৃপাকটাক্ষে নেত্রপাত করতেন তাকে যেন পিঁপড়াটির মতো মনে করতেন।

প্রত্যহ খাবার সময়ে ঠিক আমার পাশেই B— বসতেন। তিনি একটি ইয়ুরাসীয়। কিন্তু তিনি ইংরাজের মতো গান গাইতে, শিষ দিতে, পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়াতে সম্পূর্ণরূপে শিখেছেন। তিনি আমাকে বড়োই অনুগ্রহের চোখে দেখতেন। এক দিন এসে মহা গম্ভীর স্বরে বললেন— 'Young man, তুমি Oxford-এ যাচ্ছ? Oxford University বড়ো ভালো বিদ্যালয়।' এ কথা তিনি না বললে Oxford University যেন মাটি হয়ে যেত। আমি একদিন ট্রেঞ্চ সাহেবের '*Proverbs and Their Lessons*' বইখানি পড়ছিলেম, তিনি এসে বইটি নিয়ে শিষ দিতে দিতে দু-চার পাত উল্‌টিয়ে-পাল্‌টিয়ে বললেন 'হাঁ— ভালো বই বটে'। ট্রেঞ্চের শুভাদৃষ্ট ! আমার উপর তাঁর কিছু মুরব্বিয়ানা ব্যবহার ছিল।

এডেন থেকে সুয়েজে যেতে দিন পাঁচেক লেগেছিল। যারা ব্রিন্দিশি-পথ দিয়ে ইংলন্‌ডে যায় তাদের জাহাজ থেকে নেমে সুয়েজে রেলওয়ের গাড়িতে উঠে অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়াতে যেতে হয় ; অ্যালেক্‌-জান্দ্রিয়ার বন্দরে তাদের জন্যে একটা স্টীমার অপেক্ষা করে— সেই স্টীমারে চ'ড়ে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইটালিতে পৌঁছিতে হয়। আমরা overland যাত্রী, সুতরাং আমাদের সুয়েজে নাবতে হল।

আমরা তিনজন বাঙালি ও একজন ইংরাজ একখানি আরব নৌকা ভাড়া করলেম। মানুষের 'divine' মুখশ্রী কতদূর পশুত্বের দিকে নাবতে পারে, তা সেই নৌকার মাজিটার মুখ দেখলে জানতে পারতে। তার চোক দুটো যেন বাঘের মতো, কালো কুচ্‌কুচে রঙ, কপাল নিচু, ঠোঁট পুরু, সবসুদ্ধ মুখের ভাব অতি ভয়ানক। অন্যান্য নৌকার সঙ্গে দরে বনল না, সে একটু কম দামে নিয়ে যেতে রাজি হল। ব—মহাশয় তো সে নৌকায় বড়ো সহজে যেতে রাজি নন; তিনি বললেন আরবদের বিশ্বাস করতে নেই, ওরা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে। তিনি সুয়েজের দুই-একটা ভয়ানক ভয়ানক অরাজকতার গল্প করলেন। কিন্তু যা হোক আমরা সেই নৌকায় তো উঠলেম। মাজিরা ভাঙা ভাঙা ইংরিজি কয় ও অল্প স্বল্প ইংরিজি বুঝতে পারে। আমরা তো কতক দূর নির্বিবাদে গেলেম। আমাদের ইংরাজ যাত্রীটির সুয়েজের পোস্ট্‌-আফিসে নাববার দরকার ছিল। পোস্ট্‌-আফিস অনেক দূর এবং যেতে অনেক বিলম্ব হবে, তাই মাঝিটি একটু আপত্তি করলে; কিন্তু শীঘ্রই সে আপত্তি ভঞ্জন হল। তার পরে আবার কিছু দূরে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে 'পোস্ট্‌-অফিসে যেতে হবে কি? সে দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া অসম্ভব'— আমাদের রুক্ষস্বভাব সাহেবটি মহা ক্ষাপা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন 'your grandmother'। এই তো আমাদের মাঝি রুখে উঠলেন, 'What? mother? mother? what mother? dont say mother.' আমরা মনে করলুম সে সাহেবটাকে ধরে বুঝি জলেই ফেলে দিলে! আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'What did say?' (অর্থাৎ, কী বললি?) আমরা রয়েছি ব'লেই বোধ হয় সাহেব তাঁর রোখ ছাড়লেন না। আবার বললেন 'your grandmother'। এই তো আর রক্ষা

নেই। মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল। সাহেব গতিক ভালো নয় দেখে নরম হয়ে বললেন, 'You don't seem to understand what I say!' অর্থাৎ তিনি তখন grandmother বলাটা যে গালি নয় তাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত। তখন সে মাঝিটা ইংরাজি ভাষা ছেড়ে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বস্— চুপ!' সাহেব থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, আর তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল না! আবার খানিক দূর গিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতদূর বাকি আছে?' মাঝি অগ্নিশর্মা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'Two shillings give, ask what distance!' এই অপূর্ব ইংরাজির ভাষান্তর হচ্ছে: সবে দু শিলিং মাত্র ভাড়া দেবেন, তা আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কতদূর! আমরা এই রকম বুঝে গেলেম যে, দু শিলিং ভাড়া দিলে সুয়েজ রাজ্যে এই রকম প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা আইনে নেই বুঝি। মাঝিটা যখন আমাদের এই রকম ধমক দিচ্ছে তখন অন্য অন্য দাঁড়িদের ভারী আমোদ বোধ হচ্ছে, তারা তো পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ করলে। মাঝি মহাশয়ের বিষম বদ মেজাজ দেখে তাদের হাসি সামলানো দায় হয়ে উঠেছিল। এক দিকে মাঝি ধমকাচ্ছে, এক দিকে দাঁড়িগুলো হাসি জুড়ে দিয়েছে, আমরা নিরুপায় রাগে ও লজ্জায় পুড়ছিলেম। মাঝিটির উপর প্রতিহিংসা তোলবার আর কোনো উপায় না দেখে আমরাও তিন জনে মিলে হাসি জুড়ে দিলেম— ও মনে মনে একটা সান্ত্বনা পেলেম যে 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে'। এ রকম সুবুদ্ধি অনেক স্থলে দায়ে পড়ে খাটাতে হয়। মানে মানে সুয়েজ শহরে গিয়ে তো পৌঁছিলেম। আমার চক্ষে সুয়েজ শহরের নূতনত্ব এইটুকু লাগল যে, এর চেয়ে খারাপ শহর আমি আর দেখি নি। সুয়েজ শহর সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার অধিকার নাই, কারণ

আমি সুয়েজের আদ মাইল জায়গার বেশি আর দেখি নি। শহরের চারি দিকে একবার প্রদক্ষিণ করবার বাসনা ছিল, কিন্তু আমার সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা পূর্বে সুয়েজ দেখেছিলেন তাঁরা বললেন, 'এ পরিশ্রমে শ্রান্তি ও বিরক্তি ছাড়া অন্য কোনো ফললাভের সম্ভাবনা নেই।' তাতেও আমি নিরুৎসাহ হই নি, কিন্তু শুনলেম গাধায় চড়ে বেড়ানো ছাড়া শহরে বেড়াবার আর কোনো উপায় নেই। শুনে শহরে বেড়াবার দিকে টান আমার অনেকটা কমে গেল। তার পর শোনা গেল এ দেশের গাধাদের সঙ্গে চালকদের সকল সময়ে মতের ঐক্য হয় না, চালক যে দিকে যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন গাধাটির সকল সময়ে সে দিকে যাবার ইচ্ছে হয় না— তাঁরও একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছে আছে— এই জন্যে সময়ে সময়ে দুই ইচ্ছের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রায় দেখা যায় গাধার ইচ্ছে পরিণামে জয়ী হয়। সুয়েজে এক প্রকার জঘন্য চোকের ব্যামোর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব— রাস্তায় অমন শত শত লোকের চোখ ঐ রকম রোগগ্রস্ত দেখতে পাবে। এখানকার মাছিরা ঐ রোগ চারি দিকে বিতরণ করে বেড়ায়। রোগগ্রস্ত চোখ থেকে ঐ রোগের বীজ আহরণ করে তারা অরুগ্ন চোখে গিয়ে বসে, এই রকমে চার দিকে ঐ রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

সুয়েজে আমরা রেলোয়ে উঠলেম। এ রেলগাড়ির অনেক প্রকার রোগ আছে। প্রথমতঃ শোবার কোনো বন্দোবস্ত নেই, কেননা বসবার জায়গাগুলি অংশে অংশে বিভক্ত। দ্বিতীয়তঃ এমন গজগামিনী রেলগাড়ি সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না। সমস্ত রাত্রিই গাড়ি চলেছে; দিনের বেলা যখন জেগে উঠলেম তখন দেখলেম ধুলোয় আমাদের কেবল গোর হয় নি, আর সব হয়েছে। চুলে হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জমেছে যে

মাথায় অনায়াসে ধান চাষ করা যায়। এই রকম ধুলোমাখা সন্ন্যাসীর বেশে আমরা অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম। রেলের লাইনের ছ পারে সবুজ শস্যক্ষেত্র। জায়গায় জায়গায় খেজুরের গাছে থোলো থোলো খেজুর ফ'লে রয়েছে। মাঠের মাঝে মাঝে কুয়ো। মাঝে মাঝে ছুই-একটা কোঠাবাড়ি— বাড়িগুলো চৌকোনা, থাম নেই, বারান্দা নেই—সমস্তটাই দেয়ালের মতো, সেই দেয়ালের মধ্যে মধ্যে ছুই-একটা জানলা। এই-সকল কারণে বাড়ি-গুলোর যেন শ্রী নেই। যা হোক আমি আগে আফ্রিকার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে রকম অনুর্বর মরুভূমি মনে করে রেখেছিলুম, চার দিক দেখে তা কিছুই মনে হল না। বরং চার দিককার সেই হরিৎক্ষেত্রের উপর খেজুরকুঞ্জের মধ্যে প্রভাতটি আমার অতি চমৎকার লেগে-ছিল। অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়া বন্দরে আমাদের জন্যে 'মঙ্গোলিয়া' স্টীমার অপেক্ষা করছিল। এইবার আমরা ভূমধ্যসাগরের বক্ষে আরোহণ করলেম, আমার একটু-একটু শীত-শীত করতে লাগল। জাহাজে গিয়ে খুব ভালো করে স্নান করলেম, আমার তো হাড়ে হাড়ে ধুলো প্রবেশ করেছিল। স্নান করবার পর অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়া শহর দেখতে গেলেম। জাহাজ থেকে ডাঙা পর্যন্ত যাবার জন্যে একটা নৌকা ভাড়া করলেম। এখানকার একটা-একটা মাঝি সার উইলিয়ম জোন্সের দ্বিতীয় সংস্করণ বললেই হয়। তারা গ্রীক ইটালিয়ান ফ্রেঞ্চ্ ইংরিজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলনসই রকম কথা কইতে পারে। শুনলেম ফ্রেঞ্চ্ ভাষাই এখানকার সাধারণ ভাষা। রাস্তা ঘাটের নাম, সাইন্‌বোর্ডে দোকানগুলির আত্মপরিচয়, অধিকাংশই ফরাসী ভাষায় লেখা। অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়া শহরটি সমৃদ্ধিশালী মনে হল। এখানে যে কত জাতের লোক ও কত জাতের দোকান-বাজার আছে তার ঠিকানা নেই। রাস্তাগুলি পাথর দিয়ে

বাঁধানো— তাতে বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু গাড়ির শব্দ বড়ো বেশি রকম হয়। খুব বড়ো বড়ো বাড়ি— বড়ো বড়ো দোকান— শহরটি খুব জমকালো বটে। অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়ার বন্দর খুব প্রকাণ্ড। অসংখ্য অসংখ্য জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। ইয়ুরোপীয়, মুসলমান, সকল প্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে; কেবল দুঃখের বিষয় হিন্দুদের জাহাজ নেই।

চার পাঁচ দিনে আমরা ইটালিতে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন রাত্রি একটা-দুটো হবে। গরম বিছানা ত্যাগ ক'রে জিনিসপত্র নিয়ে আমরা জাহাজের ছাতে গিয়ে উঠলেম। জ্যোৎস্না রাত্রি, খুব শীত; আমার গায়ে বড়ো-একটা গরম কাপড় ছিল না, তাই ভারী শীত কচ্ছিল। আমাদের সুমুখে নিস্তব্ধ শহর, বাড়িগুলির জানেলা দরজা সমস্ত বন্ধ— সমস্ত নিদ্রামগ্ন। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে ভারী গোল পড়ে গেল— কখনো শুনি ট্রেন পাওয়া যাবে, কখনো শুনি পাওয়া যাবে না। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাওয়া যায় না, জাহাজে থাকব কি বেরোব কিছুই স্থির নেই। একজন Italian Officer এসে আমাদের গুনতে আরম্ভ করলে— কিন্তু কেন গুনতে আরম্ভ করলে তা ভেবে পাওয়া গেল না। জাহাজের মধ্যে এই রকম একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হল যে, এই গণনার সঙ্গে আর আমাদের ট্রেনে চড়ার সঙ্গে একটা বিশেষ যোগ আছে। কিন্তু সে রাত্রে মূলেই ট্রেন পাওয়া গেল না। শোনা গেল, তার পর দিন বেলা তিনটের আগে ট্রেন পাওয়া যাবে না। যাত্রীরা মহা বিরক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে সে রাত্রে ব্রিন্দিশির হোটেলে আশ্রয় নিতে হল।

এই তো প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়ল। জানোই তো আমি কিরকম কাল্পনিক, মনে করেছিলেম য়ুরোপে পৌঁছিয়েই

কী-এক অপূর্ব দৃশ্য চোখের সুমুখে খুলে যাবে! সে যে কী তা কল্পনাতেই থাকে, কথায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি কল্পনার সঙ্গে সত্যরাজ্যের প্রায় বনে না। আমার স্বভাবদোষে অনেক জিনিস ভালো করে ভোগ করতে পারি নে। কোনো নূতন দেশে আসবার আগেই আমি তাকে এমন নূতনতর মনে করে রাখি যে, এসে আর তা নূতন বলে মনেই হয় না; কোনো মহান্ দৃশ্য দেখবার আগেই আমি তাকে এমন মহান্-তর মনে করে রাখি যে, তা দেখে আর মহান বলে মনে হয় না। ইউরোপ আমার তেমন নতুন মনে হয় নি শুনে সকলেই অবাক্।

আমরা রাত্রি তিনটের সময় ব্রিন্দিশির হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। সকালে একটা আধ-মরা ঘোড়া ও আধ-ভাঙা গাড়ি চড়ে শহর দেখতে বের হলেম। সারথির সঙ্গে আর গাড়ি-ঘোড়ার সঙ্গে এমন অসামঞ্জস্য যে কী বলব! সারথির বয়স চোদ্দ হবে, কিন্তু ঘোড়াটির বয়স পঞ্চাশ হবে— আর গাড়িটি পৌরাণিক যুগের মনে হল। ছোটোখাটো শহর যেমন হয়ে থাকে ব্রিন্দিশিও তাই। কতকগুলি কোঠাবাড়ি, দোকান বাজার, রাস্তাঘাট আছে; হাঁ করে দেখবার জিনিস একটিও নেই। ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করে ফিরছে, দু-চার জন লোক মদের দোকানে বসে গল্প-গুজব করছে, দু-চার জন রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে হাসি-তামাসা করছে, লোক-জনেরা অতি নিশ্চিন্তমুখে গজেন্দ্রগমনে গমন করছে— যেন কারও কোনো কাজ নেই, কারও কোনো ভাবনা নেই— যেন শহর-সুদ্ধ ছুটি। রাস্তায় বড়ো গাড়িঘোড়ার সমারোহ নেই, লোকজনের সমাগম নেই। আমরা খানিক দূর যেতেই রাস্তা থেকে একজন ছোকরা আমাদের গাড়ি থামিয়ে হাতে একটা তরমুজ নিয়ে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বসল। ব—মহাশয় বললেন, 'বিনা আয়াসে

এঁর কিছু রোজগার করবার বাসনা আছে।' তিনি এসে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে মাঝে মাঝে আমাদের দেখিয়ে দিতে লাগলেন, ঐটে চর্চ্, ঐটে বাগান, ঐটে মাঠ ইত্যাদি। তাতে যে আমাদের বিশেষ কিছু উপকার হয়েছিল তা নয়— তাঁর টীকাতে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধি হয় নি আর তাঁর টীকা না হলেও আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের ব্যাঘাত হত না। তাঁকে কেউ আমাদের গাড়িতে উঠতে বলে নি, কেউ তাঁকে কোনো বিষয় জিজ্ঞাসাও করে নি, কিন্তু তবু এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্যে তাঁর যাচ্ঞা পূর্ণ করতে হল। তারা আমাদের একটা ফলের বাগানে নিয়ে গেল। সেখানে যে কত প্রকার ফলের গাছ তার সংখ্যা নেই। চারি দিকে আঙুরে আঙুরে আচ্ছন্ন। থোলো থোলো আঙুর ফলে রয়েছে। দু রকম আঙুর আছে— কালো আর শাদা। তার মধ্যে কালোগুলিই আমার বেশি মিষ্টি লাগল। বড়ো বড়ো গাছে আপেল পিচ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ধরে আছে। এক জন বুড়ি (বোধ হয় উদ্যান-পালিকা) কতকগুলি ফল ফুল নিয়ে উপস্থিত করলে, আমরা সে দিকে বড়ো নজর করলেম না। কিন্তু ফল বিক্রয় করবার উপায় সে বিলক্ষণ জানে। আমরা ইতস্ততঃ বেড়াচ্ছি এমন সময়ে দেখি একটি সুন্দরী মেয়ে কতকগুলি ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সুমুখে হাজির হল, তখন আর অগ্রাহ্য করবার সাধ্য রইল না।

ইটালির মেয়েদের বড়ো সুন্দর দেখতে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রঙ, কালো কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন অতি চমৎকার। আমরা রাস্তায় ঘাটে কেবল ছোটোলোকদের মেয়েদের দেখেছি মাত্র, কিন্তু তাদেরই এমন ভালো দেখতে যে কী বলব!

তিনটের ট্রেনে আমরা ব্রিন্দিশি ছাড়লেম। রেলোয়ের পথের দু ধারে আঙুরের ক্ষেত্র, সে চমৎকার দেখতে। চার দিকের দৃশ্য এমন সুন্দর যে কী বলব। পর্বত নদী হ্রদ কুটির ক্ষেত্র ছোটো ছোটো গ্রাম প্রভৃতি যত-কিছু কবির স্বপ্নের ধন সমস্ত চারি দিকে শোভা পাচ্ছে। গাছপালার মধ্যে থেকে যখন কোনো-একটি দূরস্থ নগর— তার প্রাসাদচূড়া, তার চর্চের শিখর, তার ছবির মতো বাড়িগুলি আস্তে আস্তে চোখে পড়ে তখন বড়ো ভালো লাগে। এক-একটি দৃশ্য আমার এত ভালো লেগেছিল যে তা বর্ণনা করতে আমার ইচ্ছে করছে না। সন্ধ্যে বেলায় একটি পাহাড়ের নীচে অতি সুন্দর একটি হ্রদ দেখেছিলেম, তা আর আমি ভুলতে পারব না। তার চারি দিকে গাছপালা, সন্ধ্যার ছায়া জলে পড়েছে। সে অতি সুন্দর, তা আমি বর্ণনা করতে চাই নে।

রেলোয়ে করে যেতে যেতে আমরা Mont Cenisএর বিখ্যাত tunnel দেখলেম। এই পর্বতের এ পাশ থেকে ফরাসীরা, ও পাশ থেকে ইটালিয়নরা এক সঙ্গে খুদতে আরম্ভ করে; কয়েক বৎসর খুদতে খুদতে দুই যন্ত্রীদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখা-সমুখী উপস্থিত হয়। এই গুহা অতিক্রম করতে রেলগাড়ির ঠিক আধ ঘণ্টা লাগল। সে অন্ধকারে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠছিলেম। এখানকার রেলগাড়ির মধ্যে দিনরাত আলো জ্বালাই আছে; কেননা, এক-এক স্থানে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর এক-একটা পর্বতগুহা ভেদ করতে হয়— সুতরাং দিনের আলো খুব অল্পক্ষণ পাওয়া যায়। ইটালি থেকে ফ্রান্স্ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা— নির্ঝর নদী পর্বত গ্রাম হ্রদ দেখতে দেখতে আমরা পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেম। এই রাস্তাটুকু আমরা যেন একটি কাব্য পড়তে পড়তে গিয়েছিলেম।

সকাল বেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছলেম। কী জমকালো শহর! সেই অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পড়লে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরিব লোক নেই। আমার মনে হল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কী আবশ্যক! একটা হোটেলে গেলেম, তার সমস্ত এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যে, ঢিলে কাপড় পরে যেমন সোয়াস্তি হয় না সে হোটেলে থাকতে গেলেও আমার বোধ হয় তেমনি অসোয়াস্তি হয়। একটা ঘরের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে যাই তার ঠিক নেই। স্মরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জনকোলাহল প্রভৃতি দেখে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। প্যারিসে পৌঁছিয়েই আমরা একটা 'টার্কিশ বাথে' গেলেম। প্রথমতঃ আমরা একটা খুব গরম ঘরে গিয়ে বসলেম। সে ঘরে অনেক ক্ষণ থাকতে থাকতে কারও কারও ঘাম বেরোতে লাগল; কিন্তু আমার তো বেরোল না, আমাকে তার চেয়ে আর-একটা গরম ঘরে নিয়ে গেল। সে ঘরটা আগুনের মতো। চোক মেলে থাকলে চোক জ্বালা করতে থাকে, মিনিট কতক থেকে সেখানে আর থাকতে পারলেম না, সেখান থেকে বেরিয়ে আমার খুব ঘাম হতে লাগল। তার পরে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাকে শুইয়ে দিলে, তার পরে ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্বাঙ্গ ডলতে লাগল। তার সর্বাঙ্গ খোলা, এমন মাংসপেশল চমৎকার শরীর আমি আর কখনো দেখি নি। ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ। আমি মনে মনে ভাবলেম, ক্ষীণকায় এই মশকটিকে দলন করার জন্যে এমন প্রকাণ্ড কামানের কোনো আবশ্যক ছিল না। সে আমাকে দেখে বললে— আমার শরীর বেশ লম্বা আছে, এখন পাশের দিকে বাড়লে আমি

একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব। আধ ঘণ্টা ধরে সে আমার সর্বাঙ্গ অবিশ্রান্ত দলন করলে; ভূমিষ্ঠকাল থেকে আমি যত ধুলো মেখেছি, আমার শরীর থেকে সব যেন উঠে গেল। শরীরটিকে যথেষ্টরূপে দলিত করে আমাকে আর-একটি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে গরম জল দিয়ে, সাবান দিয়ে, স্পঞ্জ দিয়ে শরীরটা বিলক্ষণ করে পরিষ্কার করলে। পরিষ্করণপর্ব শেষ হলে আর-একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বড়ো পিচকিরি করে গায়ে গরম জল ঢালতে লাগল— হঠাৎ গরম জল দেওয়া বন্ধ করে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল বর্ষণ করতে লাগল— এই রকম কখনো ঠাণ্ডা কখনো গরম জলে স্নান করে একটা জলযন্ত্রের মধ্যে গেলেম— তার উপর থেকে, নীচে থেকে, চার পাশ থেকে, জল বাণের মতো গায়ে বিঁধতে থাকে— সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা বরুণ-বাণ-বর্ষণের মধ্যে খানিক ক্ষণ থেকে আমার বুকের রক্ত পর্যন্ত যেন জমাট হয়ে গেল। রণে ভঙ্গ দিতে হল, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলেম। তার পরে এক জায়গায় পুকুরের মতো আছে, আমি সাঁতার দিতে রাজি আছি কি না জিজ্ঞাসা করলে। আমি সাঁতার দিলেম না, আমার সঙ্গী সাঁতার দিলেন; তাঁর সাঁতার দেওয়া দেখে তারা বলাবলি করতে লাগল, 'দেখো দেখো এরা কী অদ্ভুত রকম করে সাঁতার দেয়, ঠিক কুকুরের মতো।' এতক্ষণে স্নান শেষ হল। আমি দেখলেম, টার্কিশ বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা। তার পরে সমস্ত দিনের জন্য এক পাউন্ড্ দিয়ে এক গাড়ি ভাড়া করা গেল। প্যারিস্ একজিবিশন দেখতে গেলেম। তুমি এইবার হয়তো খুব আগ্রহের সঙ্গে কান খাড়া করেছ, ভাবছ আমি প্যারিস একজিবিশনের বিষয় কী না জানি বর্ণনা করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী বলব, কলকাতার য়ুনিবর্সিটিতে বিদ্যা-

শেখার মতো আমি প্যারিস এক্‌জিবিশনের সমস্ত দেখেছি কিন্তু কিছুই ভালো করে দেখি নি। এক দিনের বেশি আমাদের প্যারিসে থাকা হল না— সে বৃহৎকাণ্ড এক দিনে দেখা কারও সাধ্য নয়। সমস্ত দিন আমরা দেখলেম, কিন্তু সে রকম দেখায় দেখবার একটা তৃষ্ণা জন্মালো কিন্তু দেখা হল না। সে একটা নগরবিশেষ। এক মাস থাকলে তবে তা বর্ণনা করবার দুরাশা করতেম। প্যারিস এক্‌জিবিশনের একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই। সাধারণতঃ মনে আছে যে, চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি— স্থাপত্য-শালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি দেখেছি— নানা দেশ-বিদেশের নানা জিনিস দেখেছি— কিন্তু বিশেষ কিছু মনে নেই। তার পর, প্যারিস থেকে লন্‌ডনে এলেম। এমন বিষণ্ণ অন্ধকার পুরী আর কখনো দেখি নি। ধোঁওয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কোয়াশা, কাদা আর লোকজনের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব —এই হচ্ছে লন্‌ডনের যথাসর্বস্ব। আমি দুই-এক ঘণ্টা মাত্র লন্‌ডনে ছিলেম, যখন লন্‌ডন পরিত্যাগ করলেম তখন নিশ্বাস পরিত্যাগ করে বাঁচলেম। আমার বন্ধুরা আমাকে বললেন, লন্‌ডনের সঙ্গে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালোবাসা হয় না; কিছুদিন থেকে, তাকে ভালো করে চিনলে তবে লন্‌ডনের মাধুর্য বোঝা যায়।

দ্বিতীয় পত্র

আমি ইংলন্‌ড্‌ দ্বীপটাকে এত ছোটো ও ইংলন্‌ডের অধিবাসীদের এমন বিদ্যালোচনাশীল মনে করেছিলেম যে, ইংলন্‌ডে আসবার আগে আমি আশা করেছিলেম যে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে

আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত বুঝি টেনিসনের বীণাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে; মনে করেছিলেম, এই দুই-হস্ত-পরিমিত ভূমির যেখানে থাকি-না কেন, গ্ল্যাড্‌স্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্স্‌মূলরের বেদব্যাখ্যা, টিন্‌ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্র শুনতে পাব; মনে করেছিলেম, যেখানে যাই-না কেন, intellectual আমোদ নিয়েই আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝি উন্মত্ত। কিন্তু, তাতে আমি ভারী নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে— কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যা-কিছু কোলাহল শোনা যায়। তুমি যদি কোথাও গেলে তো মেয়েরা জিজ্ঞাসা করবে, তুমি ballএ গিয়েছিলে কি না, কন্সর্ট্‌ কেমন লাগল, থিয়েটরে একজন নতুন actor এয়েছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যান্‌ড্‌ হবে ইত্যাদি। পুরুষেরা বলবে, আফগান-যুদ্ধের বিষয় তুমি কী বিবেচনা কর?— Marquis of Lorneকে লন্‌ডনীয়েরা খুব সমাদর করেছিল, আজ দিন বেশ ভালো, কালকের দিন বড়ো miserable ছিল।— এদের মেয়েতে মেয়েতে যেসব গল্প চলে তা শুনলে তোমার ভারী মজা মনে হবে। একটি কুশ্রী বালিকার সঙ্গে একটি ধনী ব্যারিস্টরের বিয়ে হওয়াতে, তাই নিয়ে একটি স্ত্রীসভায় যে সমালোচনাটা চলছিল তা শুনে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল। কুশ্রী মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে এ দেশের মেয়েদের প্রাণে বোধ হয় বড়ো আঘাত লাগে, মাতৃশ্রেণীর মধ্যে ভারী চোক-টেপাটেপি পড়ে যায়, তাঁরা মনের যন্ত্রণায় আর কিছু করতে না পেরে আড়ালে আবডালে সে বেচারির প্রতি যথাসাধ্য বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করতে থাকেন। মাতৃদলের মধ্যে যাঁদের কুশ্রী মেয়ে আছে তাঁরা মনে করেন, অমুক মেয়েটার যদি অমন ভালো বিয়ে হয়ে গেল তবে আমার মেয়েরা কী অপরাধ

করলে! যাঁদের সুশ্রী মেয়ে আছে তাঁরা মনে করেন, অমুক মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল আর আমার মেয়েদের হল না! আর সাধারণ মিস্-শ্রেণীদের তো রাগে ঘৃণায় অভিমানে বুক ফেটে যায়— যে বেচারির সৌভাগ্যক্রমে বিয়ে হয়ে গেছে, যেন তার কত অপরাধ! যাঁরা সেই কুশ্রী মেয়ের রূপ নিয়ে সমালোচনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি মেয়েও সুশ্রী ছিলেন না, পরের কুরূপ নিয়ে বিদ্রূপ করার অধিকার তাঁদের এক তিলও নেই। কাপড়-চোপড়, গয়নাপত্র, কার চোক টেরা, কার নাক মোটা, কার ঠোঁট পুরু, কার বা হাতের কড়ে আঙুলের নখের কোণ বাঁকা—এই-সব নিয়ে এখানকার মেয়েতে মেয়েতে ভারী হাসি-তামাসা চলে থাকে। আমার যতখানি অভিজ্ঞতা (যদিও খুব কম) তাতে তো আমি এই রকম দেখেছি। এ দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক -মতে যুবকদের সঙ্গে flirt করে—এই তো আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু এ দেশের old maid শ্রেণীরা ভয়ংকর কাজের লোক। Temperance Meeting, Working Men's Society প্রভৃতি যত প্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মূলে তাঁরা আছেন। পুরুষদের মতো তাঁদের আপিসে যেতে হয় না, মেয়েদের মতো তাঁদের ছেলেপিলে মানুষ করতে হয় না, এ দিকে হয়তো এত বয়স হয়েছে যে 'বলে' গিয়ে নাচলে বা flirt ক'রে সময় কাটালে দশ জনে হাসবে, হাতে তাঁদের সময় অগাধ পড়ে রয়েছে— তাই জন্যে তাঁরা অনেক কাজ করতে পারেন। বাস্তবিক তাতে অনেক উপকার হয়। বিদেশ থেকে আমরা এই মেয়েদেরই নাম বেশি শুনতে পাই— কিন্তু এদের থেকেই যদি সমস্ত বিলিতি মেয়েদের বিচার করতে

যাও তবে হয়তো ভ্রমে পড়বে। এখানকার বিবিরা দর্জিশ্রেণীর জীবিকা, ফ্যাশান-রাজ্যের বিধাতা ও যুবকদলের খেলানাস্বরূপ। খেলানা আমি এই অর্থে বলছি যে, যখনি কারও সন্ধ্যের সময় একটু সময় কাটাবার আবশ্যক হল, দুই-একটি মিসের সঙ্গে হয়তো তিনি sentimental অভিনয় করে এলেন। পুরুষদের মন ভোলানোই মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত। যদি একজন পুরুষের মন ভোলাতে পারেন তবে মনে করলেন জীবনের একটা মহান্ লক্ষ্য সিদ্ধ হল, পূর্ব জন্মের অনেক তপস্যা সার্থক হল। মন-ভোলানো যজ্ঞে তাঁদের নিজের সুখ স্বাস্থ্য বলিদান দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত নন, কোমর এঁটে এঁটে তাঁরা বোলতার মতো কোমর করে তুলবেন— তার জন্যে তাঁরা সকল প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করতে ও সকল প্রকার রোগ সঞ্চয় করতেও রাজি আছেন। বাহারে কাপড় প'রে মাথায় গোটা কতক পালক গুঁজে দিন রাত্রি তাঁরা পুতুলটি সেজে আছেন, অভিনয় করে করে এমন তাঁদের অভ্যেস হয়ে গেছে যে অস্বাভাবিকও তাঁদের স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যে মেয়ের সাজসজ্জা সৌন্দর্য বাইরে থেকে খুব স্বাভাবিক ও অযত্নসাধ্য বলে মনে হয়, যাদের কথা-বার্তার মাধুরীতে আয়াসের লক্ষণ দেখা যায় না, মনে হয় affectation আদবে জানে না, তারাই হয়তো পাকা affectation জানে। এমন হতে পারে যে, একজন মেয়ে হয়তো পুরুষের প্রেমে পড়েছে, সেই পুরুষের হৃদয় অধিকার করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তাই ব'লেই যে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেন তা প্রায় দেখা যায় না। যেমন অনেক শিকারী খাবার জন্যে পাখি মারতে যায় না, তাদের বন্দুকের লক্ষ সিদ্ধ হল বলে আরাম পায়— হৃদয় অধিকার করতে এঁরাও সেই আরাম পান। আমি মন-ভোলাবার জন্য এ রকম হাব ভাব, হাত পা নাড়া, গলা সেধে সরু করা, মিষ্টভাবের

হাসি বের করা দু চক্ষে দেখতে পারি নে। হাব ভাবে আমার মন বোধ হয় কেউ ভোলাতে পারে না। পুরুষদের মন ভোলানো যাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই মেয়েদের দেখলে আমার বড়ো মায়া হয়— যেন তাদের নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে এ দেশের কী বেশি উন্নতি দেখছি জানো ? না, এঁরা সাজগোজের শাস্ত্রে আমাদের চেয়ে বেশি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন আর লেখাপড়া শিখেছেন— লেখাপড়া শিখেছেন অর্থে এখানে এই রকম বোঝাচ্ছে যে, নভেল পড়বার সময় এঁদের কখনো ডিক্সনারি খোলবার আবশ্যক হয় না। আমি মনে করতেম intellectual খাদ্যই এ দেশের লোকদের মনের একমাত্র খোরাক। আমি মনে করতেম, এ দেশের মেয়েরাও intellectual আমোদকেই প্রধান আমোদ মনে করে ও নাচ-তামাসাকে তার নীচে স্থান দেয়। যদিও এ দেশের মেয়েদের মধ্যে বিদ্যাচর্চা শুরু হয়েছে, কিন্তু সে এত অল্প যে তা কারও নজরেই আসে না। বিলেতে এসে আমি অনেক বিষয়ে নিরাশ হয়েছি। এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, দর্জির দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান রাশ রাশ দেখতে পাই, কিন্তু বইয়ের দোকান দুটো দেখতে পাই নে— আমি তো একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমাদের একটি শেলীর কবিতা কেনবার আবশ্যক হয়েছিল, কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে একজন খেলনাওয়ালাকে সেই বই আনিয়ে দিতে হুকুম করতে হয়েছিল। আমি আগে জানতেম, এ দেশে একটা কসাইয়ের দোকান যেমন দরকারী একটা বইয়ের দোকানও তেমনি।

ইংলন্ডে এলে সকলের চেয়ে চোখে কী পড়ে জানো ? লোকের ব্যস্তভাব। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখতে মজা আছে

— বগলে ছাতি নিয়ে হুস্ হুস্ করে চলেছে, পাশের লোকদের ওপর ভ্রূক্ষেপ নেই, মুখে মহা ব্যস্ত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে— সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। ইংলন্ডে যে কত রেলোয়ে আছে তার ঠিকানা নেই— সমস্ত লন্ডন-ময় রেলোয়ে, প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক-একটা ট্রেন যাচ্ছে। একটা রেলোয়ে স্টেশনে গেলে দেখা যায়, পাশাপাশি যে কত শত লাইন রয়েছে তার ঠিক নেই। লন্ডন থেকে ব্রাইটনে আসবার সময় দেখি— প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে উপর দিয়ে একটা, নীচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা, এমন চারি দিক থেকে হুস্‌হাস্ করে ট্রেন ছুটেছে। সে ট্রেনগুলোর চেহারা দেখলে আমার লন্ডনের লোক মনে পড়ে — এ দিক থেকে, ও দিক থেকে, মহা ব্যস্তভাবে হাঁস্ ফাঁস্ করতে করতে চলেছে ; এক তিল সময় নষ্ট করলে চলে না। দেশ তো এই এক রত্তি, ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াবার জায়গা নেই, দু পা চললেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি। এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে পাই নে! আমরা একবার লন্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেন মিস করেছিলেম, কিন্তু তার জন্যে বাড়ি ফিরে আসতে হয় নি— তার আধ ঘণ্টা পরেই আর-এক ট্রেন এসে হাজির।

জীবিকার জন্যে এ দেশে যেমন যুঝাযুঝি এমন আর কোথাও দেখি নি। এ দেশের লোক প্রকৃতির আদুরে ছেলে নয়— কারুর নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে থাকবার যো নেই। একে তো আমাদের দেশের মতো এ দেশের জমিতে আঁচড় কাটলেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে মারামারি করতে হয়। প্রথমতঃ শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপড় দরকার হয় তার ঠিক নেই— তার পরে কম খেলে এ দেশে বাঁচবার যো নেই, শরীরে তাপ জন্মাবার জন্যে অনেক খেতে হয়। এ দেশের লোকের কাপড় কয়লা

খাওয়া অপর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে চলে না, তার উপরে আবার মদ আছে। আমাদের বাঙলার খাওয়া নাম-মাত্র, কাপড় পরাও তাই। এ দেশে fittestরাই survive করে, এ দেশে যার ক্ষমতা আছে সেই মাথা তুলতে পারে, *দুর্বল লোকদের এখানে রক্ষা নেই —একে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তাতে কার্যক্ষেত্রে সহস্র* প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি করছে।

এ দেশের ছোটোলোকদের দেখলে মনে হয় না তাদের কিছু-মাত্র মনুষ্যত্ব আছে— তারা যেন পশু থেকে এক ধাপ উঁচু। তাদের মুখ দেখলে— নিদেন তাদের মধ্যে এক-এক জনের মুখ দেখলে আমার কেমন গা শিউরে ওঠে। তাদের মুখ দেখে আর কেউ 'human face divine' বলতে পারে না, পশুত্বভাবব্যঞ্জক তাদের সেই লাল-লাল মুখ দেখলে কেমন ঘৃণা হয়। আর, তারা যে ময়লা তা আর কী বলব। এই সে দিন একটা পুলিসের মোকদ্দমা দেখছিলেম— একটা ছোটোলোকের ছেলে মজা দেখবার জন্যে একটা ঘোড়ার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল! এমন পশুত্ব কখনো শুনেছ?

ক্রমে ক্রমে এখানকার দুই-একজন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হতে চলল। একটা মজা দেখছি, এখানকার লোকেরা আমাকে অতিদুগ্ধপোষ্য বালকের মতো মনে করে। মনে করে ইন্‌ডিয়া থেকে এসেছে, কিছু জানে না শোনে না, এঁকে দুচারটে জিনিস দেখিয়ে-শুনিয়ে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে দেওয়া ভালো। এক দিন Dr. —এর ভাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিলেম, সে যে আমাকে বিরক্ত করে তুলেছিল তা আর বলবার কথা নয়। একটা দোকানের সুমুখে কতকগুলো ফোটোগ্রাফ ছিল— সে মনে করেছিল ফোটো-গ্রাফ দেখে আমার একেবারে তাক লেগে যাবে, চক্ষু স্থির হয়ে

যাবে— সে আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে ফোটোগ্রাফের মহা ব্যাখ্যান করতে আরম্ভ করে দিলে। সে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, এক রকম যন্ত্র দিয়ে ঐ ছবিগুলো তৈরি হয়, মানুষে হাতে করে আঁকে না। আমার চার দিকে লোক দাঁড়িয়ে, আমার এমন লজ্জা করছিল। আমি তাকে বিশেষ করে বললেম যে, আমি ও খবরগুলি বিশেষ জানি। কিন্তু সে বিশ্বাস করবে কেন? একটা ঘড়ির দোকানের সামনে গিয়ে, ঘড়িটা যে একটা খুব আশ্চর্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি তো তাঁর অনুগ্রহের জ্বালায় একেবারে জ্বালাতন হয়ে গিয়েছিলেম। একটা evening partyতে Miss — আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমি এর পূর্বে পিয়ানোর ডাক শুনেছি কি না? এ দেশের অনেক লোক হয়তো পরলোকের একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি এক বিন্দুও খবর জানে! ভারতবর্ষের লোকেরা গোখাদক নয় শুনলে হয়তো তারা চার দণ্ড হাঁ করে থাকে— ইংলন্ড থেকে কোনো দেশের যে কিছু তফাত আছে তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক্— সাধারণ লোকেরা কত বিষয় জানে না তার ঠিক নেই। এই মনে করো, প— ডাক্তারকে আমার শিক্ষক খুব educated man বলে সুখ্যাতি করে থাকেন, কিন্তু তিনি Shelley বলে যে একজন কবি তাঁদের দেশে জন্মেছিল সেই খবরটুকু মাত্র জানেন, কিন্তু শেলী যে চেঞ্চি (Cenci) ব'লে একখানা নাটক লিখেছেন বা তাঁর *Epipsychidion* ব'লে যে একটি কবিতা আছে তা আমার মুখে প্রথম শুনতে পেলেন!

তৃতীয় পত্র

আমরা সে দিন 'ফ্যান্সি বলে' অর্থাৎ ছদ্মবেশ-নাচে গিয়েছিলেম— কত মেয়ে পুরুষ নানা রকম সেজেগুজে সেখানে নাচতে গিয়েছিল— সে দেখতে বেশ জমকালো। প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চার দিকে ব্যান্‌ড বাজছে— ৬।৭০০ সুন্দরী, সুপুরুষ। ঘরে ন স্থানং তিলধারয়েৎ— চাঁদের হাট তো তাকেই বলে— যে দিকে পা বাড়াই বিবিদের গাউন, যে দিকে চোক ফেরাই চোক ঝলসে যায়। এক-একটা ঘরে দলে দলে স্ত্রী পুরুষে হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করেছে, দেখে মনে হয় যেন সবাই একেবারে আমোদে উন্মত্ত হয়ে গেছে। জ্ঞানশূন্য হয়ে যেন জোড়া জোড়া পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক-একটা ঘরে এমন ৭০।৮০ জন যুগল মূর্তি ঘুরছে— এমন ঘেঁষাঘেঁষি যে, কে কার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে তার ঠিক নেই। একটা ঘরে শ্যাম্পেনের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে, মদ্যমাংসের ছড়াছড়ি, সেখানে লোকে লোকারণ্য। এক-একটা বিবির খাবার বিরাম নেই, দু-তিন ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত তার মুখ চলছে। এক-একটা বিবির নাচের বিরাম নাই, দু-তিন ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত তার পা চলছে। সকলেরই মুখে হাসি, মন অধিকার করবার যত প্রকার গোলাগুলি আছে বিবিরা তা অকাতরে নির্দয়-ভাবে বর্ষণ করছেন। কিন্তু ভয় কোরো না, আমাদের মতো পাষাণ হৃদয়ে তার একটু আঁচড়ও পড়ে নি। একজন বিবি snow maiden অর্থাৎ নীহারকুমারী সেজে গিয়েছিলেন, তাঁর সমস্তই শুভ্র, সর্বাঙ্গে পুঁতির সজ্জা, আলোতে একেবারে ঝক্‌মক্‌ করছে। একজন মুসলমানিনী মেয়ে সেজে গিয়েছিলেন— একটা লাল ফুলো ইজের, ওপরে একটা রেশমের পেশোয়াজ, মাথায় টুপির মতো। এ কাপড়ে তাঁকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। একজন আমাদের দিশি

মেয়ে সেজে গিয়েছিলেন— একটা শাড়ি ও একটা কাঁচুলি তাঁর প্রধান সজ্জা, তার উপরে একটা চাদর পরেছিলেন, তাতে ইংরিজি কাপড়ের চেয়ে তাঁকে ঢের ভালো দেখাচ্ছিল। একজন বিলিতি দাসী সেজে গিয়েছিল, যে রকম তার চেহারা তাতে দাসীর পোশাক ছাড়া আর কিছুতে তাকে মানাতো না। এই রকম নানা লোক নানা রকম পোশাক প'রে গিয়েছিল। আমি বাঙালার জমিদার সেজেছিলেম ; জরি-দেওয়া মখমলের কাপড়, জরি-দেওয়া মখমলের পাগড়ি প্রভৃতি পরেছিলেম। জনকতক ব্যক্তি মিলে পীড়াপীড়ি করে আমাকে একটা দাড়ি গোঁপ পরালেন। দুই-এক জন মহিলা আমাকে দেখে বললেন যে, সে দাড়ি গোঁপে আমাকে ভারী ভালো দেখাচ্ছে। তাতে আমার স্বভাবতই ভারী গর্বের আবির্ভাব হল, আমি সেই দাড়ি গোঁপ পরেই 'বলে' গিয়ে উপস্থিত হলেম। কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আছেন, আমি যে নাকালটা হলেম তা আর বক্তব্যও নয়, শ্রোতব্যও নয়। তা শুনলে পাষাণেরও চোখ ফেটে মুক্তার মতো ডাগর ডাগর অশ্রুবিন্দু দরদর ধারে বিগলিত হয়ে ধরণীতল অভিষিক্ত করবে। যে-সকল সুন্দরী বন্ধুদের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, আমার দাড়ি গোঁপ দেখে তাঁরা আর কেউ আমাকে চিনতে পারেন না। অমুকের সঙ্গে সকলেই সেক্‌হ্যান্‌ড্‌ করলে, অমুক বাবুর সঙ্গে সকলেই সেক্‌হ্যান্‌ড্‌ করলে— কিন্তু এ গরিবকে আর কেউ পোছে না। আমি যার কাছে যাই সেই সরে পড়ে। আমি তো রাগে দুঃখে অভিমানে বিরক্তিতে আত্মগ্লানিতে অভিভূত হয়ে সেই মুহূর্তেই দাড়ি গোঁপ উৎপাটন করে একেবারে পকেটে গুঁজলেম, তখন সমস্ত ভালোয় ভালোয় মীমাংসা হয়ে গেল। আমাদের মধ্যে অমুক অযোধ্যার তালুকদার সেজে গিয়েছিলেন। শাদা রেশমের ইজের জরিতে খচিত, শাদা রেশমের

চাপকান, শাদা রেশমের জোব্বা, জরিতে ঝক্‌মকায়মান পাগড়ি, জরির কোমরবন্দ —এই তো তাঁর সজ্জা। অযোধ্যার তালুকদারেরা যে এই রকম কাপড় পরে তা মনেও কোরো না, কিন্তু বিচার করবার লোক কোথায় ? ধরা পড়বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে অমুকবাবু আফগান সেনাপতি সেজেছিলেন।

গত মঙ্গলবারে আমরা অমুকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেম। সন্ধ্যে বেলায় কোথাও নিমন্ত্রণে যেতে হলে কিরকম পোশাক পরতে হয় জানো ? এখানে শীতের জন্য সচরাচর মোটা কাপড় পরতে হয়, কিন্তু evening party প্রভৃতিতে যেতে হলে পাৎলা কালো বনাতের কাপড় পরতে হয়, কেননা নিমন্ত্রণসভায় খুব গ্যাস জ্বলে, অনেক লোকের সমাগম হয়, তাতে ঘর বেশ গরম হয়ে ওঠে, তা ছাড়া যদি নাচতে হয় তা হলে অত্যন্ত গরম হবার কথা। সন্ধ্যেপরিচ্ছদের কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধব্‌ধবে শাদা হওয়া চাই— তার ওপরে প্রায়-সমস্ত-বুক-খোলা এক বনাতের ওয়েস্ট্‌কোট থাকবে, কালো ওয়েস্ট্‌কোটের মধ্যে শাদা কামিজের সুমুখ দিকটা বেরিয়ে থাকবে, গলায় শাদা ফিতে (necktie) বাঁধা, সকলের ওপর একটি টেল-কোট (লাঙ্গুল-কোট)— টেল-কোটের সুমুখ দিকটা কোমর পর্যন্ত কাটা, আমাদের চাপকান প্রভৃতি পোশাকগুলি যেমন হাঁটু পর্যন্ত পড়ে এ তা নয়। এর সুমুখ দিকটার সীমা কোমর পর্যন্ত, কিন্তু পেছন দিকটা কাটা নয়, সুতরাং কতকটা ন্যাজের মত ঝুলতে থাকে। আমরা যখন ইংরাজদের হনুকরণ করি তখন বাধ্য হয়ে এই ল্যাজ-কোট পরতে হল, কেননা ল্যাজ-কোট না পরলে হনুকরণ সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। নাচ-পার্টিতে যেতে হলে হাতে এক জোড়া শাদা দস্তানা পরতে হয়, কারণ যে মহিলাদের হাতে হাত দিয়ে নাচতে হবে, তোমার খালি হাত লেগে তাঁদের হাত

ময়লা হয়ে যেতে পারে কিম্বা তাঁদের হাতে যদি দস্তানা থাকে তাঁদের দস্তানা ময়লা হয়ে যেতে পারে। অন্য কোনো জায়গায় লোকদের সঙ্গে সেক্‌হ্যান্‌ড্‌ করতে গেলে হাতের দস্তানা খুলে ফেলতে হয়, কিন্তু নাচের ঘরে তার আবশ্যক হয় না। যা হোক, আমরা তো সাড়ে নটার সময় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনও নাচ আরম্ভ হয় নি। ঘরের দুয়ারের কাছে গৃহকর্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি বিশেষ পরিচিতদের সঙ্গে সেক্‌হ্যান্‌ড্‌ করছেন, অপরিচিতদের প্রতি শিরঃকম্পন করছেন, সকলকে অভ্যর্থনা করছেন। এ গোরাদের দেশে নিমন্ত্রণসভায় গৃহকর্তার বড়ো উঁচু পদ নেই, তিনি সভায় উপস্থিত থাকুন বা শয়নগৃহে নিদ্রা দিন তাতে কারও বড়ো কিছু এসে যায় না। আমরা ঘরে প্রবেশ করলেম, গ্যাসের আলোয় ঘর আলোকাকীর্ণ, কিন্তু শত শত রমণীদের রূপের আলোকে সে গ্যাসের আলো ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছে। চারি দিক উজ্জ্বল, হাস্যময়। রূপের উৎসব পড়ে গিয়েছে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবামাত্রই চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়। ঘরের এক পাশে পিয়ানো বেহালা বাঁশি বাজছে, ঘরের চারি ধারে কৌচ চৌকি সাজানো রয়েছে। ইতস্ততঃ দেয়ালের আয়নার ওপর গ্যাসের আলো ও রূপের প্রতিবিম্ব পড়ে ঝক্‌মক্‌ করছে। নাচবার ঘরের মেজে কাঠের, তার ওপর কার্পেট প্রভৃতি কিছু পাতা নেই, সে কাঠের মেজে এমন পালিশ-করা যে পা পিছলে যায়। এখানে ঘর যত পিছল হয় ততই নাচবার উপযুক্ত হয়। কেননা, পিছল ঘরে নাচের গতি খুব সহজ ও সুন্দর হয়, পা কোনো বাধা পায় না, আর আপনা-আপনি পিছ্‌লে আসে। ঘরের চারি দিকে আশে-পাশে যে-সকল বারান্দার মতো আছে, তাই একটু ঢেকে ঢুকে, গাছপালা দিয়ে, দুই-একটি কৌচ চৌকি রেখে lover's bower (প্রণয়ীদের

কুঞ্জ) নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেইখানে নাচে শ্রান্ত হয়ে বা কোলাহলে বিরক্ত হয়ে দুই-একটি যুবক যুবতী নিরিবিলি মধুরালাপে মগ্ন থাকতে পারেন। ঘরে ঢোকবার সময় সকলের হাতে সোনার অক্ষরে ছাপা এক-একখানি কাগজ দেওয়া হয়, সেই কাগজে কী কী নাচ হবে তাই লেখা থাকে। ইংরাজি নাচ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— এক রকম হচ্ছে স্ত্রী পুরুষে মিলে ঘুরে ঘুরে নাচা, তাতে কেবল দুজন লোক এক সঙ্গে নাচে; আর-এক রকম হচ্ছে চারটি জুড়ি নর্তক নর্তকী চতুষ্কোণ হয়ে সুমুখা-সুমুখী দাঁড়ায় ও হাত-ধরাধরি করে নানা ভঙ্গীতে চলাফেরা করে বেড়ায়, কোনো কোনো সময় চার জুড়ি না হয়ে আট জুড়িও হয়। ঘুরে ঘুরে নাচাকে round dance বলে ও চলা-ফেরা করে বেড়ানোর নাম square dance। নাচ আরম্ভ হবার পূর্বে গৃহকর্ত্রী মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে আলাপ করে দেন; অর্থাৎ পুরুষ-অভ্যাগতকে সঙ্গে করে কোনো এক অভ্যাগত মহিলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'মিস অমুক, ইনি হচ্ছেন মিস্টার অমুক।' অমনি মিস ও মিস্টার পরস্পর পরস্পরকে শিরঃকম্পন করেন। কোনো মিসের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তুমি যদি তাঁর সঙ্গে নাচতে ইচ্ছে কর তা হলে পকেট থেকে সেই সোনার জলে ছাপানো programmeটি বের করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, 'আপনি কি অমুক নৃত্যে বাক্‌দত্তা হয়ে আছেন?' অর্থাৎ, 'আর কেউ কি আগে থাকতে আপনার সঙ্গে অমুক নাচের বন্দোবস্ত করে গেছেন?' তিনি যদি 'না' বলেন তা হলে তাঁকে বোলো, 'তা হলে কি আমি আপনার সঙ্গে নাচবার সুখ ভোগ করতে পারি?' তিনি তোমাকে 'thank you' বললে তুমি বুঝলে যে, তোমার কপালে তাঁর সঙ্গে নাচবার সুখ আছে। অমনি সেই কাগজটিতে সেই

নাচের পাশে তাঁর নাম লিখে রেখো, এবং তাঁর কাগজে তোমার নাম লিখে দিয়ো। কাগজটা এই রকম—

নাচের নাম	যাদের সঙ্গে নাচবার বন্দোবস্ত হল তাদের নাম
PROGRAMME	ENGAGEMENTS
I. Lancers	
II. Valse	Miss Gordon
III. Quadrille	
IV. Gallop	Mrs. Egincourt
V. Polka	
ইত্যাদি	ইত্যাদি

এক পাশে নৃত্যের নাম, অপর এক পাশে নর্তক বা নর্তকীর নাম। নাচের বাজনা বেজে উঠল। অমনি শত শত যুগলমূর্তি হাত ধরাধরি করে নাট্যগৃহে নাচের জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। নাচ আরম্ভ হল। ঘুর-ঘুর-ঘুর। একটা ঘরে মনে করো, চল্লিশ-পঞ্চাশ জুড়ি নাচছে, ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি, এ ওর ঘাড়ে পড়ছে, এ ওর গাউন মাড়িয়ে দিচ্ছে, জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কাধাক্কি, কিন্তু তবু ঘুর-ঘুর-ঘুর। মনে হয় যেন আহ্লাদে পাগল হয়ে সবাই মিলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তালে তালে বাজনা বাজছে, তালে তালে পা পড়ছে, ঘর গরম হয়ে উঠেছে, আর সে যে কী একটা উত্তেজনার তরঙ্গ উঠেছে সে কী বলব! কোনো নর্তকযুগলের দুজনের দুজনকেই হয়তো খুব ভালো লেগেছে, তাদের দুজনের ঠোঁটে হাসি একেবারে ফেটে পড়ছে। কোনো যুবতীর ভাগ্যে এক বৃদ্ধ কুরূপ নর্তক জুটেছে, তার মুখে আর হাসি নেই, সে অতি আড়ষ্ট ভাবে

যন্ত্রের মতো নাচছে। কোনো লেডি partner (সহনর্তক) পান নি, তিনি দেয়ালের কোণে দাঁড়িয়ে সদ্বেষনয়নে হাসিমুখ ঘূর্ণমান নর্তকযুগলকে নিরীক্ষণ করছেন, আর বিফলে প্রফুল্লতার ভাণ করতে চেষ্টা করছেন। তাঁর নাম wallflower, অর্থাৎ 'দেয়াল-কুসুম'; তিনি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে নাট্যশালার দেয়ালের শোভা বর্ধন করেন। একটা নাচ শেষ হল, বাজনা থেমে গেল, নর্তক মহাশয় তাঁর শ্রান্তসহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন; সেখানে টেবিলের উপর ফল মূল মিষ্টান্ন মদিরার আয়োজন। হয়তো আহার পান করলেন, নাহয় দুজনে নিভৃত কুঞ্জে বসে রহস্যালাপ করতে লাগলেন। আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলে মিশে নিতে পারি নে, যে নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত সে নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচতে পারি নে, প্রতিপদে ভুল হয়, লোকের গাউন মাড়িয়ে দিই, প্রতি লোককে ধাক্কা দিই, বেতালে পা ফেলি, কখনো বা অসাবধানে আমার সহনর্তকীর পাও মাড়িয়ে দিই— আর এই রকম নানা-প্রকার গলদ করে অবশেষে নাচের মাঝখানে থেমে পড়ি ও আমার সহচরীর কাছ থেকে মার্জনা ভিক্ষা করে সে দিক থেকে আস্তে আস্তে পিট্টান দিই। সত্যি কথা বলতে কী, আমার নাচের নেমন্তন্নগুলো বড়ো ভালো লাগে না। অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে ও রকম পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আমার আদবে ভালো লাগে না। যাদের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচতে আমার মন্দ লাগে না। Miss অমুকের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ ছিল, আর তাঁকে বেশ দেখতে, তাঁর সঙ্গে আমি gallop নেচেছিলেম, তাই জন্যে তাতে আমার কিছু ভুল হয় নি। কিন্তু Miss অমুকের সঙ্গে আমি lancers নেচেছিলেম, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, আর তাঁকে অতি বিশ্রী দেখতে— তাঁর চোখ দুটো বের-করা, তাঁর গাল

হুটো মোটা, দাড়ির দিকটা অত্যন্ত ছোটো, সব চেয়ে তাঁর স্বভাব খিট্‌মিটে— তাঁর সঙ্গে নাচতে গিয়ে যত প্রকার দোষ হওয়া সম্ভব তা ঘটেছিল। যেমন তাস খেলবার সময়ে খারাপ partner পেলে তার 'পরে তার দলের লোক চটে যায়, তেমনি নাচের সময় খারাপ partner পেলে মেয়েরা ভারী চটে যায়। তিনি বোধ হয় নাচবার সময় মনে মনে আমার মরণ কামনা করেছিলেন। নাচ ফুরিয়ে গেলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম, তিনিও নিস্তার পেলেন। আমি একবার একটি সুন্দরী partner পেয়েছিলেম। তাঁর সঙ্গে না নাচতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেম। কিন্তু গৃহকর্ত্রী আমাকে বিশেষ করে নাচতে অনুরোধ করলে, পীড়াপীড়ির পর নাট্যশালায় অবতরণ করলেম— কোনো মতে নাচটা সমাপন করে দে ছুট! প্রথমে নাচের ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চমকে উঠেছিলেম। দেখি যে, শত শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন। দেখেই তো আমার বুকটা একেবারে নেচে উঠেছিল। আমার তাকে এমন ভালো লাগল যে কী বলব! তার সঙ্গে কোনো মতে আলাপ করবার জন্যে আমি তো ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াতে লাগলেম্। কতদিন মনে করো কালো মুখ দেখি নি! আর, তার মুখে আমাদের বাঙালি মেয়েদের ভালোমানুষি নম্রভাব এমন মাখানো যে কী বলব! আমি অনেক ইংরেজ মেয়েদের মুখে ভালোমানুষি নরম ভাব দেখেছি, কিন্তু এর সঙ্গে তার কী একটা তফাত আছে বলতে পারি নে। তার চুল বাঁধা আমাদের দেশের মতো, শাদা মুখ দেখে দেখে আর উগ্র অসংকোচ সৌন্দর্য দেখে দেখে আমার মনটা ভিতরে ভিতরে বড়ো বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল— এতদিনে তাই বুঝতে পারলেম। সেই শ্বেতাঙ্গিনীদের সভায় একটি কালো মিষ্টি মুখ দেখে আমার মনটা চুম্বকের মতো সেই দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল।

আমার বোধ হয় এ রকম হবার মানে আছে— হাজার হোক, ইংরেজ মেয়েরা সম্পূর্ণ আলাদা জাত, তারা আমাদের কথাবার্তা ভাবভঙ্গী আচারব্যবহারের মর্মের ভিতরে ঢুকতে পারে না। আমি এতদূর ইংরিজি ভাব শিখি নি যে তাদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি পরিচিত ভাবে কথাবার্তা কইতে পারি। তাদের সঙ্গে দেখা হলে কথাবার্তা কবার যে-সকল বাঁধি গৎ আছে সেগুলি খুব ঝাড়তে পারি— আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি, সম্প্রতি অপেরায় যাওয়া হয়েছিল কি না, অমুক থিয়েটরে অমুক অভিনেতার অভিনয় কেমন লাগল, আজ ভারী ভালো দিন ইত্যাদি— এই-সকল বাঁধি গতের সীমা লঙ্ঘন করতে সাহস হয় না। ইংরিজি মনের ভাবগতি খুব ভালো রকম জানলে তবে নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে দুই-একটা কথাবার্তা কওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষীয়েরা আমাদের আপনাদের লোক, তাদের কাছে আমাদের অধিকার অনেকটা বিস্তৃত, চন্দ্রলোকের একটা মেয়ে মনে করে তাদের কাছে ঘেঁষতে তেমন একটু ইতস্ততঃ করবার ভাব আসে না। যা হোক, দুঃখের কথা বলব কী, যখন আমি একেবারে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়েছি তখন শোনা গেল যে, সে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে। শুনে আমার মনটা একেবারে বিগড়ে গেল, আর তার সঙ্গে আলাপ করা গেল না, কিন্তু কালো মুখের ছাপ আমার মনে রয়ে গেল।

আজ ব্রাইটনের অনেক তপস্যার ফলে সূর্য উঠেছেন। এ দেশে রবি যে দিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন সে দিন এ দেশে একটি লোকও কেউ অন্তঃপুরে থাকে না— সে দিন লোকেরা একটু বেড়িয়ে বাঁচে। সে দিন সমুদ্রের ধারে বেড়াবার রাস্তায় লোক কিল্‌বিল্‌ করতে থাকে— এ দেশে যদিও 'বাড়ির ভিতর' নেই, তবু এ দেশের মেয়েরা যেমন অসূর্যম্পশ্যরূপা এমন আমাদের

দেশে নয়— এ দেশের সূর্যই যখন অনেত্রম্পশ্যরূপ তখন এ দেশের মেয়েরাও তো অসূর্যম্পশ্যরূপা হবেই।

সাড়ে আটটার কমে আমাদের বিছানা থেকে ওঠা হয় না। ছটার সময় বিছানা থেকে উঠলে এ দেশের লোকেরা এত আশ্চর্য হয় যে, দিন-দুপরে একটা স্কন্ধকাটা দেখলেও তারা সে রকম আশ্চর্য হয় না। তার পরে উঠেই আমি রোজ ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এ দেশের লোকেরা যাকে স্নান বলে আমি সে রকম স্নানের বিড়ম্বনা করি নে। আমি মাথায় জল ঢেলে স্নান করি; গরম জল নয়— এখানকার এই বরফের মতো ঠাণ্ডা জল। মাথায় জল ঢেলে স্নান করাকে এ দেশের লোকে অসাধারণ বীরত্ব মনে করে। আমার নাম যে কেন এখনও ছাপার কাগজে উঠে যায় নি আমি তাই ভাবছি। নটার সময় আমাদের খাবার আসে। এখানকার ৯টা আর সেখানকার ৬টা সমান। আমাদের আর-একটি খাওয়া দেড়টার সময়, সেইটিই প্রধান খাওয়া— মধ্যাহ্ন-ভোজন। প্রত্যহ ··· পার করছি তাতে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই, মাঝে মাঝে ভেড়ার পদসেবাও করে থাকি। মধ্যে একবার চা রুটি প্রভৃতি আসে, তার পরে রাত আটটার সময় আর-একটি সুপ্রশস্ত ভোজনের আয়োজন হয়ে থাকে— এই রকম আমাদের দিনের প্রধান কার্য হচ্ছে খাওয়া।

অন্ধকার হয়ে আসছে, চারটে বাজে ব'লে, চারটে বাজলে পরে আলো না জ্বেলে পড়া দুষ্কর। এখানে প্রকৃত পক্ষে ৯টার সময় দিন আরম্ভ হয়, কেননা গড়ে রোজ আটটার কমে ওঠা হয় না। এখানকার লোকের ছটার সময় হয়তো দুপর রাত্তির, এ দেশের প্যাঁচারা ছাড়া আর কেউ তখন জেগে নেই। তার পরে আবার বৈকাল চারটের সময়েই এখানকার দিনের আলো নিভে

যায়, তাই এখানকার দিনগুলো এমন ছোটো মনে হয় যে কী বলব। এখানকার দিনগুলো যেন দশটার সময় আপিস করতে আসে, আর চারটের সময় বাড়ি ফিরে যায়। এখানে কাজ ক'রে অবসর পাওয়া দূরে থাক্, কাজ করবার অবসর পাওয়া যায় না। সন্ধ্যের পর আমার মনের জড়-অবস্থা হয়, এমন জড়-অবস্থা হয় যে তখন আর কোনো কাজ করবার শক্তি থাকে না। সুতরাং আমার এ রকম ছোটো দিনের সঙ্গে কারবার করা পুষিয়ে উঠছে না— ট্যাঁক-ঘড়ির ডালা খুলতে খুলতেই এ দেশের দিন চলে যায়। এখানকার রাত্তির তেমনি ঘোড়ায় চড়ে আসে, আর পায়ে হেঁটে চলে যায়— সে আর ফুরোয় না। এখানকার দিনগুলি যে কেবল অচিরস্থায়ী তা নয়, যতক্ষণ থাকে তাই নাহয় একটু ভদ্রলোকের মতো থাক্, তা নয়— মুখ ভার করে খুঁৎখুঁৎ করতে করতেই তাঁর সমস্ত সময় চলে যায়।

মেঘ, বৃষ্টি, বাদল, অন্ধকার, শীত— এ আর এক দণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয় তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়— তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে। এখানে এ তা নয়, এ টিপ্ টিপ্ করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলছে তো চলছেই— সে কেমন একটা ভিজে-ভিজে ভাব। রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাঁচের জানলার উপর টিপ্ টিপ্ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে, কেমন একটা অন্ধকার-অন্ধকার করে এসেছে। আমাদের দেশে যেমন স্তরে স্তরে মেঘ করে, এখানে আকাশ সমতল— মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রঙটা ঘুলিয়ে গিয়েছে। সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর জঙ্গমের যে কী-একটা অবসন্ন মুখশ্রী দেখা যায় তা বর্ণনা

করা যায় না। লোকের মুখে সময়ে সময়ে শুনতে পাই বটে যে কাল বজ্র হয়েছিল, কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে তাঁর মুখ থেকেই সে খবরটা পাই— এখানকার বজ্রধ্বনি শুনতে গেলে বোধ হয় microphone ব্যবহার করতে হয়। সূর্য তো এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে। যদি অনেক ভাগ্যবলে সকালে উঠে সূর্যের মুখ দেখতে পাই, তবে তখনি আবার মনে হয়—

'এমন দিন না রবে— তা জানো'।

এই অন্ধকার দেশে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সমস্ত যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে— কিছু লেখা বেরোয় না, এমন-কি গুছিয়ে একটা চিঠিও লিখতে পারি নে। চিঠি লেখবার বা অন্য কিছু লেখবার কথা মনে হলেই আমার কেমন হাই উঠতে থাকে। দেশের সে সূর্যালোক ও জ্যোৎস্না কেমন সুখস্বপ্নের মতো মনে পড়ে। আমাদের দেশে সেই সকাল-সন্ধ্যার ও জ্যোৎস্নারাত্রির মর্যাদা এ দেশে এসে বিশেষ করে বুঝতে পেরেছি।

দিনে দিনে শীত খুব ঘনিয়ে আসছে। লোকে বলছে, কাল পরশুর মধ্যে হয়তো আমরা বরফ পড়া দেখতে পাব। তাপমান যন্ত্র ৩০ ডিগ্রী পর্যন্ত নেবে গিয়েছে— সেই তো হচ্ছে freezing point, অল্পস্বল্প frost দেখা দিয়েছে। রাস্তার মাটি খুব শক্ত হয়ে গিয়েছে, কেননা তার মধ্যে যা জল ছিল সমস্ত জমাট হয়ে গিয়েছে, রাস্তার মাঝে মাঝে কাচের টুকরোর মতো শিশির খুব শক্ত হয়ে জমে গিয়েছে, দুই-এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে কে যেন চুন ছড়িয়ে দিয়েছে— বরফের এই প্রথম সূত্রপাত দেখছি। খুবই শীত পড়েছে, এক-এক সময়ে হাত পা এমন ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে জ্বালা করতে থাকে। সকালে লেপ থেকে বেরোতে যত ভাবনা হয়, সহমরণে যেতে হলেও আমার তত ভাবনা হয় না। কিন্তু

আমার বীরত্বের কাহিনী শুনলে হয়তো তুমি অবাক হয়ে যাবে। সেই সকালে উঠেই আমি বরফের মতো ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে স্নান করি। মনে হয় মাথাটা যেন খসে পড়ল, সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়— কিন্তু তার পরেই যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় তাতে সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে যেতে হয়।

আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তার এক-এক জন সত্যি-সত্যি হেসে ওঠে, এক-এক জন এত আশ্চর্য হয়ে যায় যে তাদের আর হাসবার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক আমাদের জন্যে গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে, তারা আমাদের দিকে এত হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে যে পেছনে গাড়ি আসছে হুঁশ নেই। প্যারিসে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে এক দঙ্গল ইস্কুলের ছোকরা চীৎকার করতে করতে ছুটেছিল, আমরা তাদের সেলাম করলেম। এক-এক জন আমাদের মুখের উপর হেসে ওঠে, এক এক জন চেঁচাতে থাকে— 'Jack, look at the blackies!' কিন্তু আমি সে-সব কিছুই গ্রাহ্য করি নি, আমার এক তিলও লজ্জা করে না।

চতুর্থ পত্র

আমরা সেদিন House of Commonsএ গিয়েছিলেম, ভারী নিরাশ হয়েছিলেম। পার্ল্যামেণ্টের অভ্রভেদী চূড়া, প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দেখলে খুব তাক লেগে যায়; কিন্তু ভিতরে গেলে তেমন ভক্তি হয় না। একটা বড়ো ঘরে House বসে, ঘরের চারি দিকে গোল গ্যালারি, তার এক দিকে দর্শকেরা বসে, আর-এক দিকে খবরের কাগজের reporterরা বসে। গ্যালারির

অনেকটা থিয়েটরের dress-circleএর মতো। গ্যালারির নীচে অর্থাৎ থিয়েটরের জায়গায় stall থাকে, সেইখানে মেম্বররা বসে। তাদের জন্যে দু পাশে দ্দ দশখানি বেঞ্চি আছে, এক পাশের পাঁচখানি বেঞ্চিতে গবরন্‌মেণ্টের দল বসে,আর এক পাশের পাঁচখানি বেঞ্চিতে বিপক্ষ দল বসে, আর সুমুখের একটা প্ল্যাট্‌ফর্মের উপর একটা কেদারা আছে— সেইখানে প্রেসিডেণ্টের মতো এক জন (যাকে speaker বলে) মাথায় পরচুলা (wig) প'রে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বসে থাকেন। যদি কেউ কখনো কোনো অন্যায় ব্যবহার বা কোনো আইনবিরুদ্ধ কাজ করে, তা হলে speaker উঠে তাকে বাধা দেয়। যেখানে খবরের কাগজের reporterরা সব বসে তার পেছনে খড়খড়ি-দেওয়া একটা গ্যালারি থাকে, সেইখানে মেয়েরা বসে— বাইরে থেকে মেয়েদের দেখা যায় না। দেখেছ পার্ল্যামেণ্টের মেয়েদের আব্রু কত! আমরা যখন গেলেম তখন O'donnel বলে একজন Irish member ভারতবর্ষসংক্রান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, Press Actএর বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন করছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে Irish memberরা Houseএ অত্যন্ত অপ্রিয়— তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল। Houseএর ভাবগতিক দেখে আমি ভারী আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেম। এমন ছেলেমানুষি সচরাচর দেখা যায় না। যখন একজন কেউ বক্তৃতা করছে তখন হয়তো অনেক মেম্বর মিলে 'ইয়া' 'ইয়া' 'ইয়া' 'ইয়া' করে জানোয়ারের মতো চীৎকার করে ডাকাডাকি করছে, হাসছে, এবং যত প্রকার অসভ্যতা করবার তা করছে। আমাদের দেশে সভায় ইস্কুলের ছোকরারাও হয়তো এমন করে না। কিন্তু তাও দেখেছি, এখানকার অন্যান্য সভায় এরকম গোলমাল চণ্ডীপাঠ হয় না। অনেক সময়ে বক্তৃতা হচ্ছে আর মেম্বরেরা কপালের ওপর

টুপি টেনে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন। একবার দেখলেম যে, ভারতবর্ষীয় বিষয় নিয়ে একটা বক্তৃতার সময় ঘরে ৯।১০ জনের বেশি মেম্বর ছিল না, অন্যান্য সবাই ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে বা supper খেতে গিয়েছেন। আর যেই vote নেবার সময় হল অমনি সবাই চার দিক থেকে এসে উপস্থিত হলেন। সবাই প্রায় ঘর থেকে ঠিক করে এসেছিলেন কোন্ দিকে vote দেবেন। বক্তৃতা শুনে বা কোনো প্রকার যুক্তি শুনে যে কারও মত স্থির হয় তা তো বোধ হয় না। অনেক সময় patriotism— party-ismএর কাছে পরাস্ত মানে। যতদূর দেখেছি আমার তো বোধ হয় Conservativeরা অত্যন্ত অন্ধভাবে তাদের দলের গোঁড়া। Liberalদের কতকটা reasonable বলে মনে হয়, তারা যা ভালো বোঝে তাই করে। তাই জন্যে Liberalদের আপনাদের মধ্যেও এত মতভেদ। নাক কান চোখ মুখ বুজে একটা দলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চললে আর বড়ো একটা পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকে না। যা হোক, আমি ভাবছিলেম, এই রকম দলাদলির ছিব্লেমির উপর কত কত রাজ্য দেশের শুভাশুভ নির্ভর করছে।

গত বৃহস্পতিবারে House of Commonsএ ভারতবর্ষ নিয়ে খুব বাদানুবাদ চলেছিল, সে দিন ব্রাইট সিভিল সর্ভিস সম্বন্ধে ও গ্ল্যাড্স্টোন তুলাজাতের শুল্ক ও আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়দের দরখাস্ত দাখিল করেন। ৪টার সময় পার্ল্যামেণ্ট্ খোলে। আমরা কতকগুলি বাঙালি মিলে ৪টে না বাজতে বাজতে হৌসে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনও হৌস খোলে নি, দর্শনার্থীরা হৌসের বাইরে একটা প্রকাণ্ড ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের চার দিকে Burke, Fox, Chatham, Walpole প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদ মহাপুরুষদের প্রস্তরমূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতি দরজার কাছে

পাহারাওয়ালা পাকা-চুলের-পরচুলা-পরা। গাউন-ঝোলানো পার্ল্যা-মেণ্টের কর্মচারীরা হাতে দুই-একটা খাতাপত্র নিয়ে আনাগোনা করছিলেন। তাঁদের মনে কী ছিল আমি অবিশ্যি ঠিক করে বলতে পারি নে, কিন্তু তাঁদের সেই ভ্রূক্ষেপশূন্য মুখের ভাব দেখে আমার কল্পনা হচ্ছিল যেন তাঁরা মনে মনে দর্শনার্থীদের বলছিলেন, 'আমাদের দিকে একবার চেয়ে দেখো, আজকের কী হবে না হবে তাই দেখবার জন্যে তোমরা তো দুয়ারের কাছে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ, কিন্তু আমরা তা সমস্ত জানি— এখন কিছু ভাঙছি নে— ক্রমে ক্রমে সব টের পাবে।' তাঁদের দেখে আমার কী মনে পড়ল জানো? আমাদের দেশের গ্রেট ন্যাশানেল থিয়েটরে যখন এখনও যবনিকা ওঠে নি, দর্শকেরা সব বসে আছে, তখন স্টেজের সেই পাশের দরজা দিয়ে দুই-একজন স্টেজ-সংক্রান্ত লোক একবার স্টেজ থেকে বেরোচ্ছেন একবার স্টেজের মধ্যে ঢুকছেন, যেন তাঁরা দর্শকদের জানাতে চান— 'তোমরা তো এ স্টেজের মধ্যে ঢুকতে পারো না, এর ভিতরে কী হচ্ছে কিছুই জান না, ঐ বেঞ্চিগুলো পর্যন্তই তোমাদের অধিকারের সীমা।' এই রকম তাঁদেরও সেই মহারহস্যময় মুখের ভাব। এই উইগ-গাউন-পরা ব্যক্তিগণ পার্ল্যামেণ্টের ক্লার্ক্‌। এঁদের হাতের কাগজপত্রগুলো দেখলে গা'টা কেঁপে ওঠে। চারটের সময় হৌস খুলল। আমাদের কাছে Speaker's Galleryর টিকিট ছিল। House of Commonsএ ৫ শ্রেণীর গ্যালারি আছে— Strangers' Gallery, Speaker's Gallery, Diplomatic Gallery, Reporters' Gallery, Ladies' Gallery। হৌসের যে-কোনো মেম্বরের কাছ থেকে বৈদেশিক্ গ্যালারির টিকিট পাওয়া যায়, আর বক্তার অনুগ্রহ হলে তবে বক্তার গ্যালারির টিকিট পাওয়া যেতে পারে। Diplomatic Galleryটা কী

পদার্থ তা ভালো করে বলতে পারি নে, আমি যে-কবার হৌসে গিয়েছি, দুই-একজন ছাড়া Diplomatic Galleryতে লোক দেখতে পাই নি। Strangers' Gallery থেকে বড়ো ভালো দেখা-শোনা যায় না, তার সামনে Speaker's Gallery, Speaker's Galleryর সুমুখে Diplomatic Gallery। আমরা গ্যালারিতে গিয়ে তো বসলেম। পরচুলাধারী Speaker মহাশয় গরুড় পক্ষী-টির মতো তাঁর সিংহাসনে গিয়ে বসলেন। হৌসের সভ্যেরা সব আসন গ্রহণ করলেন। কাজ আরম্ভ হল। হৌসের প্রথম কাজ প্রশ্নোত্তর করা। হৌসের পূর্ব অধিবেশনে এক-এক জন মেম্বর বলে রাখেন যে, 'আগামী বারে আমি অমুক অমুক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব, তার উত্তর দিতে হবে।' একজন হয়তো জিজ্ঞাসা করলেন, 'অমুক জেলায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট অমুক-আইন-বিরুদ্ধ কাজ করেছেন, সেক্রেটারি মহাশয় তার কি কোনো সংবাদ পেয়েছেন, আর সে বিষয়ে কি কোনো বিধান করেছেন?' এ বিষয়ে যিনি দায়ী তিনি উঠে তার একটা কৈফিয়ত দিলেন। সে দিন O' donnel নামে একজন Irish member উঠে জিজ্ঞাসা করলেন যে, '*Echo* এবং আরও দুই-একটি খবরের কাগজে জুলুদের প্রতি ইংরাজ সৈন্যদের অত্যাচারের যে বিবরণ বেরিয়েছে সে বিষয়ে গবর্ন্‌মেণ্ট্‌ কি কোনো সংবাদ পেয়েছেন? আর সে-সকল অত্যাচার কি খৃস্টানদের অনুচিত নয়?' অমনি গবর্ন্‌মেণ্টের দিক থেকে সার মাইকেল হিক্‌স্‌বিচ্‌ উঠে ওডোনেলকে খুব কড়া কড়া দুই-এক কথা শুনিয়ে দিলেন, অমনি একে একে যত আইরিশ মেম্বর ছিলেন সকলে উঠে তার কড়া কড়া উত্তর দিতে লাগলেন, এই রকম অনেক ক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি করে দুই পক্ষ শান্ত হয়ে বসলেন। এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তরের ব্যাপার সমস্ত হলে পর যখন বক্তৃতা করবার সময়

এল, তখন হৌস থেকে অধিকাংশ মেম্বর উঠে চলে গেলেন। দুই-একটা বক্তৃতার পর ব্রাইট উঠে সিভিল সর্ভিসের রাশি রাশি দরখাস্ত হৌসে দাখিল করলেন। বৃদ্ধ ব্রাইটকে দেখলে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য ও দয়া যেন মাখানো। ব্রাইটকে যখন আমি প্রথম দেখি, যখন আমি তাঁকে ব্রাইট বলে চিনতেম না, তখন অনেক ক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখ থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারি নি। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাইট সে দিন কিছু বক্তৃতা করলেন না। হৌসে অতি অল্প মেম্বরই অবশিষ্ট ছিলেন, যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রার আয়োজন করছিলেন— এমন সময়ে গ্ল্যাড্স্টোন উঠলেন। গ্ল্যাড্স্টোন ওঠবামাত্রেই সমস্ত ঘর একেবারে ঘোর নিস্তব্ধ হয়ে গেল, গ্ল্যাড্স্টোনের স্বর শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলে দলে মেম্বর আসতে লাগলেন, দুই দিকের বেঞ্চি পূরে গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মতো গ্ল্যাড্স্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হতে লাগল, সে এমন চমৎকার যে কী বলব! কিছুমাত্র চীৎকার তর্জন-গর্জন ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি কথা ঘরের যেখানে যে-কোনো লোক বসেছিল সকলেই একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। গ্ল্যাড্স্টোনের কী-এক রকম দৃঢ় স্বরে বলবার ধরণ আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতর গিয়ে যেন জোর করে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। একটা কথায় জোর দেবার সময় তিনি মুষ্টি বদ্ধ করে একেবারে নুয়ে নুয়ে পড়েন, যেন প্রত্যেক কথা তিনি একেবারে নিংড়ে নিংড়ে বের করছেন। আর সেই রকম প্রতি জোর-দেওয়া কথা দরজা ভেঙেচুরে যেন মনের ভিতর প্রবেশ করে। আইরিশ মেম্বর সলিভানের সঙ্গে গ্ল্যাড্স্টোনের বাগ্মিতার তফাত কী জানো? সলিভান খুব হাত পা নেড়ে, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে, হুট্পাট্ করে বলে যান। তাঁর বক্তৃতা মনে লাগে বটে, কিন্তু সে ভাব বড়ো বেশিক্ষণ থাকে না। তাঁর তর্জন-গর্জনও যেমন থামে,

শ্রোতাদের মনও অমনি জুড়িয়ে যায়। গ্ল্যাড্‌স্টোন অনর্গল বলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতি কথা ওজন-করা, তার কোনো অংশ অসম্পূর্ণ নয়। তিনি বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্বরে জোর দিয়ে বলেন না, কেননা সে রকম বলপূর্বক বললে স্বভাবতই শ্রোতাদের মন তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। তিনি যে কথায় জোর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন সেই কথাতেই জোর দেন। তিনি খুব তেজের সঙ্গে বলেন বটে, কিন্তু চীৎকার করে বলেন না; মনে হয় যা বলছেন তাতে তাঁর নিজের খুব আন্তরিক বিশ্বাস। গ্ল্যাড্‌স্টোনের বক্তৃতাও যেমন থামল অমনি হৌস শূন্যপ্রায় হয়ে গেল, দু দিকের বেঞ্চিতে ৬।৭ জনের বেশি আর লোক ছিল না। গ্ল্যাড্‌স্টোনের পর স্মলেট যখন বক্তৃতা আরম্ভ করলেন তখন দুই দিককার বেঞ্চিতে লোক ছিল না বললেও হয়। কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হবার পাত্র নন; শূন্য হাউসকে সম্বোধন করে তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ এক বক্তৃতা করলেন। সেই অবকাশে আমি অত্যন্ত দীর্ঘ এক নিদ্রা দিই। দুই-এক জন মেম্বর, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেউ বা পরস্পর গল্প করছিলেন কেউ বা চোখের ওপর টুপি টেনে দিয়ে ডিস্‌রেলীর পদচ্যুতির পর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছিলেন। হৌসে Irish memberদের ভারী যন্ত্রণা; সে বেচারিরা যখন বক্তৃতা করতে ওঠে তখন হাউসে যে অরাজকতা উপস্থিত হয় সে আর কী বলব! চার দিক থেকে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হয়, অভদ্র মেম্বরেরা হাঁসের মত 'ইয়া' 'ইয়া' করে চেঁচাতে থাকে। বিদ্রূপাত্মক 'hear' 'hear' শব্দে বক্তার স্বর ডুবে যায়। এই রকম বাধা পেয়ে বক্তা আর আত্মসম্বরণ করতে পারেন না, খুব জ্বলে ওঠেন; আর তিনি যতই রাগ করতে থাকেন ততই হাস্যাস্পদ হন। আইরিশ মেম্বরেরা এই রকম জ্বালাতন হয়ে

আজকাল খুব প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছেন। হাউসে যে-কোনো কথা ওঠে, প্রায় সকল বিষয়েই তাঁরা বাধা দেন; আর প্রতি প্রস্তাবে এক জনের পর আর-এক জন করে উঠে দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতায় হাউসকে বিব্রত করে তোলেন। আমি ঠিক করে বলতে পারি নে যে, আইরিশ মেম্বরেরা আগে থাকতেই ঐ রকম আচরণ করতেন বলেই অন্যান্য মেম্বরেরা তাঁদের প্রতি ঐ রকম অত্যাচার করেন, কি অন্যান্য মেম্বরদের কাছে অত্যাচার সয়ে সয়ে আইরিশ মেম্বরেরা এই রকম প্রতিহিংসা তুলতে আরম্ভ করেছেন। আমার স্বভাবতই আইরিশ মেম্বরদের প্রতি টান, সুতরাং স্বভাবতই আমার বিশ্বাস হয় যে শেষোক্তটাই বেশি সম্ভব। এর কারণ সহজেই নির্দেশ করা যায়— মনে করো আইরিশদের অনুগ্রহ করে পার্ল্যামেণ্টে স্থান দেওয়া হয়েছে, আইরিশরা সেই অনুগ্রহ পেয়েই যদি শান্ত ছেলেগুলির মত হৌসে বসে থাকত, তাদের অস্তিত্ব আছে কি না আছে যদি জানা না যেত, তা হলে অনুগ্রহকর্তারা সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু তারাও যদি অন্যান্য মেম্বরদের মতো বাদানুবাদ করতে থাকে, নিজের মত প্রকাশ করে, অন্য লোকের মতো প্রতিবাদ করে, তা হলে সকলের চটে ওঠা খুব স্বাভাবিক। ইন্‌ডিয়া-কৌন্‌সিলে যদি এক দল ভারতবর্ষীয় মেম্বর থাকে, আর তারা যদি জুজুর মতো বসে না থাকে, সকল কথাতেই 'হাঁ' না দিয়ে যায়, আর সংকুচিত স্বরে কিছু বলতে গিয়ে অমনি গবর্নমেণ্টের নীরব চোখ-রাঙানি দেখে থতমত খেয়ে যদি না বসে পড়ে, কিম্বা গবর্নমেণ্টের উৎসাহজনক পিঠ-থাবড়া খেয়ে আহ্লাদে যদি গলে না পড়ে, তা হলে তাদের কী দুর্দশা হয় মনে করে দেখো দেখি! তা হলে দুদিন বাদেই তাদের ঘাড়ে হাতটি দিয়ে বলা হয়, 'বেরোও, বেরোও বাপুগণ!' ইংলন্‌ডে, সভ্যদেশে, সমস্ত য়ুরোপের চোখের

সামনে এ রকম ঘটতে পারে না ; একবার যখন তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে তখন আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তুমি নিজে রাজি হয়ে তাদের সমান অধিকার দিলে, বললে যে 'তোমাতে আমাতে আর বিভিন্নতা রইল না', তবে আজ কেন খুঁৎখুঁৎ কর? কিন্তু লোকে তা করে থাকে। আমাকে যদি কোনো লেখক তার লেখা শোনাতে আসে আর বিশেষ করে বলে যে 'তুমি খুব স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ কোরো, আমার কিছু মাত্র কষ্ট হবে না'— তা শুনেই যে আমি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করি তা নয় ; কেননা আমি মনে করি, ও ব্যক্তি অত করে বলছে যখন, তখন ওর ধ্রুব বিশ্বাস যে ওর লেখায় এমন কোনো দোষ নেই যা আমি বের করতে পারি। আমি এখেনে দুজন ব্যক্তিকে বাংলা পড়াতেম, তাঁদের দুজনের মধ্যে যিনি একটু ভালো পড়তে পারতেন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'আমাদের দুজনের মধ্যে কে শীঘ্র শিখতে পারে?' আমি একটু ইতস্ততঃ করাতে তিনি বললেন, 'তোমার কিছু মাত্র ভয় নেই, আমাকে নিন্দে করলে আমার তিলমাত্র কষ্ট হবে না।' অত করে কেন বললেন জানো? তিনি মনে মনে বিলক্ষণ জানতেন যে, আমি তাঁর প্রশংসা করব। যিনি ভালো শিখতে পারতেন না, তিনি আমাকে ও কথা জিজ্ঞাসাই করতেন না। এক দল বিজ্ঞ বৃদ্ধ তাঁদের সভায় আমাকে প্রবেশ করতে অনুমতি দিয়ে বলতে পারেন যে 'আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে তর্ক বিতর্ক করতে তোমাকে পূর্ণ অধিকার দিলেম', কিন্তু সমান ভাবে তর্ক বিতর্ক করতে গেলে তাঁরা মনে মনে রাগ করতে ক্রুটি করেন না। এর দুটো কারণ থাকতে পারে ; এক, তাঁরা যখন অধিকার দেন তখন তাঁদের মনে মনে বিশ্বাস থাকে যে, বিজ্ঞতায় ও বালকের চেয়ে আমরা এত শ্রেষ্ঠ যে আমাদের কাছে ও ঠোঁট খুলতে

পারবে না ; নয়, তাঁদের সকলের মত এই যে, বালকের কাছ থেকেও জ্ঞান শিক্ষা করা যায়— কিন্তু সে মতের চারাগাছটি তাঁদের মাথায় সবে জন্মেছে মাত্র, তার ডালপালা হৃদয় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে নি। তাঁদের মত বটে যে, সকলকে সমভাবে দর্শন করা উচিত ; কিন্তু সমভাবে দর্শন করা তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাঁদের মত যতক্ষণ কার্যক্ষেত্রে না নাবে ততক্ষণ 'তাঁরা সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবেন' এই কল্পনার উপর বিশ্বাস করে দশ জনকে সমবেত করলেন ; কিন্তু যেই তাঁরা তাঁদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন অমনি দেখলেন তাঁদের বুকের ভিতরে লাগে। আমার বোধ হয়, ইংরাজ মেম্বরদের সঙ্গে আইরিশ মেম্বরদের এই রকম সম্পর্ক। পার্ল্যামেণ্টের কথা তবে আজ এই পর্যন্ত থাক্।

পঞ্চম পত্র

প্রাণীবৃত্তান্তের সূচিপত্রে ইঙ্গবঙ্গ-নামক এক অদ্ভুত নতুন জীবের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়— তাদের ক'টা ক্ষুর ক' পাটি দাঁত ও সিংহচর্ম তাদের গায়ে ঢিলে হয় কি কষা হয় তার বিস্তারিত বিবরণ -সমেত একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখবার বাসনা আছে, সকলে অবধান করো। 'এই বেড়াল বনে গেলেই বনবেড়াল হয়।' তোমাদের সেই বন্ধু, যে 'হংসমধ্যে বকো যথা' হয়ে তোমাদের মধ্যে থাকত, যার বুদ্ধির অভাব দেখে তোমরা অত্যন্ত ভাবিত ছিলে, ইস্কুলের মাস্টাররা যাকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘোড়া করবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই যখন এ বন থেকে ফিরে যাবে তখন তার ফুলোনো লেজ, বাঁকানো ঘাড়, নখালো থাবা

দেখে তোমরা আধখানা হয়ে পিছু হ'টে হ'টে দেয়ালের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নেবে। এ বিলেত-রাজ্য থেকে ফিরে গেলে পর বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধ-বেতালের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে একটি 'Oberon' ফিরবে, সে তোমাদের প্রতি লোকের চোখে এমন একটি মায়া-রস নিংড়ে দেবে যে, আমাকে যদি গর্দভ-মুখোষিত 'Bottom'এর মতোও দেখতে হয়, তবু তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।

বিলেতে নতুন এসেই বাঙালিদের চোখে কোন্ জিনিস ঠেকে, বিলিতি সমাজে নতুন মিশে প্রথমে বাঙালিদের কিরকম লাগে, সে-সকল বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপাততঃ কিছু বলব না। কেননা, এ-সকল বিষয় আমার বিচার করবার অধিকার নেই, যাঁরা পূর্বে বিলেতে অনেক কাল ছিলেন ও বিলেত যাঁরা খুব ভালো করে চেনেন তাঁরা আমাকে সঙ্গে করে এনেছেন ও তাঁদের সঙ্গেই আমি বাস করছি। বিলাতে আসবার আগেই বিলেতের বিষয় তাঁদের কাছে অনেক শুনতে পেতেম, সুতরাং এখানে এসে খুব অল্প জিনিস নিতান্ত নতুন মনে হয়েছে, এখানকার লোকের সঙ্গে মিশতে গিয়ে প্রতি পদে হুঁচট খেয়ে খেয়ে আচার ব্যবহার আমাকে শিখতে হয় নি। এখানকার সমাজের স্ফটিকশালায় প্রবেশ ক'রে যখনি জল মনে করে কাপড় তুলতে গিয়েছি তখনি আমার সঙ্গী আমাকে চোখ টিপে বলে দিয়েছেন, 'এ জল নয়, এ মেজে।' সুতরাং আমাকে অপ্রস্তুত হতে হয় নি। এখানকার চাকচিক্যময় সমাজের দেয়াল-ব্যাপী আয়না দেখে আমি দরজা মনে করে যেমন সেই দিকে যাবার উদ্যোগ করেছি আমার সঙ্গী অমনি আমার কানে কানে বলে দিয়েছেন যে, 'এ দরজা নয়, এ দরজা নয়, এ দেয়াল।' সুতরাং মাথা ঠুকে ঠুকে আমাকে শিখতে হয় নি যে, সেটা দরজা নয়, দেয়াল। অন্ধকারে প্রথম এলে কিছু দেখা যায়

না, অনেক ক্ষণ থাকলে— অন্ধকার চোখে অনেকটা সয়ে গেলে তার পরে চার দিকের জিনিস দেখা যায়। কিন্তু আমাকে সে রকম করে দেখতে হয় নি, আমার সঙ্গেই আলো ছিল। আমি তাই ভাবছি যে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় আপাততঃ তোমাদের কিছু বলব না। এখানকার দুই-এক জন বাঙালির মুখে তাঁদের যে রকম বিবরণ শুনেছি তাই তোমাদের লিখছি।

জাহাজে তো তাঁরা উঠলেন। যাত্রীদের সেবার জন্যে জাহাজে অনেক ইংরেজ চাকর থাকে, তাদের নিয়েই এঁদের প্রথম গোল বাধে। এঁরা অনেকে তাদের 'সার-সার' (Sir) বলে সম্বোধন করতেন, তাদের কোনো কাজ করতে হুকুম দিতে তাঁদের বাধো-বাধো করত। জাহাজে তাঁরা অত্যন্ত সসংকোচভাবে থাকতেন। 'কোথায় কী করতে হবে রে বাপু! গোরা-কাপ্তেন গোরা-মাঝি পাছে রুখে দু কথা শুনিয়ে দেয়, নিতান্তই তাদের আশ্রয়ে আছি— কালো মানুষ দেখেও যে টিকিট কিনতে দিয়েছেন এই তাঁদের যথেষ্ট অনুগ্রহ!' তাঁরা বলেন, সকল বিষয়েই তাঁদের-যে ও রকম সংকোচ বোধ হত তার আর একটা কারণ ছিল— 'এক জন ইংরাজ যাত্রীর চেয়ে আমাদের ও রকম সংকোচের ত্রস্ত অবস্থা কেন হয় জানো? সেটা কেবল ভয়ে নয়, তার সঙ্গে কতকটা লজ্জাও আছে। আমাদের কপালে নেটিব ব'লে একেবারে মার্কা মারা ছিল; আমরা যদি একটা কোনো দস্তুরবিরুদ্ধ কাজ করি তা হলে সাহেবরা হেসে উঠবেন, বলবেন ওটা অসভ্য— কিছু জানে না। তাই জন্যে যে কাজ করতে যাই, মনে হয়, পাছে এটা বেদস্তুর হয়ে পড়ে, আর বেদস্তুর কাজ করলে তারা হুট করে তাড়িয়েই বা দেয়, আর যদি বা তাড়িয়ে না দেয়, নেটিব ব'লে হেসেই বা ওঠে!' জাহাজে ইংরাজদের সঙ্গে মেশা বড়ো হয়ে ওঠে না। যে সাহেবেরা

তখন জাহাজে থাকেন তাঁরা টাটকা ভারতবর্ষ থেকে আসছেন ; সে 'হুজুর ধর্মাবতার'গণ কৃষ্ণবর্ণ দেখলে নাক তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে চলে যান ও এই ঘোরতর তাচ্ছিল্যের স্পষ্ট লক্ষণগুলি সর্বাঙ্গে প্রকাশ ক'রে কৃষ্ণচর্মের মনে দারুণ বিভীষিকা সঞ্চার করেছেন জেনে মনে মনে পরম সন্তোষ উপভোগ করেন। মাঝে মাঝে ভদ্র ইংরাজ দেখতে পাবে, তাঁরা হয়তো তোমাকে নিতান্ত সঙ্গীহীন দেখে তোমার সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করবেন। জানবে তাঁরা যথার্থ ভদ্র, অর্থাৎ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের লোক, বংশাবলীক্রমে তাঁরা ভদ্রতার বীজ পেয়ে আসছেন, তাঁরা এখানকার কোনো অজ্ঞাত কুল থেকে অখ্যাত নাম নিয়ে ভারতবর্ষে গিয়ে হঠাৎ ফেঁপে ফুলে ফেটে আটখানা হয়ে পড়েন নি। এখানকার গলিতে গলিতে যে 'জন জোন্‌স্ টমাস'-গণ কিলবিল করছে, যাদের মা বাপ বোনকে একটা কসাই একটা দরজী ও এক জন কয়লা-বিক্রেতা ছাড়া আর কেউ চেনে না, তারা ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে পদার্পণ করে সে অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের নাম রাষ্ট্র হয়ে যায়— যে রাস্তায় তারা চাবুক হস্তে ঘোড়ায় চড়ে যায় (হয়তো সে চাবুক কেবল মাত্র ঘোড়ার জন্যেই ব্যবহার হয় না) সে রাস্তা-সুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়— তাদের এক-একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের এক-একটা রাজার সিংহাসন কেঁপে ওঠে— এ রকম অবস্থায় সে ভেকদের পেট উত্তরোত্তর ফুলতে ফুলতে যে হস্তীর আকার ধারণ করবে আমি তো তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাই নে। তারা রক্তমাংসের মানুষ বৈ তো নয়। যে দেশেই দেখো-না কেন, ক্ষুদ্র যখনি মহান পদ পায় তখনি সে চোক রাঙিয়ে, বুক ফুলিয়ে, মহত্ত্বের একটা আড়ম্বর আস্ফালন করতে থাকে। এর অর্থ আর কিছু নয়— তারা মহত্ত্বের শিক্ষা পায় নি। যে সাঁতার

জানে না তাকে জলে ছেড়ে দেও, সে অবিশ্রান্ত হাত পা ছুঁড়তে থাকবে ; তার কারণ, সে জানে না যে ভেসে থাকবার জন্যে অল্প কৌশল আছে। যে কোনো জন্মে ঘোড়া চালায় নি তাকে ঘোড়া চালাতে দেও, ঘোড়া বিপথে গেলে সে চাবুক মেরে মেরেই তাকে জর্জরিত করবে ; কেননা, সে জানে না যে একটু লাগাম টেনে দিলেই তাকে সোজা পথে আনা যায়। কিন্তু ভদ্র ইংরেজদের দেখো, তাঁদের কী সুন্দর মন ! মাঝে মাঝে এক-একটি ভদ্র সাহেবকে দেখা যায়, তাঁরা আংগ্লো-ইন্‌ডিয়ানত্বের ঘোরতর সংক্রামক রোগের মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন, অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা পেয়েও উদ্ধত গর্বিত হয়ে ওঠেন না। সমাজশৃঙ্খলচ্ছিন্ন হয়ে সহস্র সহস্র সেবকদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ভারতবর্ষে থাকা—উন্নত ও ভদ্র মনের এক প্রকার অগ্নিপরীক্ষা।—দূর হোক্‌গে, আমি কী কথা বলতে কী কথা পাড়লেম দেখো!— যা হোক, এতক্ষণে জাহাজ সাউথ্‌হ্যাম্প্‌টনে এসে পৌঁচেছে, বঙ্গীয় যাত্রীরা বিলেতে এসে পৌঁছলেন। লন্‌ডন-উদ্দেশে চললেন। ট্রেন্‌ থেকে নাববার সময় একজন ইংরাজ গার্ড্‌ এসে উপস্থিত। বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তাঁদের কী প্রয়োজন আছে, কী করে দিতে হবে। তাঁদের মোট নাবিয়ে দিলে, গাড়ি ডেকে দিলে। তাঁরা মনে মনে বললেন, 'বাঃ! ইংরেজরা কী ভদ্র!' ইংরেজরা যে এত ভদ্র হতে পারে তা তাঁদের জ্ঞান ছিল না। অবিশ্যি তার হস্তে একটি শিলিং গুঁজে দিতে হল ; কিন্তু তা হোক, আমাদের দেশে শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে একটু আদর ও ভদ্রতা পাবার প্রত্যাশে রাজা-রায়বাহাদুররা কত হাজার হাজার টাকা খরচ করছেন, তবুও ভালো করে কৃতকার্য হতে পারছেন না। এ জেনে এক জন নবাগত বঙ্গযুবক এক জন যে-কোনো শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে একটি মাত্র সেলাম পেতে অকাতরে

এক শিলিং ব্যয় করতে পারেন। যা হোক, বিলেতে প্রথম পদার্পণ করবামাত্রেই তাঁরা এই অতি নতুন ও আশ্চর্য জ্ঞান লাভ করেন যে, ইংরাজরা কী ভদ্র! আমি যাঁদের বিষয় লিখছি তাঁরা অনেক বৎসর বিলাতে আছেন, বিলেতের নানা প্রকার ছোটোখাটো জিনিস দেখে তাঁদের কিরকম মনে হয়েছিল তা তাঁদের স্পষ্ট মনে নেই। যে-সব বিষয় তাঁদের বিশেষ মনে লেগেছিল তাই এখনও তাঁদের মনে আছে। তাঁরা বিলেতে আসবার পূর্বে তাঁদের বিলিতি বন্ধুরা এখানে তাঁদের জন্যে ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন। ঘর ঢুকে দেখেন— ঘরে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ছবি টাঙানো, একটা বড়ো আয়না এক জায়গায় ঝোলানো রয়েছে, কৌচ, কতকগুলি চৌকি, দুই-একটা কাঁচের ফুলদানি, এক পাশে একটি ছোটো পিয়ানো। কী সর্বনাশ! তাঁদের বন্ধুদের ডেকে বললেন, 'আমরা কি এখেনে বড়োমানুষি করতে এসেছি? আমাদের, বাপু, বেশি টাকাকড়ি নেই; এ রকম ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে না!' তাঁদের বন্ধুরা অত্যন্ত আমোদ পেলেন; কারণ, তখন তাঁরা একেবারে ভুলে গেছেন যে বহুপূর্বে তাঁদেরও এক দিন এই রকম দশা ঘটেছিল। নবাগতদের নিতান্ত অন্নজীবী বাঙালি মনে করে অত্যন্ত বিজ্ঞতার স্বরে সেই বন্ধুরা বললেন, 'এখানকার সকল ঘরই এই রকম।' তাঁরা বললেন, 'বটে!' দেশের উপর বৈরাগ্যের এই তাঁদের প্রথম সূত্রপাত হল। তাঁরা বলেন, 'আমাদের দেশে সেই একটা স্যাঁৎসেঁতে ঘরে একটা তক্তা ও তার উপরে একটা মাদুর পাতা, ইতস্ততঃ হুঁকোর বৈঠক রয়েছে, কোমরে একটুখানি কাপড় জড়িয়ে জুতো জোড়া খুলে দু চার জনে মিলে শতরঞ্চ খেলা যাচ্ছে, বাড়ির উঠোনে একটা গোরু বাঁধা, দেয়ালে গোবর দেওয়া, বারান্দা থেকে ভিজে কাপড় শুকোচ্ছে ইত্যাদি। সেখান থেকে এসে এ কার্পেট-মোড়া

চিত্রিত-দেয়াল চৌকি-টেবিল-সমাকুল ঘরে বাস করতে পাওয়া অনেক জন্মের অনেক তপস্যার ফল বলে মনে হয়।' তাঁরা বলেন— প্রথম প্রথম দিনকতক তাঁদের সে ঘর কেমন আপনার মতো মনে হত না; চৌকিতে বসতে, কৌচে শুতে, টেবিলে খেতে, কার্পেটে বিচরণ করতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ হত। কৌচে বসতে হলে অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে বসতেন; ভয় হত, পাছে কৌচ ময়লা হয়ে যায় বা কোনো প্রকার হানি হয়। তাঁদের মনে হত, কৌচগুলো কেবল ঘর সাজাবার জন্যেই রেখে দেওয়া হয়েছে, ওগুলো ব্যবহার করতে দিয়ে মাটি করা কখনই ঘরের কর্তার অভিপ্রেত হতে পারে না। ঘরে এসে প্রথম মনের ভাব তো এই। তার পরে আর-একটি প্রধান কথা বলা বাকি আছে।

বিলেতে ছোটোখাটো বাড়িতে 'বাড়িওয়ালা' বলে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে হয়তো; কিন্তু যাঁরা বাড়িতে থাকেন, 'বাড়িওয়ালী'র সঙ্গেই তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া, কোনো প্রকার বোঝাপড়া আহারাদির বন্দোবস্ত করা, সে-সমস্তই বাড়িওয়ালীর কাছে। আমার বন্ধুরা যখন প্রথম বাড়িতে পদার্পণ করলেন, দেখলেন, এক বিবি এসে অতি বিনীত স্বরে তাঁদের 'সুপ্রভাত' অভিবাদন করলে; তাঁরা নিতান্ত শশব্যস্ত হয়ে ভদ্রতার যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়ে অতি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন তাঁদের অন্যান্য ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুগণ তার সঙ্গে অতি অসংকুচিত স্বরে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন, তখন আর তাঁদের বিস্ময়ের আদি অন্ত রইল না। মনে করো একটা জীবন্ত বিবি— জুতো-পরা, টুপি-পরা, গাউন-পরা! তখন সে ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুদের উপর সেই নবাগত বঙ্গযুবকের অত্যন্ত ভক্তির উদয় হল, কোনো কালে যে এই অসমসাহসিকদের মতো তাঁদেরও

বুকের পাটা জন্মাবে তা তাঁদের সম্ভব বোধ হল না। যা হোক, এই নবাগতদের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুগণ স্ব স্ব আলয়ে গিয়ে সপ্তাহকাল ধরে তাঁদের অজ্ঞতা নিয়ে অপর্যাপ্ত হাস্যকৌতুক করলেন। পূর্বোক্ত গৃহকর্ত্রী প্রত্যহ নবাগতদের অতি-বিনীতভাবে কী চাই কী না চাই জিজ্ঞাসা করতে আসত। তাঁরা বলেন, এই উপলক্ষে তাঁদের অত্যন্ত আহ্লাদ হত। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, প্রথম দিন, যে দিন তিনি এই বিবিকে একটুখানি ধমকাতে পেরেছিলেন, সে দিন সমস্ত দিন তাঁর মন অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল। জীবনের মধ্যে এই প্রথম একজন ইংরেজকে একজন বিবিকে ধমকাতে পেরেছিলেন, অথচ সে দিন সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে নি, পর্বত চলাফেরা করে বেড়ায় নি, বহ্নিও শীতলতা প্রাপ্ত হয় নি!

কার্পেট-মোড়া ঘরে তাঁরা অত্যন্ত সুখে বাস করছেন। তাঁরা বলেন, 'আমাদের দেশে 'আমার নিজের ঘর' বলে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ছিল না। আমি যে ঘরে বসতেম সে ঘরে বাড়ির দশজনে যাতায়াত করছে; আমি এক পাশে বসে লিখছি, দাদা এক পাশে একখানা বই হাতে করে ঢুলছেন, আর-এক দিকে মাদুর পেতে গুরুমশায় ভুলুকে উচ্চৈঃস্বরে সুর করে করে নামতা পড়াচ্ছেন। এখানে আমার নিজের ঘর আমার নিজের মনের মতো করে সাজালেম, সুবিধামত করে বইগুলি এক দিকে সাজালেম, লেখবার সরঞ্জাম এক দিকে গুছিয়ে রাখলেম, কোনো ভয় নেই যে একদিন পাঁচটা ছেলে মিলে সে-সমস্ত ওলটপালট করে দেবে, আর-এক দিন ছুটোর সময় কালেজ থেকে এসে দেখব তিনটে বই পাওয়া যাচ্ছে না— অবশেষে অনেক খোঁজ্ খোঁজ্ ক'রে দেখা যাবে বাড়ির ভিতরে মেঝমাসিমার কুলুঙ্গির উপর একখানা, দাদার বালিশের

নীচে একখানা, আর-একখানি নিয়ে আমার ছোটো ভাগ্নীটি তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহচরীদের ডেকে ছবি দেখতে ঘোরতর ব্যস্ত আছেন। এখানে তোমার নিজের ঘরে তুমি বসে থাকো— দরজাটি ভেজানো, সট্ করে না বলে কয়ে কেউ ঘরের মধ্যে এসে পড়ে না, ঘরে ঢোকবার আগে দরজায় শব্দ করে, ছেলেপিলেগুলো চারি দিকে চেঁচামেচি কান্নাকাটি জুড়ে দেয় নি, নিরিবিলি নিরালা, কোনো হাঙ্গাম নেই।' স্বদেশের উপর ঘৃণা জন্মাবার সূত্রপাত এই রকম করে হয়। তার পরে একবার যখন তোমার মন বিগড়ে যায় তখন তুমি খিট্‌খিটে হয়ে ওঠ, দেশের আর কিছুই ভালো লাগে না, নানাপ্রকার খুঁটিনাটি ধরতে প্রবৃত্তি হয়। তার পরে যখন বিবিদের সমাজে মিশতে আরম্ভ কর তখন দেশের উপর ঘৃণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। প্রায় দেখা যায়, আমাদের দেশের পুরুষরা এখানকার পুরুষসমাজে বড়ো মেশেন না; তার কতকগুলি কারণ আছে। এখানকার পুরুষসমাজে মিশতে গেলে এক রকম বলিষ্ঠ স্ফূর্তির ভাব থাকা চাই; মাথা চুলকোতে চুলকোতে বাধো-বাধো নাকি-সুরে দু-চারটে সসংকোচ 'হাঁ না' দিয়ে গেলে চলে না, খুব প্রাণ খুলে কথা কওয়া চাই, পাঁচটা লোক দেখেই একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছি —এ রকম ভাব প্রকাশ না পায়। রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অবাধে তোমার স্বাধীন মত ব্যক্ত করবে; তোমাকে কেউ ঠাট্টা করলে তুমি অমনি শরমে মরে যেয়ো না, তুমিও তোমার আলাপীর সঙ্গে ঠাট্টা করে মজা করে ঘর সরগরম করবে। বহুদিনের পর তোমার পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে 'Hallo my old boy' বলে খুব সবল সেক্‌হ্যান্ড্ করবে আর খুব গড়্‌গড়্ করে কথা কয়ে যাবে। কিন্তু বাঙালিদের এ রকম ভাব প্রায় দেখা যায় না। বাঙালি অভ্যাগত ডিনার-টেবিলে তার পার্শ্বস্থ মহিলাটির

কানে কানে অতি মৃদু ধীর স্বরে মিষ্টি-মিষ্টি টুকরো-টুকরো দুই-একটি কথা আধো-আধো গলানো সুরে কইতে পারেন, কোমল মধুর হাসি হাসতে হাসতে দুটো রসগর্ভ বাক্য বলতে পারেন, আর সে মহিলার সহবাসে তিনি যে স্বর্গসুখ উপভোগ করছেন তা তাঁর মাথার চুল থেকে বুট-জুতোর আগা পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে— সুতরাং, বিবি-সমাজে বাঙালিরা খুব পসার করে নিতে পারেন। এখানকার পুরুষসমাজে মিশতে গেলে অনেক পড়াশুনো থাকা চাই, নইলে অনেক কথায় অপ্রস্তুত হতে হয়। একটা বড়ো কথা পড়লে আমরা আমাদের পুরাতন চাণক্য ঋষির উপদেশ স্মরণ করি— অর্থাৎ, 'তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে'। কিন্তু পুরুষ সঙ্গীদের কথাবার্তায় খুব যোগ না দিলে তেমন মেশামেশি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। মহিলাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে আমাদের বড়ো শিক্ষার দরকার করে না, সে বিষয়ে আমাদের অশিক্ষিতপটুত্ব। আমাদের দেশের ঘোমটাচ্ছন্ন-মুখচন্দ্র-শোভী অনালোকিত অন্তঃপুর থেকে এখানকার রূপের মুক্তজ্যোৎস্নায় এসে আমাদের মন-চকোর প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে।

একদিন আমাদের নবাগত বঙ্গযুবক তাঁর প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। নিমন্ত্রণসভায় বিদেশীর অত্যন্ত সমাদর। তিনি গৃহস্বামীর যুবতী কন্যা Miss অমুকের বাহুগ্রহণ করে আহারের টেবিলে গিয়ে বসলেন। মিসের প্রতি হাসি প্রতি কথা তাঁর হৃদয়ের সমুদ্রে এক-একটা বিপর্যয় তরঙ্গ তুলতে লাগল। আমরা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মুক্তভাবে মিশতে পাই নে, তার পরে নতুন-নতুন এসে এখানকার স্ত্রীলোকদের ভাবও ঠিক বুঝতে পারি নে। আমরা কোনো অপরিচিত মহিলার মুখ থেকে দুটো কথা শুনতে পেলে আহ্লাদে গ'লে পড়ি, সামাজিকতার

অনুরোধে তারা আমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে যে-সকল কথাবার্তা হাস্যালাপ করে আমরা তার ঠিক মর্মগ্রহণ করতে পারি নে, আমরা হঠাৎ মনে করি— আমাদের ওপরেই এই মহিলাটির বিশেষ অনুকূল দৃষ্টি, নইলে এত হাসি এত কথা কেন? যা হোক, আমাদের বঙ্গযুবকটি তাঁর এই প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে এক জন মহিলা, বিশেষতঃ এক জন বিবির কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টহাসি ও মিষ্টালাপ পেয়ে অত্যন্ত উল্লসিত আছেন। তিনি মিস্‌কে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অনেক কথা বললেন; বললেন— তাঁর বিলেত অত্যন্ত ভালো লাগে, ভারতবর্ষে ফিরে যেতে তাঁর ইচ্ছে করে না, ভারতবর্ষে অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে। এ কথা বলার অভিপ্রায় এই যে, বিবিটির মনে বিশ্বাস হবে যে তিনি নিজে সমস্ত কুসংস্কার হতে মুক্ত। শেষকালে দুই-একটি মিথ্যে কথাও বললেন; বললেন, তিনি সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন, একবার নিতান্ত মরতে মরতে কেবল অসমসাহসিকতা করে বেঁচে গিয়েছিলেন। মিস্‌টি অতি সহজে বুঝতে পারলেন যে, এই যুবকের তাঁকে অতি ভালো লেগেছে, তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলেন ও তাঁর মিষ্টতম বাক্যবাণ যুবকের প্রাণে হানতে লাগলেন।— 'আহা, কী গোছালো কথা! কোথায় আমাদের দেশের মেয়েদের মুখের সেই নিতান্তশ্রমলভ্য দুই-একটি 'হাঁ না'— যা এত মৃদু যে ঘোমটার সীমার মধ্যেই মিলিয়ে যায়— আর কোথায় এখানকার বিম্বোষ্ঠনিঃসৃত অজস্র মধুধারা যা অযাচিত ভাবে মদিরার মতো মাথার শিরায় শিরায় প্রবেশ করে।' —প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে আমাদের বঙ্গযুবকের মনে এই কথাগুলি ওঠে। সেই দিনেই তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে চিঠি লেখা স্থগিত করলেন!

এখন তোমরা হয়তো বুঝতে পারছ, কী কী মশলার সংযোগে

বাঙালি বলে একটা পদার্থ ক্রমে বেঙ্গ্লো-অ্যাঙ্গ্লিক্যান কিম্বা ইঙ্গ-বঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়। আমি অতি সংক্ষেপে তার বর্ণনা করেছি, সমস্ত প্রক্রিয়াটি বিস্তারিত করে লিখতে পারি নি। আমি তার বড়ো বড়ো দুই-একটা কারণ দেখিয়েছি, কিন্তু এত-সব ছোটো ছোটো বিষয়ের সমষ্টি মানুষের মনে অলক্ষিত পরিবর্তন উপস্থিত করে যে, সে-সকল খুঁটিনাটি করে বর্ণনা করতে গেলে আমার পুঁথি বেড়ে যায় আর তোমাদের ধৈর্যও কমে যায়। সুতরাং এইখানেই সে-সকল বর্ণনা সমাপ্ত করা যাক।

এখন মনে করো, এক বৎসর বিলেতে থেকে বাঙালি তাঁর দেহের ও মনের প্রথম খোলস পরিত্যাগ করেছেন ও হ্যাট-কোট পরিধান করে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন ও মনে মনে কল্পনা করছেন যে, এতদিনে তিনি গুটিপোকাত্ব ত্যাগ করে প্রজাপতিত্বে উপস্থিত হয়েছেন। এই অবস্থায় তাঁকে একবার আলোচনা করে দেখা যাক। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি মহা চটে উঠেছ; তুমি বলছ, 'বিলেতে গিয়ে বাঙালিদের বর্ণনা করতে বসাও যা আর গোলকুণ্ডায় গিয়ে রানীগঞ্জের পাথুরে কয়লার বিষয় লেখাও তাই।' কিন্তু স্থির হও. আমি তোমাকে কারণ দেখাচ্ছি। আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি, বিলাতী বাঙালির চেয়ে নতুন দ্রব্য বিলেতে খুব কম আছে। ইংরাজ ও অ্যাঙ্গ্লো-ইন্‌ডিয়ান যেমন দুই স্বতন্ত্র জাত, বাঙালি ও ইঙ্গবঙ্গও তেমনি দুই স্বতন্ত্র জীব। এই জন্য ইঙ্গবঙ্গদের বিষয়ে তোমাদের যত নতুন কথা ও নতুন খবর দিতে পারব, এমন বিলেতের আর খুব কম জিনিসের উপর দিতে পারব। ইঙ্গবঙ্গদের সংখ্যা এত সামান্য যে তুমি মনে করতে পারো, আমি ব্যক্তি-বিশেষদের উপর কটাক্ষ করে বলছি। কিন্তু তা নয়— আমি ইঙ্গবঙ্গ দলের একটা সাধারণ আদর্শ কল্পনা করে নিয়েছি, আমার

চার দিককার অভিজ্ঞতা থেকে স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ বাঙালিদের বিলেতে এলে কী কী পরিবর্তন হতে পারে তাই ঠিক করেছি ও সেইগুলি সমষ্টিবদ্ধ করে একটা সমগ্র চিত্র আঁকতে চেষ্টা করছি।

. ইঙ্গবঙ্গদের ভালো করে চিনতে গেলে তাঁদের তিন রকম অবস্থায় দেখতে হয়। তাঁরা ইংরাজদের সুমুখে কিরকম ব্যবহার করেন, বাঙালিদের সুমুখে কিরকম ব্যবহার করেন ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গবঙ্গদের সুমুখে কিরকম ব্যবহার করেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলবেন, 'আমরা তিন জায়গায় সমান ব্যবহার করি, কেননা আমাদের একটা principle আছে।' কিন্তু সেটা একটা কথার কথা মাত্র, আমি সে কথা বড়ো বিশ্বাস করি নে। একটি ইঙ্গবঙ্গকে এক জন ইংরেজের সুমুখে দেখো, তাঁকে দেখলে তোমার চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। কেমন নম্র ও বিনীত ভাব! ভদ্রতার ভারে প্রতি কথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছে, মৃদু ধীর স্বরে কথাগুলি বেরচ্ছে; তর্ক করবার সময় অতিশয় সাবধানে নরম করে প্রতিবাদ করেন ও প্রতিবাদ করতে হল বলে অপর্যাপ্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, অসংখ্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং তাঁর অজস্র ভদ্রতা দেখে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সন্তুষ্টমনে প্রার্থনা করতে থাকেন যে তিনি যেন জন্ম-জন্ম এই রকম প্রতিবাদ করেন। কথা ক'ন আর না ক'ন, এক জন ইংরেজের কাছে এক জন ইঙ্গবঙ্গ চুপ করে বসে থাকলেও তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গী প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু, তাঁকেই আবার তাঁর স্বজাতিমণ্ডলে দেখো, দেখবে তিনিই একজন মহা তেরিয়া-মেজাজের লোক। বিলেতে যিনি তিন বৎসর আছেন, এক-বৎসরের-বিলেত-বাসীর কাছে তাঁর অত্যন্ত পায়া ভারী! এই 'তিন বৎসর' ও 'এক বৎসরের' মধ্যে যদি কখনও তর্ক ওঠে, তা হলে তুমি 'তিন বৎসরের' প্রতাপটা

একবার দেখতে পাও। তিনি প্রতি কথা এমন ভাবে এমন স্বরে বলেন যে, যেন সেই কথাগুলি নিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বোঝাপড়া হয়ে একটা স্থিরসিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। যিনি প্রতিবাদ করছেন তাঁকে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন 'ভ্রান্ত', কখনও বা মুখের ওপর বলেন 'মূর্খ!' তাঁর ভদ্রতা একটি গণ্ডীর মধ্যে বাস করে, তার বাইরে প্রায় পদার্পণ করে না। ব্যক্তিবিশেষের জন্যে তিনি তাঁর ভদ্রতার বিশেষ বিশেষ মাত্রা স্থির করে রেখেছেন। ইংলন্‌ডে যারা জন্মেছে তাদের জন্যে বড়ো চামচের এক চামচ— ইংলন্‌ডে যারা পাঁচ বৎসর আছে তাদের জন্যে মাজারি চামচের এক চামচ— ইংলন্‌ডে যারা সম্প্রতি এয়েছে তাদের জন্যে চায়ের চামচের এক চামচ ও ইংলন্‌ডে যারা যায় নি তাদের জন্যে ফোঁটা দুই-তিন ব্যবস্থা! ইংলন্‌ডের সঙ্গে সম্পর্কের ন্যূনাধিক্য নিয়ে তাঁদের ভদ্রতার মাত্রার ন্যূনাধিক্য হয়। তাঁদের মাপাজোকা ভদ্রতার পায়ে গড় করি, তাঁদের 'principle'এর পায়ে গড় করি।

বিলেতে এলে লোকে 'principle' 'principle' করে মহা কোলাহল করতে থাকে, কিন্তু আমি ও রকম বাক্যের আড়ম্বর সইতে পারি নে। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, 'বাস্তবিক কি তোমরা একটা স্থির মত বেঁধেছ? আর সে মতগুলি বাঁধবার আগে কেন যে সেগুলি গ্রহণ করলে তা কি বিচার করে দেখেছ?' তাঁরা সকলেই বলে উঠবেন 'হাঁ'; কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি, তাঁদের মধ্যে শতকরা নিরেনব্বুই জন তা করেন নি। ইংরেজরা তাঁদের যদি বলে যে কাকে তাঁদের কান উড়িয়ে নিয়ে গেছে তা হলে কানে হাত না দিয়ে তাঁরা কাকের পশ্চাতে পশ্চাতে ছোটেন। সে দিন একজন গল্প করছিলেন যে তাঁকে আর এক জন বাঙালি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'মশায়ের কী কাজ করা হয়?' এই গল্প

শুনবামাত্র আমাদের একজন ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠলেন, 'দেখুন দেখি, কী barbarous!' আমি আর থাকতে পারলেম না— আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেম, 'কেন barbarous বুঝিয়ে দিন তো মশায়!' তিনি কোনো মতে বোঝাতে পারলেন না; তাঁর ভাবটা এই যে, যেমন মিথ্যে কথা না বলা, চুরি না করা নীতিশাস্ত্রের কতকগুলি মূল নিয়ম, তেমনি অন্য মানুষকে তার জীবিকার কথা জিজ্ঞাসা না করাও একটা মূল নিয়মের মধ্যে, তার জন্যে অন্য কারণ অনুসন্ধানের আবশ্যক করে না। আমি তাঁকে বললেম যে, 'দেখুন মশায়, ইংরেজরা একটা জিনিস মন্দ বলে ব'লে আপনি অবিচারে অকাতরে সেটাকে মন্দ বলবেন না। কেন ইংরেজরা মন্দ বলছে সেটা আগে বিচার করে দেখবেন, তার পরে যদি যুক্তিসিদ্ধ মনে হয় তা হলে নাহয় মন্দ বলবেন। চাকরির কথা জিজ্ঞাসা করা ইংরাজেরা যে কেন মন্দ বলে তার অবিশ্যি কারণ আছে— অল্প বেতনে আপনি হয়তো অতি সামান্য চাকরি করছেন, আপনাকে চাকরির কথা জিজ্ঞাসা করলে আপনার হয়তো উত্তর দিতে সংকোচ বোধ হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন barbarous বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন তখন এ-সকল কারণ বিবেচনা করেন নি।' এর থেকে বেশ বুঝতে পারবে যে, যে ইঙ্গবঙ্গগণ আমাদের দেশীয় সমাজে নানা প্রকার কুসংস্কার আছে বলে নাসা কুঞ্চিত করেন, বিলেত থেকে তাঁরা তাঁদের কোটের ও প্যাণ্টলুনের পকেট পূরে রাশি রাশি কুসংস্কার নিয়ে যান। কুসংস্কার আর কাকে বলে বলো। যতক্ষণে তুমি তোমার বিশেষ সংস্কারের একটা সন্তোষজনক কারণ দেখাতে না পারো ততক্ষণ আমি তাকে কুসংস্কার বলব। অতএব, হে ইঙ্গবঙ্গ, তুমি ভারতবর্ষের প্রতি সামাজিক আচার ব্যবহারকে যে prejudice বলে ঘৃণা কর, সেই ঘৃণা করাটাই হয়তো এক প্রকার

prejudice। তুমি হয়তো জান না যে তুমি কেন ঘৃণা করছ। তোমার হয়তো একটা দারুণ কুসংস্কার আছে যে তুমি ব্যতীত তোমার স্বদেশজাত আর-সমস্ত দ্রব্যই মন্দ। আমি এক-এক সময়ে ভাবি, একজন বুদ্ধিমান প্রাণীর মনে কিরকম করে এ রকম অন্ধ কুসংস্কার জন্মাতে পারে। সে দিন এক জায়গায় আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের কথা হচ্ছিল— বাপ-মা'র মৃত্যুর পর আমরা হবিষ্য করি, বেশভূষা করি নে ইত্যাদি। শুনে এক জন ইঙ্গবঙ্গ যুবক অধীরভাবে আমাকে বলে উঠলেন যে, 'আপনি অবিশ্যি, মশায়, এ-সকল অনুষ্ঠান ভালো বলেন না।' আমি বললেম, 'কেন নয়? মৃত আত্মীয়ের জন্যে শোক প্রকাশ করাতে আমি তো কোনো দোষ দেখি নে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে শোক প্রকাশ করবার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে। ইংরাজেরা কালো কাপড় প'রে শোক প্রকাশ করে ব'লে শাদা কাপড় পরে শোক প্রকাশ করা অসভ্যতার লক্ষণ মনে কোরো না। আমি দেখছি ইংরেজরা যদি আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে হবিষ্যান্ন খেত, আর আমাদের দেশের লোকেরা না খেত, তা হলে হবিষ্যান্ন খায় না ব'লে আমাদের দেশের লোকের ওপর তোমার দ্বিগুণতর ঘৃণা হত ও মনে করতে হবিষ্যান্ন খায় না ব'লেই আমাদের দেশের এই দুর্দশা, আর হবিষ্যান্ন খেতে আরম্ভ করলেই আমাদের দেশ উন্নতির চরম-শিখরে উঠতে পারবে।' এর চেয়ে কুসংস্কার আর কী হতে পারে! ইঙ্গবঙ্গরা বলেন, দেশে গিয়ে দেশের লোককে সন্তুষ্ট করবার জন্যে দেশের কুসংস্কারের অনুবর্তন করা ভীরুতা— শুদ্ধ তাই নয়, তাঁদের মহামান্য principleএর বিরুদ্ধাচরণ। এ কথা শুনতে বেশ, কিন্তু এই মহাবীরদের একবার জিজ্ঞাসা করো তাঁরা বিলেতে কী করেন। তাঁরা ঘাড় নত করে ইংরাজদের কুসংস্কারের অনুসরণ করেন কি না? তাঁরা জানেন সেগুলি কুসংস্কার, তবু জেনে-শুনে

সেগুলি পালন করেন কি না? তুমি হয়তো জানো ইংরেজেরা এক টেবিলে তেরো জন খাওয়া অত্যন্ত অলক্ষণ মনে করেন, তাঁদের বিশ্বাস তা হলে এক বৎসরের মধ্যে তাঁদের একজনের মৃত্যু হবেই। এক জন ইঙ্গবঙ্গ যখন নিমন্ত্রণ করেন তখন কোনোমতে তেরো জন নিমন্ত্রণ করেন না; জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'আমি নিজে অবিশ্যি বিশ্বাস করি নে, কিন্তু যাঁদের নিমন্ত্রণ করি তাঁরা পাছে কষ্ট পান তাই জন্যে বাধ্য হয়ে এ নিয়ম পালন করতে হয়।' খুব উদারহৃদয় বটে! কিন্তু দেশে গিয়ে এ উদারতা কোথায় থাকে? তুমি হয়তো একটি সামান্য দেশাচার পালন করলে তোমার বাপ মা, ভাই বোন, তোমার সমস্ত দেশের লোক অত্যন্ত আহ্লাদিত হন; তখন কি তুমি তাঁদের সকলের মনে কষ্ট দিয়ে সেই দেশাচারের উপর তোমার বুট-সুদ্ধ পদাঘাত কর না? এইরূপ পদাঘাত করতে পারলে ব'লে কি সমস্ত বৎসরটা অত্যন্ত মনের আনন্দে থাক না? সে দিন এক জন ইঙ্গবঙ্গ একটি বালককে রবিবার দিনে রাস্তায় খেলা করতে যেতে বারণ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, 'রাস্তার লোকেরা কী মনে করবে?' রাস্তার লোকের কুসংস্কারের অনুবর্তন করে তিনি যদি রবিবারে খেলা না করেন, তবে আত্মীয়স্বজনের কুসংস্কার বা সুসংস্কার বা নির্দোষ সংস্কার হুট করে রামনবমীর দিনে তিনি দেশে গোমাংস ভক্ষণ করেন কেন? *Principle !!!*

কুসংস্কার মানুষকে কতদূর অন্ধ করে তোলে তা বাঙলার অশিক্ষিত কৃষীদের মধ্যে অনুসন্ধান করবার আবশ্যক করে না, ঘোরতর সভ্যতাভিমানী বিলিতি বাঙালিদের মধ্যে তা দেখতে পাবে। হঠাৎ বিলেতের আলো লেগে তাঁদের চোখ একেবারে অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিলেতের কী দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে পড়েন?

আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি— কেবল বাহ্য-চাকচিক্য। এ বিষয়ে তাঁরা ঠিক বালকের মতো। একখানি বই দেখলে তাঁরা তার সোনার-জলের-চিত্র-করা বাঁধানো মলাট দেখে হাঁ করে থাকেন, তার ভিতরে কী লেখা আছে তার বড়ো খবর রাখেন না। কতকগুলি বাঙালি বলেন, এখানকার মতো ঘর ভাড়া দেবার প্রথা তাঁরা আমাদের দেশে প্রচলিত করবেন। তাঁদের সেই একটিমাত্র সাধ আছে। তাঁদের চোখে বিলেতের আর-কিছু তেমন পড়ে নি, যেমন, বিলেতের ঘর ভাড়া দেবার প্রথা! আর এক জন বাঙালি, তিনি আমাদের বাঙালা সমাজসংস্কার করতে চান, তাঁর প্রধান বাতিক— তিনি আমাদের দেশের মেয়েদের নাচ শেখবার বন্দোবস্ত করে দেবেন। বিলেতের সমাজে মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে একত্রে নাচটাই তাঁর চোখে অত্যন্ত ভালো লেগেছে ও আমাদের সমাজে মেয়েদের না নাচাই তাঁর প্রধান অভাব বলে মনে হয়— তিনি এখানকার সমাজসমুদ্র মন্থন করে ঐ নাচটুকুই পেয়েছেন। এই রকম বিলেতের কতকগুলি ছোটোখাটো বিষয়ই তাঁদের চোখে পড়ে। তাঁরা বিশেষ কী কী কারণে বিলেতের ওপর এত অনুরক্ত ও আমাদের দেশের ওপর এত বিরক্ত হয়ে ওঠেন তা যদি দেখতে যাও তো দেখবে সে-সকল অতি সামান্য— আমি পূর্বেই তা সংক্ষেপে বলেছি। প্রথমতঃ, এখানকার সুসজ্জিত পরিষ্কার পরিপাটী নিরিবিলি বাসস্থানে স্বাধীনভাবে বাস করবার বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়তঃ, এখানকার মহিলাদের সঙ্গে মেশামেশি; তাদের মৃদুহাসি মিষ্টালাপ শিষ্টাচার এক জন বঙ্গযুবকের মাথা অতি শীঘ্র ঘুরিয়ে দেয়। তিনি আমাদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে এখানকার মেয়েদের তুলনা করতে থাকেন। দেখেন, এখানকার মেয়েরা কেমন স্পষ্ট ও মিষ্ট কথা কয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর পাবার জন্যে বছর পাঁচেক অপেক্ষা

করতে হয় না; তাদের মুখের উপরও যেমন ঘোমটার আবরণ নেই তেমনি তাদের প্রতি আচার ব্যবহারের উপরে এক প্রকার কষ্টকর সংকোচের আবরণ নেই। এই রকম কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে আমাদের দেশের ও এ দেশের মেয়েদের অমিল দেখে তার পরে তিনি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে ছেলেমানুষের মতো খুঁৎখুঁৎ করতে থাকেন। যে বালকের মাটির পুতুল আছে সে আর-একটি বালকের কাঠের পুতুল দেখে প্রথমতঃ তার নিজের কাঠের পুতুল নেই বলে কাঁদতে বসে; এই রকমে তার নিজের পুতুলের ওপর যখন একবার বৈরাগ্য জন্মায় তখন সেই কাঠের পুতুলের কানে একটা মাকড়ি দেখে তার খুঁৎখুঁৎ দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে; তখন বিবেচনা করে না যে, সেই কাঠের পুতুলের কানে যেমন একটা মাকড়ি আছে তেমনি তার মাটির পুতুলের গলায় একটা হার আছে। তার মা এসে বলে, 'আচ্ছা বাপু, তোর পুতুলের হাতে একটা বালা পরিয়ে দিচ্ছি।' সে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করে বলে ওঠে, 'না, আমার মাকড়ি চাই!' তার মা বলে, 'আচ্ছা বাপু, একটা মল দিচ্ছি নাহয়!' সে দ্বিগুণ পা ছুঁড়ে বলে ওঠে, 'না, আমাকে মাকড়ি দে।' ইঙ্গবঙ্গেরা কতকটা এই রকম করেন। এক জন ইঙ্গবঙ্গ মহা খুঁৎখুঁৎ করছিলেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পারে না ও এখানকার মতো visitorদের সঙ্গে দেখা করতে ও visit প্রত্যর্পণ করতে যায় না। হরি হরি! তুমি কী করে আশা করতে পারো যে আমাদের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পারবে? তা হলে এক জন বাঙালি এখানে এসে খুঁৎখুঁৎ করতে পারে যে, এ দেশের মেয়েরা পান সাজতে পারে না। দেশে থাকতে একবার শুনেছিলেম যে, আমাদের দেশের মেয়েদের উপর এক জন বাঙালির অভক্তি

জন্মাবার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, 'ইংরাজের মেয়েরা এমন সরেশ লেবুর আচার তৈরি করতে পারে যে তার ভিতরে বিচি থাকে না, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা তো তা পারে না।' এ গল্পটা আমার নিতান্ত জনশ্রুতি মনে হয় না। কেননা, মানুষের স্বভাবই এই যে, সাধারণতঃ এক জনের ওপর চটে গেলে তার পরে তার খুঁটিনাটি ধরতে আরম্ভ করে। সে দিন এক জন বাঙালি এখানকার সঙ্গে তুলনা করে আমাদের দেশের ভোজের প্রথা যে নিতান্ত barbarous তাই প্রমাণ করবার জন্যে বললেন যে, আমাদের দেশে খাবার সময় মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করে। আর আমাদের দেশের লোকেরা যে barbarous তাই প্রমাণ করবার জন্যে বললেন যে, সেখেনে জুতো খুলে খেতে বসলে জুতো চুরি করে নিয়ে যায়। জানি নে হয়তো তাঁর বিশ্বাস যে, মাছি যদি বিলেতে আসত তো এত সভ্য হয়ে যেত যে খাবার সময় আর ভ্যান্ ভ্যান্ করত না। আর তিনি হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে, এ দেশের লোকেরা জুতো খুলে খায় না। খুলে খেলে এখানে চুরি যেত কি না সে বিষয়ে বলা ভারী শক্ত; অতএব সে বিষয়ে কোনো প্রকার তুলনা উত্থাপন না করাই শ্রেয়। এই রকম ক্রমাগত প্রতি ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে এ দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করে করে তাঁদের চটা ভাব চটনমান যন্ত্রে blood heat ছাড়িয়ে ওঠে। এক জন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর সমবেদক বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বলছিলেন যে, যখন তিনি মনে করেন যে দেশে ফিরে গেলে তাঁকে চারি দিকে ঘিরে মেয়েগুলো প্যান্ প্যান্ করে কাঁদতে আরম্ভ করবে তখন আর তাঁর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না! অর্থাৎ তিনি চান যে, তাঁকে দেখবামাত্রেই 'dear darling' বলে ছুটে এসে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে তাঁর কাঁধে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এইটুকু

অভিনয়ের ওপর তাঁর দেশে ফিরে যাওয়া নির্ভর করছে। তিনি তাঁর বাড়ির লোকদের ভালোবাসার তত মূল্য দেখেন না, যত তাদের ভালোবাসার অভিনয়ের। তিনি তাঁর স্বীয় পরিবারদের কত ভালোবাসেন, এর থেকে একবার বিবেচনা করে দেখো। তাঁদের একটিমাত্র আচারের পরিবর্তন না হলে তিনি বাড়ি ফিরে যেতে পারেন না, না জানি সে কী পরিবর্তন! সে পরিবর্তনে হয়তো চন্দ্র-সূর্যের উদয়াস্তের বন্দোবস্ত একেবারে উলটে যেতে পারে, প্রকৃতির একটা মহা বিপ্লব বাধতে পারে। সে পরিবর্তন কী? না, S. K. Nandi Esqr.এর স্ত্রী পরিবারেরা যদি তাঁকে দেখে আনন্দের অশ্রু বর্ষণ না করে ছুটে তাঁকে আলিঙ্গন করতে আসে! আমি আগেই বলেছি, বিলেতের কতকগুলি বাহ্যিক ছোটোখাটো বিষয় বাঙালির চোখে পড়ে। তাঁরা যখন সাহেব হতে যান তখন সাহেবদের ছোটোখাটো আচারগুলি নকল করতে যান। ছোটো-খাটো বিষয়ে তাঁদের খুঁটিনাটি যদি দেখো, তবে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাও। ডিনারের টেবিলে কাঁটা ছুরি উলটে ধরতে হবে কি পালটে ধরতে হবে তাই জানবার জন্যে তাঁদের প্রাণপণ যত্ন অন্বেষণ ও 'গবেষণা' দেখলে তোমার তাঁদের উপর ভক্তির উদয় হবে। কোটের কোন্ ছাঁটটা fashionable হয়েছে, আজকাল nobilityরা আঁট প্যাণ্টলুন পরেন কি ঢলকো প্যাণ্টলুন পরেন, waltz নাচেন কি polka নাচেন, মাছের পর মাংস খান কি মাংসের পর মাছ খান, সে বিষয়ে তাঁরা অভ্রান্ত খবর রাখেন। তুমি যদি দস্তানা পরবার সময় আগে থাকতে বুড়ো আঙুল গলিয়ে দেও তিনি তৎক্ষণাৎ বলে দেবেন— ও রকম দস্তুর নয়। ঐ রকম ছোটোখাটো বিষয়ে এক জন বাঙালি যত দস্তুর বেদস্তুর নিয়ে নাড়াচাড়া করেন এমন এক জন জন্‌বুল করেন না। তুমি যদি মাছ খাবার সময় ছুরি ব্যবহার

কর[১] তবে এক জন ইংরাজ তাতে বড়ো আশ্চর্য হবেন না, কেননা, তিনি জানেন তুমি বিদেশী; কিন্তু এক জন ইঙ্গবঙ্গ সেখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর স্মেলিং সল্টের আবশ্যক করবে। তুমি যদি শেরী খাবার গ্লাসে শ্যাম্পেন খাও তবে এক জন ইঙ্গবঙ্গ তোমার দিকে তিন দণ্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকবেন, যেন এমন জানোয়ার তিনি কখনো দেখেন নি— যেন একটা অভূতপূর্ব নিদারুণ বিপ্লব বেধে গেল— যেন তোমার এই একটি অজ্ঞতার জন্যে সমস্ত পৃথিবীর সুখশান্তি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। সন্ধ্যে বেলায় তুমি যদি morning-coat পরো তা হলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হলে যাবজ্জীবন তোমাকে দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা দেন।

এক জন বিলাত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে রাই দিয়ে[২] খেতে দেখলে বলতেন, 'তবে কেন মাথা দিয়ে চল না?' তাঁর চক্ষে রাই দিয়ে মটন খাওয়াও যা আর মাথা দিয়ে হাঁটাও তাই! এই রকম সব ছোটোখাটো বিষয়েই ইঙ্গবঙ্গদের যত দৃষ্টি। ছোটোখাটো বিষয়ে এত খুঁটিনাটি কেন, যদি জিজ্ঞাসা করো তবে তার একটা কারণ দেখাতে পারি। বাঙালি হয়ে সাহেবের মুখোষ পরতে গেলে প্রতি পদে ভয় হয় পাছে বাঙালিত্ব বেরিয়ে পড়ে; সুতরাং প্রতি সামান্য বিষয়ে সাবধান হওয়া স্বাভাবিক। তোমার বুকটা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কালো হলেও হানি নেই, কেননা সে-সব কাপড়ে ঢাকা থাকে, কিন্তু মুখটা এমন সাবধানে চুনকাম করা আবশ্যক যে কোনো জায়গায় কালো বেরিয়ে না থাকে। তুমি

---

১ ইংরাজেরা মাছ খাবার সময় কেবল মাত্র কাঁটা ব্যবহার করেন। মাছ খাবার এক প্রকার বিশেষ ছুরি আছে।

২ বিলাতী ঔদরিক-শাস্ত্রে রাই দিয়ে মটন খাওয়া নিষিদ্ধ।

যদি সাহেব হতে চাও, তবে সাহেবদের যতখানি বাইরে চর্মচক্ষে দেখা যায় ততখানি নকল করলেই যথেষ্ট। যে বাঙালিরা বিলেতে আসেন নি তাঁরা তোমার বাঁকানো ইংরিজি সুর, তোমার হ্যাট কোট ও তোমার উদগ্র মূর্তি দেখে তাক হয়ে থাকবেন। কিন্তু একটা মজা দেখেছি, ইঙ্গবঙ্গেরা পরস্পর আপনাদের চেনেন; তাঁরা দলবহির্‌ভূত লোকদের কাছে যথেষ্ট আস্ফালন করেন বটে, কিন্তু তাঁদের পরস্পরের কাছে কিছু গোপন নেই, তাঁরা নিজে বেশ জানেন যে—

কাকস্য পক্ষৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌ
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।

সোনা দিয়ে বাঁধা হোক কাকটার ডানা,
মাণিকে জড়ানো হোক তার পা-দুখানা,
এক এক পক্ষে তার গজমুক্তা থাক্—
রাজহংস নয় কভু, তবুও সে কাক।

আমি আর একটি আশ্চর্য লক্ষ্য করে দেখেছি যে, বাঙালিরা ইংরাজদের কাছে যত আপনাদের দেশের লোকের ও আচার-ব্যবহারের নিন্দে করেন এমন এক জন ঘোর ভারতদ্বেষী অ্যাংগ্লো-ইন্‌ডিয়ান করেন না। তিনি নিজে ইচ্ছে করে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানা প্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্য পরিহাস করেন। তিনি গল্প করেন যে, আমাদের দেশে বল্লভাচার্যের দল বলে এক প্রকার বৈষ্ণবের দল আছে— তাদের সমস্ত অনুষ্ঠান সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকেন। তিনি বলেন, ভারত-

বর্ষীয়েরা অত্যন্ত অসভ্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন; তিনি ভারতবর্ষীয়দের 'নেটিব নেটিব' করে সম্বোধন করেন। সভার লোকদের হাসাবার অভিপ্রায়ে নেটিব nautch girlরা কিরকম করে নাচে অঙ্গভঙ্গী করে তার নকল করা হয় ও তাই দেখে সকলে হাসলে পরম আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁরা যখন ভারতবর্ষীয়দের নিন্দে করতে থাকেন তখন তাঁরা মনে মনে কল্পনা করেন তাঁরা নিজে 'নেটিব' দলের বহির্ভূত! তিনি হয়তো মনে করেন, তাঁর শ্রোতারা অন্যান্য ভারতবর্ষীয়দের সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে পচাপুকুরের পদ্ম— কাঁটা-বনের গোলাপ ব'লে মাথায় করে নেবে। তাঁর বিশ্বাস, তিনি যখন ভারতবর্ষীয়দের প্রেজুডিসের উপর কটাক্ষপাত করে অপর্যাপ্ত হাস্যকৌতুক করেন তখন সকলে তাঁকে অবিশ্যি সে-সকল 'প্রেজুডিস' হতে মুক্ত বলে গ্রহণ করবেন। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছে, তাঁকে কেউ ভারতবর্ষীয় দলের মধ্যে গণ্য না করে। আমার মনে আছে, আমি দেশে থাকতে এক জন সুশিক্ষিত উড়িষ্যাবাসী আমার কাছে কথায় কথায় বলেছিলেন যে, 'উড়ে-মেড়ারা বড়ো মূর্খ!' শুনে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গিয়েছিল। আমার এক বন্ধু পূর্বাঞ্চলে তাঁর জমিদারি দেখতে গিয়েছিলেন, এক জন মুসলমান তাঁকে কথা-প্রসঙ্গে বলেছিল, 'মশায়, নেড়েদের কখনো বিশ্বাস করবেন না।' এই উড়িষ্যাবাসীর মনোগত ভাব এই যে, 'আমি মূর্খ নই।' আর এই মুসলমানটি জানাতে চান যে, তিনি বিশ্বাসপাত্র। কেননা, নিজে মূর্খ হলে এই উড়িষ্যাবাসী কখনও অন্যের মূর্খতা নিয়ে বিদ্রূপ করতেন না, আর এই মুসলমানটির যখন স্বজাতির অবিশ্বাসিতার ওপর এত ঘৃণা তখন তিনি নিজে বিশ্বাসী না হয়ে যান না। এই রকম দেখতে পাবে যে, সাহেব-সাজা বাঙালিদের প্রতি পদে ভয় পাছে তাঁরা বাঙালি বলে ধরা পড়েন। এক জন বাঙালি একবার

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর কৃষ্ণ চর্ম দেখে আর একজন ভারতবর্ষীয় এসে তাঁকে হিন্দুস্থানিতে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করে— তিনি মহা খাপা হয়ে তার কথার উত্তর না দিয়ে চলে যান। কিন্তু এত রাগ করবার তাৎপর্য কী? তাঁর ইচ্ছে, তাঁকে দেখে কেউ মনে না করতে পারে যে তিনি হিন্দুস্থানি বোঝেন। তাঁর মা-বাপেরা যে বাঙালি ও সে হতভাগ্যেরা যে বাংলায় কথা কয় এতে তিনি নিতান্ত লজ্জিত আছেন। আহা, যদি টেম্‌সের জলে স্নান করলে রঙটা বদলাত তবে কী সুখেরই হত! এক জন ইঙ্গবঙ্গ একটি 'জাতীয় সংগীত' রামপ্রসাদী সুরে রচনা করেছেন; এই গানটার একটু অংশ পূর্ব পত্রে লিখেছি, বাকি আর-একটু মনে পড়েছে— এই জন্য আবার তার উল্লেখ করছি। যদিও এটা কতকটা ঠাট্টার ভাবে লেখা হয়েছে, কিন্তু আমার বোধ হয় এর ভিতরে অনেকটা সত্যি আছে। এ গীত যাঁর রচনা তিনি রামপ্রসাদের মতো শ্যামার উপাসক নন, তিনি গৌরীভক্ত। এই জন্যে গৌরীকে সম্বোধন করে বলছেন—

মা, এবার মলে সাহেব হব—
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব!
শাদা হাতে হাত দিয়ে, মা, বাগানে বেড়াতে যাব—
আবার কালো বদন দেখলে পরে 'ডার্কি' বলে মুখ ফেরাব।

আমি পূর্বেই বিলেতের landlady (বাড়িওয়ালী) শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছি। তারা বাড়ির লোকদের আবশ্যকমত সেবা করে। অনেক ভাড়াটে থাকলে তারা চাকরানী রাখে, এবং অনেক সময়ে তাদের আপনাদের মেয়ে বা অন্য আত্মীয়েরা তাদের সাহায্য করবার জন্যে থাকে। এই landlady শ্রেণীরা আমাদের বিদেশী ইঙ্গবঙ্গদের প্রবাসদুঃখ অনেক পরিমাণে দূর করে, কিম্বা প্রবাস-

সুখ অনেক পরিমাণে বর্ধিত করে। অনেক ইঙ্গবঙ্গ সুন্দরী landlady দেখে ঘর ভাড়া করেন। এতে তাঁদের সময় কাটাবার যথেষ্ট সুবিধে হয়। বাড়িতে পদার্পণ করেই তাঁর ল্যান্‌ড্‌লেডির যুবতী কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নেন। দু-তিন দিনের মধ্যে তার একটি আদরের নামকরণ করা হয়, সপ্তাহ অতীত হলে তার নামে হয়তো একটা কবিতা রচনা করে তাকে উপহার দেন। কোনো সন্ধ্যে বেলায় হয়তো রান্নাঘরে গিয়ে ল্যান্‌ড্‌লেডি তার কন্যা ও ঘরের দাসীটিকে বিজ্ঞান দর্শন ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই-একটা বাঁধা গত শোনাতে থাকেন। তারা তাঁর লম্বাচোড়া কথাগুলো হজম করতে না পেরে হাঁ করে ভাবে, ইনি একজন কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে হবেন। কিন্তু kitchen অঞ্চলে তিনি তাঁর গম্ভীর পাণ্ডিত্যের জন্যে তত বিখ্যাত নন; তাঁর নিজের বাড়ির ও পাশাপাশি দু-একটি বাড়ির দাসী-শ্রেণীর মধ্যে তাঁর রসিকতার অত্যন্ত নামডাক শোনা যায়। এই রকম জনশ্রুতি যে, সে দিন সন্ধ্যে বেলায় সিঁড়ির কাছে তিনি বাড়ির kitchen-maid Pollyর দাড়ি ধরে এমন একটি ঠাট্টা করেছিলেন যে, সে হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে যায়। সে দিন landladyর মেয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা এনে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, চায়ে কি চিনি দিতে হবে? তিনি হেসে বললেন, 'না নেলি, তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার আবশ্যক দেখছি নে।' ইঙ্গবঙ্গগণ বিলেতের এই দাসী-শ্রেণীর বিমল সংসর্গে দিন-দিন উন্নতিলাভ করতে থাকেন। আচ্ছা, মেয়েদের সঙ্গে যদি মিশতে চাও, তবে ভদ্রলোকের মেয়েদের সঙ্গে মেশ না কেন? কিন্তু কতকগুলি কারণ আছে, যে জন্যে ভদ্রলোকের মেয়েদের সঙ্গে তত মেশা হয় না। বাঙালিদের উদ্যমের অভাব ও আলস্য বিলেতে এসেও ভালো করে ঘোচে না। তারা-যে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে

শ্রম স্বীকার করে একজনের বাড়ি গিয়ে দেখা করে দুদণ্ড কথা কয়ে আসবে তা বড়ো হয়ে ওঠে না। তার পরে আবার অনেক পড়াশুনো করে দেখাশুনো করতে যাবার বড়ো সময় পেয়ে ওঠেন না। তা ছাড়া আমি দেখেছি, এক জন ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে ভদ্র স্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা ও তাদের সঙ্গে নানা সামাজিক ভদ্রতার নিয়ম পালন করে চলা অনেক বাঙালির পুষিয়ে ওঠে না। অনেকের দেখেছি, এক জন ভদ্র স্ত্রীর কাছে সংকোচে মুখ ফোটে না, কিন্তু এক জন নীচশ্রেণীর মেয়ের কাছে তার অনর্গল কথা ফুটতে থাকে। কিন্তু সকলের চেয়ে প্রধান কারণ এই যে, ভদ্রলোকের স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁরা তেমন মনের মতো স্বাধীন ব্যবহার করতে পারেন না, ও রকম নিরামিষ মেশামেশি তাঁদের বড়ো মনঃপূত নয়। দাসীদের সঙ্গে তাঁরা বেশ অসংকোচে অভদ্রতাচরণ করতে পারেন। আসল কথা কী জানো? শাদা চামড়ার গুণে তাঁরা দাসীদের যথেষ্ট নীচ শ্রেণীর লোক বলে কল্পনা করতে পারেন না; এক জন বিবি দাসী বলে মনে করতে পারেন না। একটা শাড়ি-পরা ঝাঁটা-হস্ত কালো-মুখ দেখলে তবে তাঁদের দাসীর ভাব ঠিক মনে আসে। আমি জানি, এক জন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর বাড়ির দাসীদের মেজদিদি সেজদিদি বলে ডাকতেন। শুনলে কি গা জ্বলে ওঠে না? তাঁর বাড়িতে হয়তো তাঁর নিজের মেজদিদি সেজদিদি আছেন; যখন কতকগুলো নীচ শ্রেণীর দাসীকে সেই নামে ডাকছেন তখন হয়তো তাঁর বিকৃত মনে একটু লজ্জা, একটু কষ্ট, একটু সংকোচও উপস্থিত হচ্ছে না। হা দুর্ভাগ্য! ছেলেবেলা থেকে যাঁদের দেখে আসছি, যাঁদের ভালোবাসা পেয়ে আসছি, বিলেতে এমন কী জিনিস থাকতে পারে যা দেখে তাঁদের ভুলে যাব, তাঁদের ওপর থেকে ভালোবাসা চলে যাবে— শুদ্ধ তাই নয় তাঁদের ওপর ঘৃণা জন্মাবে! এই কতকগুলি

নীচ শ্রেণীর দাসী, কতকগুলি হীনস্বভাব ল্যান্‌ড্‌লেডির সঙ্গে বৎসর-দুয়েক হীন আমোদে কাটিয়ে যদি তুমি তোমার স্ত্রীর ভালোবাসা তোমার বোনের স্নেহ ভুলে যেতে পারো, কত বৎসরের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারো, বাড়ির সমস্ত টান ছিঁড়ে ফেলতে পারো, তবে তুমি কী না করতে পারো বলো দেখি।

আমি এক জনকে জানি, তিনি তাঁর 'মেজদিদি' 'সেজদিদি' -বর্গকে এত মান্য করে চলতেন যে, তাঁর কৃষ্ণবর্ণ গুরুজনকে তার অর্ধেক মান্য করলে তাঁরা তাঁকে কুলের প্রদীপ ছেলে বলে মাথায় করে রাখতেন। তাঁর ঘরে বা তাঁর পাশের ঘরে যদি এই দাসীদের মধ্যে কেউ উপস্থিত থাকত তা হলে তিনি সসম্ভ্রম সংকোচে শশব্যস্ত হয়ে পড়তেন। সে রকম অবস্থায় যদি তাঁর কোনো ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু গান করতেন বা হাস্যপরিহাস করতেন তা হলে তিনি অমনি মহা অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠতেন, 'আরে চুপ করো, চুপ করো, মিস এমিলি কী মনে করবেন?' বিলেতে এসে এঁরা এই রকম কতকগুলি নীচ শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মিশে বিবিদের সঙ্গে আলাপ করছি মনে করে মহা পরিতোষ লাভ করেন। আমার মনে আছে, দেশে থাকতে একবার এক ব্যক্তি বিলেত থেকে ফিরে গেলে পর আমরা তাঁকে খাওয়াই; খাবার সময় তিনি নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'এই আমি প্রথম খাচ্ছি যেদিন আমার খাবার টেবিলে কোনো লেডি নেই।' শুনে আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেম; আমি জানতেম যে, কোনো ভদ্র বিবি এক জন অস্ত্রীক পুরুষের বাড়িতে দেখা করতে বা খেতে আসেন না। তবে এ ব্যক্তি বলে কী! এ বিলেতে যত দিন ছিল নিমন্ত্রণ খেয়ে কাটিয়েছিল নাকি? যা হোক, তখন মনে করেছিলেম এ ব্যক্তি বিলেত থেকে আসছে, অবিশ্যি সেখেনে এমন কিছু দস্তুর আছে যা আমি ঠিক জানি নে। ও মা! এখেনে এসে

সব বুঝতে পারছি ব্যাপারখানা কী! এই সমস্ত ল্যান্‌ড্‌লেডিবর্গের সঙ্গে প্রত্যহ আহার করা হত, আর দেশে নিরীহ বঙ্গবাসীদের নিকট 'প্রত্যহ বিবিদের সঙ্গে খেয়েছি' বলে জাঁক করা হত! এক জন ইঙ্গবঙ্গ একবার তাঁর কতকগুলি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন, খাবার টেবিলে কতকগুলি ল্যান্‌ড্‌লেডি ও দাসী উপবিষ্ট ছিল, তাদের এক জনের ময়লা কাপড় দেখে নিমন্ত্রণকর্তা তাকে কাপড় বদলে আসতে অনুরোধ করেছিলেন; শুনে সে বললে, 'যাকে ভালোবাসা যায় তাকে ময়লা কাপড়েও ভালোবাসা যায়!' যে দাসী এ রকম করে উত্তর দিতে পারে তাকে কতদূর স্পর্ধা দেওয়া হয়েছে মনে করে দেখো। এ-সকল দেখে এখানকার ইংরাজদের আমাদের বাঙালিদের উপরে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে দিন মিসেস উড্রো (পূজনীয় মৃত উড্রো সাহেবের বিধবা পত্নী) আমাকে বলছিলেন, 'শোনা যায়, এখানকার বাঙালিরা অত্যন্ত ছোটোলোকদের সঙ্গে মেশে ও একত্রে খায়। একবার মনে করে দেখো দেখি, কতকগুলো বেহারা ও দরোয়ানের সঙ্গে তোমরা একাসনে বসে খাচ্ছ— সে কী বিশ্রী দেখায়!' শুনে লজ্জায় আমার শির একেবারে নত হয়ে গেল! হে ইঙ্গবঙ্গ, যদি ইংরাজদের মুখ থেকে এ বিষয়ে উপদেশ না শুনলে তোমাদের চৈতন্য না জন্মায় তবে Thackeray এ বিষয়ে কী বলেন শোনো।—

'It may safely be asserted that the persons who joke with servants or barmaids at lodgings are not men of a high intellectual or moral capacity. To chuck a still-room maid under the chin, or to send Molly the cook grinning, are not, to say the least of them, dignified act of any gentleman.'

অতএব যাঁরা ভদ্রসমাজে মিশতে চান ও ভদ্র বলে আত্মপরিচয় দিতে চান তাঁরা যেন কতকগুলো রাঁধুনি ঘরঝাঁটুনি দাসীদের সঙ্গে অযোগ্য ঘনিষ্ঠতা না করেন। বিলেতের kitchen-রাজ্যে যাঁরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন তাঁরা যেন দেশে গিয়ে না বলেন যে, 'বিলেত থেকে শিক্ষা পেয়ে এলেম।' এইরূপ নীচ শ্রেণীর মেয়েদের উপরে ভালোবাসা দেখিয়ে রুটি ও কয়লা -ওয়ালা যুবক বেচারিদের মনে ঈর্ষা জন্মিয়ে কষ্ট দেওয়া কি সদয়হৃদয় ভদ্র-লোকের কাজ? শোনা যায়, এখেনে যখন অল্পস্বল্প বাঙালির আমদানি ছিল তখন এখানকার সমাজে তাঁদের অত্যন্ত মান ছিল। অনেক ভদ্রলোক আলাপ না থাকলেও তাঁদের নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিতেন। এখানকার অনেক Lord ও Duke -গণ তাঁদের সান্ধ্য-সমাগমে আহ্বান করতেন। এখানকার ধনীলোকদের নিমন্ত্রণসভায় তাঁদের সমাদরের সীমা ছিল না। কিন্তু এখন সে-সব নেই। এখন তুমি বিলেতে এলে তোমার ভাড়া-করা ক্ষুদ্র ঘরটিতে দিন-রাত বসে থাকো, ডাক্তারি ও আইনের কেতাবের লম্বা লম্বা পরিচ্ছেদগুলো গলাধঃকরণ করো, Polly Molly Nelly -বর্গের সঙ্গে রসিকতার আদান-প্রদান করো ও রাত্রি আড়াইটার পর বিছানায় গিয়ে নিদ্রা দাও। যদি তুমি স্বভাবতঃ মিশুক লোক হও তবে জোগাড়-জাগাড় করে দুচারটে পরিবারের সঙ্গে কোনো উপায়ে আলাপ করে নেও, কিন্তু পূর্বকার মতো সে রকম সমাদর আর নাই, ও ক্রমে ক্রমে হয়তো এমন দিন আসতে পারে যে দিন ভারতবর্ষের ইংরাজদের মতো এখানকার ইংরাজেরাও আমাদের ঘৃণার চক্ষে দেখবেন— কিন্তু যদি সে দিন আসে তবে ইংরাজদের দোষ দিয়ো না। অনেক ভারতবর্ষীয় এখেনে এসে যে রকম অন্যায় ব্যবহার করে গেছেন তা আমি লিখতে চাই নে। ভারতবর্ষীয়দের সংখ্যা এখানে অত্যন্ত

অল্প বলে সে-সকল কথা অধিক লোকের কানে ওঠে না। কিন্তু যখন ক্রমেই ভারতবর্ষ থেকে এখেনে যুবকদের যাতায়াত বৃদ্ধি পেতে লাগল, যখন ক্রমেই তাঁদের দল পুষ্ট হতে চলল, তখন তাঁদের গুণাগুণ প্রকাশ হবার সম্ভাবনা বাড়তে লাগল। এখন যেন তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরা যে-সকল অন্যায়াচরণ করবেন তাতে যে কেবল মাত্র তাঁদের যশোহানি হবে তা নয়, তাঁরা তাঁদের স্বদেশ ও স্বজাতির ওপরে কলঙ্ক আনয়ন করবেন।

এইবার ইঙ্গবঙ্গদের একটি অতি অসাধারণ ও বিশেষ গুণ তোমাকে বলছি। এখানে যাঁরা যাঁরা আসেন প্রায় কেউ কবুল করেন না যে তাঁরা বিবাহিত। যুবতী কুমারী -সমাজে বিবাহিত-দের দাম অত্যন্ত অল্প। অবিবাহিত না হলে কোনো যুবতীর উপরে তুমি ভালোবাসা দেখাতে পারো না, সুতরাং বিলাতের অর্ধেক আমোদ ভোগ করতে পারো না। অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতদের সঙ্গে মিশে অনেক যথেচ্ছাচার করা যায়, কিন্তু বিবাহিত বলে জানলে তোমার অবিবাহিত সঙ্গীরা তোমাকে ও রকম অনিয়ম করতে দেয় না। সুতরাং অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে অনেক লাভ আছে।

যা হোক, এই-সকল তো ইঙ্গবঙ্গদের আচরণ। অনেক ইঙ্গবঙ্গ দেখতে পাবে তাঁরা হয়তো আমার এই বর্ণনার বহির্গত। কিন্তু সাধারণতঃ ইঙ্গবঙ্গত্বের লক্ষণগুলি আমি যত দূর জানি তা লিখেছি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, ভবিষ্যতে যে-সকল বাঙালিরা বিলেতে আসবেন তাঁরা যেন আমার এই পত্রটি পাঠ করেন। বাঙালিদের নামে যথেষ্ট কলঙ্ক আছে; কিন্তু তাঁরা যেন সে কলঙ্ক আর না বাড়ান, তাঁরা যেন সে কলঙ্ক এ সাত সমুদ্র -পারে আর রাষ্ট্র না করেন। জ'ন্মে অবধি শত শত নিন্দা গ্লানি অপমান নত-

শিরে সহ্য করে আসছি— এই দূর দেশে এসে একটু মাথা তোলবার অবকাশ পাওয়া যায়; এখানকার লোকেরা আমাদের অনেকটা সমান ভাবে ব্যবহার করে বলেই আমাদের পদাঘাতজর্জরিত মন একটু বল পেয়ে আত্মনির্ভর স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রভৃতি অনেকগুলি পৌরুষিক গুণ শিক্ষা করবার সুবিধে পায়; কিন্তু এখানেও দলে দলে এসে তোমরা যদি হীন ও নীচ ব্যবহার করতে আরম্ভ করো, এখানকার লোকের মনেও বাঙালিদের ওপর ঘৃণা জন্মিয়ে দেও, তা হলে এখেনেও তোমাদের কপালে সেই উপেক্ষা সেই নিদারুণ ঘৃণা আছে! যে পথে যাবে বাঙালি বলে তোমাদের দিকে সকলে আঙুল বাড়াবে, যে সভায় যাবে সভাস্থ লোকেরা তোমাদের দিকে তাচ্ছিল্যের ভ্রূকুঞ্চিত কটাক্ষ বর্ষণ করবে। বিলেতের কুহকগুলি আগে থাকতে তোমাদের চক্ষে ধরলেম; যখন বিলেতে আসবে তখন সাবধানে পদক্ষেপ কোরো। ইঙ্গবঙ্গদের দোষগুলিই আমি বিস্তৃত করে বর্ণনা করলেম— কেননা, লোকে গুণের চেয়ে দোষ-গুলিই অতি শীঘ্র ও সহজে অনুকরণ করে।

যা হোক, বাঙালিরা বিলাতের কামরূপে রূপান্তর ধারণ করে দেশে ফিরে চললেন। এখন তাঁদের একটা ভয় হচ্ছে, পাছে বিলাতে আসবার আগে তাঁদের যে-সকল বন্ধু ছিলেন তাঁরা কাছে ঘেঁষে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে আসেন। দেশে গিয়ে তাই তাঁদের বিশেষ উগ্রমূর্তি ধারণ করতে হয়। কারও বা অত্যন্ত ভাবনা হচ্ছে, দেশে গিয়ে কাকাকে কী করে প্রণাম করব? কারও বা তাঁর স্ত্রীর ঘোমটাচ্ছন্ন মুখ কল্পনায় এসে আপাদমস্তক জ্বলতে আরম্ভ করেছে। যা হোক, দেশে তো পৌঁছলেন। তাঁর স্ত্রীকে যথাসাধ্য পালিশ ও বার্নিষ করে 'নেটিব' কাকেদের দল ছেড়ে ইংরেজ ময়ূরের দলে মিশতে চললেন। আগে কে জানত বলো যে

সেখানে গিয়ে অত ঠোকর খাবেন! ভারতীতে 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' বলে প্রবন্ধের এক জায়গায় লেখা আছে—

'আমরা বিলাতে যে, এই-সকল চাকচিক্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই, তাহা আশ্চর্য নহে। এ দেশে আমাদের চক্ষে এ-সকল সচরাচর পতিত হয় না বলিয়া আমরা এক প্রকার সুস্থির থাকি; ইংলন্ডে গিয়া ইংরেজ-মহলে প্রবেশ করিয়া আমাদের মস্তক এমন ঘূর্ণিত হইয়া যায় যে, আপনাকে আপনারা স্থির রাখিতে পারি না। স্বদেশের প্রতি মমতা চলিয়া যায়, দেশীয়দিগের উপর অসভ্য বর্বর বলিয়া ঘৃণা জন্মে। যাহা ইংরাজি তাহাই সেব্য, যাহা দেশীয় ত্যাজ্য! হায়! ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষু ফোটে, আমরা দেখিতে পাই—এ জাদুর রাজ্য আমাদের নহে। আমরা যে ইংরাজের পদধূলি লইতে যাই, তাহাদের পদাঘাত পাইয়া অবশেষে আমাদের চৈতন্য হয়।'

ভারতবর্ষে গিয়ে ইঙ্গবঙ্গদের কিরকম অবস্থা হয় সে বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাও নেই, বক্তব্যও নেই। কিন্তু কিছু কাল ভারতবর্ষে থেকে তার পরে ইংলন্ডে এলে কিরকম ভাব হয় তা আমি অনেকের দেখেছি। তাঁদের ইংলন্ড্ আর তেমন ভালো লাগে না; অনেক সময়ে তাঁরা ভেবে পান না— ইংলন্ড্ বদলেছে কি তাঁরা বদলেছেন। আগে ইংলন্ডের অতি সামান্য জিনিস যা-কিছু ভালো লাগত, এখন ইংলন্ডের শীত ইংলন্ডের বর্ষা তাঁদের ভালো লাগছে না— এখন তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হলে দুঃখিত হন না। তাঁরা বলেন, আগে তাঁদের ইংলন্ডের straw-berry ফল অত্যন্ত ভালো লাগত, এমন-কি তাঁরা যত রকম ফল খেয়েছেন তার মধ্যে straw-berryই তাঁদের সকলের চেয়ে স্বাদু মনে হত। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে straw-berryর স্বাদ বদলে গেল না কী! এখন

দেখছেন straw-berryর চেয়ে অসংখ্য দিশি ফল তাঁদের ভালো লাগে। আগে Devonshireএর ক্ষীর তাঁদের এত ভালো লাগত যে তার আর কথা নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য! এখন দেখছেন আমাদের দেশের ক্ষীর তার চেয়ে ঢের ভালো লাগে। প্রথম বারে বিলেতের মুখ যে রকম দেখাচ্ছিল, এবারে ঠিক সে রকম দেখাচ্ছে না। কী আশ্চর্য পরিবর্তন! কিন্তু এর ভিতরে আমি তত আশ্চর্য কিছু দেখছি নে। এ রকম হবার কতকগুলি কারণ আছে। প্রধান কারণ হচ্ছে, বিলেত থেকে গিয়ে বিলেত-ফেরতেরা সম্পূর্ণ বিলিতি চালে চলেন। তাঁদের গৃহসজ্জা বিলিতি রকমের, বিলিতি বস্ত্র -পরিধান, দগ্ধ গোষ্পদ -সেবন, তাঁদের স্ত্রী-পরিবারদের ইংরিজি ভাবের আচার ব্যবহার; সুতরাং বিলেতের বাহ্য চাকচিক্য চোখে সয়ে গেলে এখেনে আর তেমন-কিছু জিনিস থাকে না যা দেখে তাঁদের ধাঁধাঁ লেগে যায়। তা ছাড়া তাঁরা ভারতবর্ষে গিয়ে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে সংসারী হয়ে পড়েন, রোজগার করতে আরম্ভ করেন, ভারতবর্ষের মাটিতে তাঁদের শিকড় এক রকম বসে যায়। ভারতবর্ষীয়দের একটু বয়স হলেই তাঁদের মন কেমন শিথিল হয়ে যায়, তখন তাঁরা পায়ের ওপর পা দিয়ে টানাপাখার বাতাস খেয়ে কোনো প্রকারে দিন কাটিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত থাকেন। বিলেতে আমোদ ও বিলাস ভোগ করতে গেলেও অনেক উদ্যমের আবশ্যক করে। এখানে এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে হলে গাড়ি চলে না, হাত পা নাড়তে-চাড়তে দশটা চাকরের ওপর নির্ভর করলে চলে না। কেননা এখানে গাড়িভাড়া অত্যন্ত বেশি, আর চাকরের মাইনে মাসে সাড়ে তিন টাকা নয়। এখানে একটা থিয়েটার দেখতে যাও— সন্ধ্যে বেলা বৃষ্টি পড়ছে, পথে কাদা, একটা ছাতা ঘাড়ে করে মাইল কতক ছুটোছুটি করে তবে ঠিক

সময় পৌঁছতে পারবে। যখন রক্তের তেজ থাকে তখন এ-সকল পেরে ওঠা যায়। যখন ছোট্ট নৌকাটির মতো হালকা থাকা যায় তখন পালে একটু বাতাস লাগলেই, জলে একটু তরঙ্গ উঠলেই টল্‌মল্‌ করতে থাকা যায়; কিন্তু যখন স্ত্রী পুত্র কাজ কর্ম নিয়ে ভারগ্রস্ত হয়ে পড়া যায় তখন আর একটি অবলার একটি দীর্ঘ-নিশ্বাসে উলটে পড়তে হয় না ও একটি অশ্রুজলধারায় নৌকা-ডুবি হয় না।

আমার চিঠি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আমার স্কন্ধে যখন উপদেশদানেচ্ছা চাপে তখন আমি ঝট করে কলম থামাতে পারি নে; কিন্তু আর এক অক্ষরও লিখছি নে, এইখানেই থামা যাক। কিন্তু আর-একটি কথা না বলে থাকতে পারছি নে। দেশ থেকে আমার কোনো মান্য বন্ধু শিখরিণীচ্ছন্দে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেইটে তোমাকে না শুনিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। সেইটে শোনা শেষ হলেই নিষ্কৃতি পাবে।—

'বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্যগৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগবিহগপ্রাণ দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজনবশে কিচ্ছু হয় না—
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।
পিতা মাতা ভ্রাতা নবশিশু অনাথা হুট্‌ কোরে
বিরাজে জাহাজে মসিমলিন কোর্তা বুট পোরে।
সিগারে উদ্গারে মুহু মুহু মহা ধূমলহরী,
সুখস্বপ্নে আপ্নে বড় চতুর মানে হরি হরি।
ফিমেলে ফী মেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে—
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে।

বিহারে নীহারে বিবিজনসনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিরে এসে দেশে গলকলর (collar) -বেশে হটহটে—
গৃহে ঢোকে রোখে, উলগতনু দেখে বড় চটে।
মহা আড়ী শাড়ী নিরখি, চুল দাড়ী সব ছিঁড়ে,
ছুটা-লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।'

এ কবিতাটি যদি সংস্কৃত ছন্দে না পড়তে পারো, তা হলে এর মস্তক ভক্ষণ করা হবে। অতএব, নিতান্ত অক্ষম হলে বরঞ্চ একজন ভট্টাচার্যের কাছে পড়িয়ে নিয়ো, তা যদি না পারো তবে এ কবিতাটি তুমি না হয় পোড়ো না। ইতি।

ষষ্ঠ পত্র

আমাদের ব্রাইটনের বাড়িটি সমুদ্রের কাছে একটি নিরালা জায়গায়, এক সার ২০।২৫টি বাড়ি, বাড়িগুলির নাম হচ্ছে Medina Villas। Villa শুনলে তোমাদের হঠাৎ মনে হবে বাগান-বাড়ি। আমি লন্‌ডনে থেকে যখন প্রথম শুনলুম যে, আমরা মেদিনা ভিলায় বাস করতে যাচ্ছি তখন কত কী কল্পনা করেছিলুম তার ঠিক নেই— বাগান, গাছ, পালা, ফল, ফুল, মাঠ, সরোবর ইত্যাদি। বাড়িতে এসে যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই বাড়ি, ঘর, রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া— 'ভিলা'ত্বর মধ্যে আমাদের বাড়ির সামনে দু-চার হাত জমিতে দু-চারটে গাছ পোঁতা আছে। বাড়ির দরজায় একটা লোহার কড়া (knocker) লাগানো আছে, সেইটেতে ঠক্ ঠক্ করলেম, আমাদের landlady এসে দরজা খুলে দিলে। আমাদের

দেশের তুলনায় এখানকার ঘরগুলো লম্বা চৌড়া ও উঁচুতে ঢের ছোটো। ছোটো ছোটো ঘরগুলো চার দিকে জানলা-বন্ধ, একটু বাতাস আসবার জো নেই, কেবল জানলাগুলো সমস্ত কাঁচের ব'লে আলো আসে। শীতের পক্ষে এ রকম ছোটোখাটো ঘরগুলো খুব ভালো, একটু আগুন জ্বাললেই সমস্ত বেশ গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু তা হোক— যে দিন মনে করো মেঘে চারি দিক অন্ধকার হয়ে গেছে, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, তিন-চার দিন ধরে মেঘ বৃষ্টি অন্ধকারের এক মুহূর্ত বিরাম নেই, সে দিন এই ছোট্ট অন্ধকার ঘরটার এক কোণে বসে আমার মনটা অত্যন্ত বিগড়ে যায়, কোনোমতে সময় কাটে না ; এক, দুই, তিন ক'রে গুনে গুনে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে। খালি আমি ব'লে নয়, আমার ইংরেজ আলাপীরা বলেন সে রকম দিনে তাঁদের অত্যন্ত swear করার প্রবৃত্তি জন্মায়, (swear করা রোগটা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়, সুতরাং ওর বাঙ্গালা কোনো নাম নেই)— মনের ভাবটা অধার্মিক হয়ে ওঠে। ঘরগুলো যদি আরও একটু দরাজ হত তা হলেও মনের এ রকম খুঁৎখুঁতে ভাব অনেকটা দূর হত। ছোটো হোক, ঘরগুলো যথেষ্ট সাজানো ; ছবি টেবিল চৌকি কৌচ ফুলদানি পিয়ানো ইত্যাদি গৃহসজ্জা। প্রায় প্রতি ঘরে এক-একটা বড়ো বড়ো আয়না আছে, খেতে শুতে বসতে নিজের মুখ দেখতে পাওয়া যায় —সুশ্রী মানুষের পক্ষে এ রকম মন্দ নয়, কিন্তু প্রতি পদে এই কালো মূর্তি দেখলে আয়না-গুলো ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। যত মনে করি সাহেব হয়েছি, 'নেটিব'ত্ব যতই ভুলে যেতে চেষ্টা করি, ততই যে ঘরে যাই চার দিক থেকে আয়নাগুলো আমাদের কালো মুখ প্রকাশ করে যেন ভেংচাতে থাকে— এক এক সময় জ্বালাতন হয়ে উঠতে হয়। এখানকার বাড়িগুলো আমাদের দেশের কোঠাবাড়ির মতো তেমন

মজবুত নয়, বাড়ির অধিকাংশ কাঠের। আমাদের দেশে এ রকম বাড়ি হলে বোধ হয় উইয়ে হজম করে ফেলে, বাতাসের ফুঁয়ে উড়ে যায়। যা হোক, এখানকার ঘরদুয়ারগুলি বেশ পরিষ্কার করে রাখে; বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে আর কোথাও এক তিল ধুলো দেখবার জো নেই, মেঝের সর্বাঙ্গ কার্পেট প্রভৃতি দিয়ে মোড়া, সিঁড়িগুলি পরিষ্কার তক্ তক্ করছে কোথাও একটুখানি দাগ নেই। আমাদের দেশের পরিষ্কারের সঙ্গে এখানকার পরিষ্কারের অনেকটা তফাত আছে। শিল্পজ্ঞান সৌন্দর্যজ্ঞান থেকে এখানকার লোকদের পরিষ্কার ভাবের জন্ম, আমাদের পরিষ্কার-ভাব বলে যেন একটা স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে। চোখে দেখতে খারাপ হলে এরা সইতে পারে না। প্রতি সামান্য বিষয়ে এদের ভালো দেখতে হওয়াটা প্রধান আবশ্যক। প্রতি পদে এরা সৌন্দর্যচর্চা করে। এখানকার পুরুষেরা টুপি খুলে সম্মান প্রদর্শন করে, কিন্তু এমন করে খোলে যাতে সেই সামান্য টুপি খোলাতেও শ্রী প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ এখানকার মেয়েরা প্রতি হাত পা নাড়ায় শ্রীর প্রতি লক্ষ করে। কিছু নেবার জন্যে হাত বাড়ালে এমন করে বাড়ায় যাতে সুন্দর দেখায়, খাবার সময়ে এতটুকু মুখ মোছে যাতে খারাপ না দেখায়, পাছে লম্বা পদক্ষেপ হয় ব'লে বিবিদের এক রকম নতুন ফেসানের কাপড় উঠেছে তাতে তাদের হাঁটুর কাছটা বাঁধা থাকে। এমন-কি আমি সম্প্রতি দুই-একটা কাগজে দেখতে পাই, একজন কাপড়ওয়ালা খুব-ভালো-দেখতে mourning dressএর বিজ্ঞাপন দিয়েছে, শোকবস্ত্রও সুশ্রী দেখতে হওয়া আবশ্যক। দোকান থেকে যা-কিছু জিনিস আসে তা সুশ্রী করে মোড়া থাকে, দোকানদারেরা এ রকম করে মোড়ার খরচটা অপ্রয়োজনীয় মনে করে না— যা দুদণ্ডের বেশি ব্যবহার করতে হবে না তাও সুন্দর দেখতে হওয়া আবশ্যক। এই

রকম প্রতি পদে এদের শিল্পচর্চার উন্নতি হয়। প্রথম হয়তো এই রকম সুশ্রী অঙ্গচালনা প্রভৃতি অভ্যাসসাধ্য, কিন্তু ক্রমে সেটা স্বাভাবিক হয়ে যায় ও বংশাবলীক্রমে সংক্রামিত হতে থাকে। এ রকম শিল্পচর্চার ভাব খুব ভালো তার আর সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা স্বতন্ত্র পরিষ্কারের ভাব থাকাও আবশ্যক। এখানকার লোকেরা খাবার পরে আঁচায় না ; কেননা, আঁচানো-জল মুখ থেকে পড়ছে, সে অতি কুশ্রী দেখায়। শ্রীহানি হয় বলে পরিষ্কার হওয়া হয় না। এখানে যে রকম কাশি সর্দির প্রাদুর্ভাব তাতে ঘরে একটা পিকদানি নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু সে অতি কুশ্রী পদার্থ বলে ঘরে রাখা হয় না— রুমালে সমস্ত কাজ চলে। আমাদের দেশের যে রকম পরিষ্কার-ভাব তাতে আমরা বরঞ্চ ঘরে একটা পিকদানি রাখতে পারি, কিন্তু জামার পকেটে এ রকম একটা বীভৎস পদার্থ রাখতে ঘৃণা হয়। কিন্তু এখানে চোখেরই আধিপত্য। রুমাল কেউ দেখতে পাবে না, তা হলেই হল। চুলটি বেশ পরিষ্কার করে আঁচড়ানো থাকবে, মুখটি ও হাত দুটি বেশ সাফ থাকবে, তা হলেই লোকে সন্তুষ্ট থাকে— স্নান করবার বিশেষ আবশ্যক নেই। এখানে জামার উপরে অন্যান্য অনেক কাপড় পরে ব'লে জামার সমস্তটা দেখা যায় না, খালি বুকের ও হাতের কাছে একটু বেরিয়ে থাকে। এক রকম জামা আছে, তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া, সেটুকু খুলে ধোবার বাড়ি দেওয়া যায়। তাতে সুবিধা হচ্ছে যে, ময়লা হয়ে গেলে জামা বদলাবার কোনো আবশ্যক করে না, সেই জোড়া টুকরোগুলো বদলালেই হল। এখানকার দাসীদের কোমরে এক apron বাঁধা থাকে, সেইটি দিয়ে তাঁরা না পোঁছেন এমন পদার্থ নেই। খাবার কাঁচের প্লেট যে দেখছ ঝক্ ঝক্ করছে সেটিও সেই সর্বপাবক apronটি দিয়ে মোছা

হয়েছে। কিন্তু তাতে কী হানি, দেখতে তো কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। এখানকার লোকেরা কিছু অপরিষ্কার নয়; আমাদের দেশে যাকে 'নোংরা' বলে, তাই। আমাদের দেশের পরিষ্কার ও এখানকার পরিষ্কারের একটা মিলন হলেই বেশ সর্বাঙ্গসুন্দর মিলন হয়। ভালো দেখতে হওয়ার প্রতি আমাদের অত্যন্ত কম লক্ষ; কিন্তু তার প্রধান কারণ আমরা গরিব। শিল্পের দিকে মনোযোগ দেবার আমাদের অবসর নেই। এখানে পরিষ্কার ভাবের যে অভাব আমরা দেখতে পাই, সে অনেকটা শীতের জন্যে। আমরা, যে-কোনো জিনিস হোক্‌-না কেন, জল দিয়ে পরিষ্কার না হলে পরিষ্কার মনে করি নে। এখানে অত জল নিয়ে নাড়াচাড়া পোষায় না। তা ছাড়া শীতের জন্য এখানকার জিনিসপত্র শীঘ্র 'নোংরা' হয়ে ওঠে না। আমাদের দেশে প্রায় সর্বদা গা খোলা থাকে, তা ছাড়া গর্মিতে এমন অপরিষ্কার হয়ে উঠতে হয় যে, না নাইলে তিষ্ঠোবার জো নেই। এখানে শীতে ও গায়ের আবরণ থাকাতে শরীর তত অপরিষ্কার হয় না। এখানে জিনিসপত্র পচে ওঠে না। এই রকম পরিষ্কারের পক্ষে নানা বিষয়ে সুবিধে। আমাদের দেশে যে রকম পরিষ্কারের ভাব আছে, তেমনি পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে অনেক কুসংস্কারও আছে। মনে করো আমাদের দেশের পুষ্করিণীতে কী না ফেলে? সে তৈলাক্ত অপরিষ্কার জলকুণ্ডে স্নান করলে আবার স্নান করবার আবশ্যক হয়। তেল মেখে জলে দুটো ডুব দিলেই আমরা গা সাফ হল মনে করি। আমরা নিজের শরীর ও খাওয়া-দাওয়া-সংক্রান্ত জিনিসের বিষয়ে বিশেষ পরিষ্কার থাকি, কিন্তু ঘর দুয়ার যথোচিত পরিষ্কার করি নে। আমাদের চার দিক এই রকম অপরিষ্কার থাকে বলে আমাদের স্বাস্থ্যও খারাপ। যা হোক, এ বিষয়ে আর অধিক বক্তৃতা দেব না। অন্যান্য দুই-এক কথা বলি।

আমাদের দুই-একটি করে আলাপী হতে লাগল। ডাক্তার M একজন আধবুড়ো চিকিৎসাব্যবসায়ী। তিনি একজন প্রকৃত ইংরাজ। ইংলন্‌ডের বহির্‌ভূত কোনো জিনিস তাঁর পছন্দসই নয়। তাঁর কাছে ক্ষুদ্র ইংলন্‌ডই সমস্ত পৃথিবী, তাঁর কল্পনা কখনো Dover Channel পার হয় নি। আমাদের তিনি অত্যন্ত কৃপাচক্ষে দেখতেন, বোধ হয় তার প্রধান কারণ— আমাদের ইংলন্‌ডে জন্ম হয় নি। তাঁর কল্পনার এমন অভাব যে, তিনি মনে করতে পারেন না যারা Ten Commandments মানে না তাদের মিথ্যে কথা বলতে কী করে সংকোচ হতে পারে? অখ্রীস্ট লোকদের নীতির বিরুদ্ধে এই তাঁর প্রধান যুক্তি। যে ইংরাজ নয়, যে খ্রীস্টান নয়, এমন একটা অপূর্ব-সৃষ্টি দেখলে তাঁর কল্পনা অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ে; তার মনুষ্যত্ব কী করে থাকতে পারে ভেবে পান না! তাঁর motto হচ্ছে: Gladly he would learn and gladly teach। কিন্তু আমি দেখলুম তাঁর learn করবার ঢের আছে, কিন্তু teach করবার মতো সম্বল খুব কম। তাঁর স্বদেশীয় সাহিত্যের বিষয়ে তিনি আশ্চর্য কম জানেন; কতকগুলি মাসিক পত্রিকা পড়ে তিনি প্রতি মাসে দুই-চারিটি করে ভাসা-ভাসা জ্ঞান লাভ করেন। ক্রমশ জানতে পারলুম, তিনি আমাদের মনে মনে uneducated বলে জানেন, কেননা তিনি কল্পনা করতে পারেন না একজন Indian কী করে educated হতে পারে। এখানকার বিবিরা শীতকালে হাত গরম রাখবার জন্যে এক রকম গোলাকার পদার্থের মধ্যে হাত গুঁজে রাখে, তাকে muff বলে, প্রথম বিলেতে এসে সেই অপূর্ব পদার্থ যখন দেখি তখন Dr. Mকে সে দ্রব্যটা কী জিজ্ঞাসা করি। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি আকাশ থেকে পড়লেন, muff পদার্থটা আমি জানি নে শুনে তিনি ভেবে খুন। এর চেয়ে

educationএর অভাব কী হতে পারে বলো। muff বলে একটা সামান্য পদার্থ, যা বিলেতের একটা সামান্য অশিক্ষিত চাষা পর্যন্ত দেখলে বলে দিতে পারে, তা আমি জানি নে! এমন ভয়ংকর ভোঁতা কল্পনা আমি আর কখনো দেখি নি। কিন্তু আমি এখানকার অনেক লোকের রোগ দেখিছি, তাঁরা আশা করেন আমরা তাঁদের সমাজের প্রতি ছোটোখাটো বিষয় জানব। একদিন একটা নাচে গিয়েছিলুম, একজন বিবি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বধূটিকে (bride) তোমার কিরকম লাগছে?' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'নববধূটি কে?' অতগুলি মেয়ের মধ্যে একজন নববধূ কোথায় আছেন তা আমি কিছুই জানতুম না। শুনে সে বিবিটি একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলেন; তিনি বললেন, 'তাঁর মাথায় orange blossom দেখে চিনতে পার নি?' আমার অপ্রস্তুত হবার কোনো কথা ছিল না, কিন্তু বিবিটি যে রকম আশ্চর্য হয়ে উঠেছিলেন তাতে আমাকে খানিকটা অপ্রস্তুত হতে হল। থতমত খেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওঁর স্বামী সঙ্গে এয়েছেন?' বিবিটি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'স্বামী আসেন নি! নববিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী নেই!' আমি ভয় পেয়ে ভাবলেম, আর অধিক প্রশ্ন করা শ্রেয় নয়। বিবিটি ভাবলেন, 'কোথাকার একটা নিউজিলান্ডরের সঙ্গে কথা কচ্ছি! এ orange blossom দেখে bride চিনতে পারে না, আবার জিজ্ঞাসা করে brideএর সঙ্গে স্বামী এয়েছে কিনা! *Shocking!*' তাঁরা মনে করেন, এত সামান্য বিষয় আমাদের আত্মপ্রত্যয় থেকে জানা উচিত। এই রকম এখানকার অনেক লোকের ভাব দেখিছি। যা হোক, Dr. Mএর কাছে এই রকম অনেক বিষয়ে আমার educationএর অভাব প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি সহজেই মনে করেছিলেন, 'যে ব্যক্তি muff কাকে বলে জানে না সে যে

Shakespeare পড়েছে সে একেবারে absurd !'

দুই মিস Kর সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা এখানকার পাদ্রির মেয়ে। পাড়ার পরিবারদের দেখাশুনো, Sunday Schoolএর বন্দোবস্ত করা, working menদের জন্যে Temperance সভা স্থাপন ও তাদের আমোদ দেবার জন্যে সেখানে গিয়ে গান বাজনা করা— এই-সকল কাজে তাঁরা দিন রাত্রি ব্যস্ত আছেন। বিদেশী বলে আমাদের তাঁরা অত্যন্ত যত্ন করতেন। নগরে কোথাও আমোদ উৎসব হলে আমাদের খবর দিতেন, আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, অবসর পেলে সকালে কিম্বা সন্ধ্যে বেলায় এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, ছেলেদের নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে গান শেখাতেন, এক-এক দিন তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে যেতুম। এই রকম আমাদের যথেষ্ট যত্ন ও আদর করতেন। বড়ো Miss K অত্যন্ত ভালো মানুষ ও গম্ভীর। একটা কথার উত্তর দিতে কেমন থতমত খেতেন। 'হাঁ— না— তা হবে— জানি নে' এই রকম তাঁর উত্তর। এক-এক সময় কী বলবেন ভেবে পেতেন না, এক-এক সময় একটা কথা বলতে বলতে মাঝখানে থেমে পড়তেন, আর কথা জোগাত না— সুতরাং বাকিটুকু আমাদের কল্পনার ওপর রেখে দিতেন। তাঁকে কোনো বিষয়ে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করলে তিনি বিব্রত হয়ে পড়তেন। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত 'আজ কি বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে ?' তিনি বলতেন, 'কী করে বলব !' তিনি বুঝতেন না সে বিষয়ে আমরা তাঁর মুখ থেকে এ কথা অভ্রান্ত বেদবাক্য শুনতে চাচ্ছি নে, তিনি কী আন্দাজ করেন তাই জানতে চাচ্ছি। কিন্তু তিনি আন্দাজ করতে নিতান্ত নারাজ। ছোটো Miss Kর মতো প্রশান্ত প্রফুল্লতার ভাব আর দেখি নি। একটি মূর্তিমান সন্তোষের ভাব। দেখে মনে হয় কোনো কালে তাঁর

মনের কোনোখানে এক তিল আঁচড় পড়ে নি। খুব ভালো মানুষ, সর্বদাই হাসি খুশি গল্প। কাপড়-চোপড়ের আড়ম্বর নেই—কোনো প্রকার ভাণ নেই; অত্যন্ত শাদাসিদে।

ডাক্তার Mএর বাড়িতে একদিন আমাদের সান্ধ্যনিমন্ত্রণ হল। এখানকার নেমন্তন্নে আমাদের দেশের মতো খাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় গান-বাজনা আমোদ-প্রমোদের জন্যই দশ জনকে ডাকা হয়। আমরা সন্ধ্যের সময় গিয়ে হাজির হলুম। একটি ছোটো ঘরে অনেকগুলি মহিলা ও পুরুষের সমাগম হয়েছে। ঘরে প্রবেশ করে কর্তা-গিন্নিকে আমাদের সম্মান জানালুম। সমাগত লোকদের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন সম্ভাষণ ও আলাপ হল। ঘরে জায়গার এত টানাটানি ও লোক এত বেশি যে চৌকির অত্যন্ত অভাব হয়েছিল; অধিকাংশ পুরুষে মিলে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছিলুম। নতুন কোনো অভ্যাগত মহিলা এলে গিন্নি কিম্বা কর্তা তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ করে দিচ্ছেন, আলাপ হবা মাত্র তাঁর পাশে গিয়ে একবার বসছি কিম্বা দাঁড়াচ্ছি ও দুই একটা করে কথাবার্তা আরম্ভ করছি। প্রায় weather নিয়ে কথা আরম্ভ হয়; মহিলাটি বললেন, *'Dreadful weather!'* সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মতের ঐক্য হল। তার পরে তিনি অনুমান করলেন যে আমাদের পক্ষে অর্থাৎ Indianদের পক্ষে এমন weather বিশেষ trying ও আশা করলেন আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার হয়ে যাবে ইত্যাদি। তার পরে এই সূত্রে নানা কথা উঠল আর-কি। সভার মধ্যে দুইজন সুন্দরী উপস্থিত ছিলেন, বলা বাহুল্য যে তাঁরা জানতেন তাঁরা সুন্দরী। বিলেতে আত্মসৌন্দর্য-অনভিজ্ঞা যুবতী দেখবার জো নেই! এখানে সৌন্দর্যের পুজো হয়; এখানে রূপ কোনোমতে গুপ্ত থাকতে পারে না, রূপাভিমান সুপ্ত

থাকতে পারে না; চার দিক থেকে প্রশংসার কোলাহল তাকে জাগিয়ে তোলে; রূপের আলো দেখবা মাত্র ভক্তদের পতঙ্গহৃদয় চার দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তাকে ঘিরে ফেলে ও রূপসী যে দিকে যান সেই ফড়িঙের দল তার চতুর্দিকে লাফিয়ে চলতে থাকে। ball roomএ তাঁর দর অত্যন্ত চড়া; নাচে তাঁর সাহচর্য-সুখ পাবার জন্যে দরখাস্তের পর দরখাস্ত আসছে; তাঁর রুমাল কুড়িয়ে দেবার জন্যে শত শত হাত প্রস্তুত, তাঁর তিলমাত্র কাজ করে দেবার জন্য শত শত কায়মনোবাক্যে দিবারাত্রি নিযুক্ত। রূপবান পুরুষদেরও যথোচিত আদর আছে, তারা এখানকার drawing roomএর darling হয়ে ওঠে, যুবতীরা তাদের আদর দিয়ে দিয়ে অনর্থ করে তোলে। আমি দেখছি, এ কথা শুনে তোমার এখানে আসতে অত্যন্ত লোভ হবে। তোমার মতো সুপুরুষ এখানকার মতো রূপমুগ্ধ দেশে এলে এখানকার হৃদয়রাজ্যে এত ভাঙচুর লোকসান করতে পার যে, সে একটা নিদারুণ করুণরসোদ্দীপক ব্যাপার হয়ে ওঠে। তা হলে চতুর্দিক থেকে—

ঘন
নিশ্বাস প্রলয়বায়ু, অশ্রুবারিধারা
আসার, জীমূতমন্দ্র হাহাকাররব—

তুলে দেও। তা হলে তোমার হৃদয়টিকেও খরচের খাতায় লিখতে হয়; এত নিশ্বাস-প্রলয়বায়ুতে ও অশ্রুবারিধারা-আসারে কেউ যদি টি‍ঁকে থাকতে পারেন তা হলে তেমন লোকের মন spiritএ ডুবিয়ে যত্নপূর্বক preserve করে British Museumএ রেখে দেওয়া উচিত, তেমন মন ফরমাস দিলে পাওয়া যায় না। বিলেতে রূপের চেয়ে recommendation letter খুব কম আছে। এ রকম অবস্থায় রূপ কখনো লুকিয়ে থাকতে পারে না। যা হোক,

নিমন্ত্রণসভায় Miss H-দ্বয় রূপসীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই কেমন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে ছিলেন। বড়ো যে মেশামেশি হাসিখুশি তা ছিল না। ছোটো মিস একটা কৌচে গিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন, আর বড়ো মিস দেয়ালের কাছে এক চৌকি অধিকার করলেন। আমার বোধ হয়, তার কারণ আমরা দুই-এক জন ছাড়া ঘরে আর কেউ যুবক ছিল না। তরুণনেত্র তাঁদের রূপ ও সাজ-সজ্জা যেমন উপভোগ করতে পারে এমন তো আর চসমা-চক্ষু পারে না। যা হোক, আমরা দুই-এক জনে তাঁদের আমোদে রাখবার জন্যে নিযুক্ত হলুম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কথোপকথনশাস্ত্রে তেমন বিচক্ষণ নই, এখানে যাকে উজ্জ্বল (bright) বলে তা নই, অনর্গল গল্প হাসি আসে না ও আকারে-ইঙ্গিতে কথার আভাসে আমি রূপসীকে জানিয়ে দিতে পারি নে যে, আমার চকোরনেত্র তাঁর রূপের জ্যোৎস্না ও আমার কর্ণচাতক তাঁর বাক্যধারা পান করে স্বর্গসুখ ভোগ করছে। বরঞ্চ এক-এক সময় তাঁরা আমার গম্ভীর মুখ ও সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা শুনে তার উলটো স্থির করেন। এ রকম অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; কেননা আমার হৃদয় বাস্তবিক অত্যন্ত 'gallant', যদিও আমার বাইরের ভাব দেখলে লোকের মন ঠিক তার উলটো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবে। গৃহকর্তা একজন সংগীতশাস্ত্রজ্ঞতাভিমানিনী প্রৌঢ়া মহিলাকে বাজাতে অনুরোধ করলেন, তিনি এই অনুরোধের জন্যে এতক্ষণ আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন। গৃহের মহিলাদের মধ্যে তাঁর বয়স সব চেয়ে বেশি, এই জন্যে তিনি সব চেয়ে বেশি সাজগোজ করে এসেছিলেন— তাঁর দু হাতের দশ আঙুলে যত আংটি ছিল সভাস্থ সকল লোকের আঙুলের আংটির সমষ্টি তার অর্ধেক হবে। কিন্তু হাজার সাজসজ্জা করুন, তিনি বেশ জানতেন যে তাঁর রূপের

বাজার সম্পূর্ণ দেউলে হয়ে গেছে। সুতরাং তিনি আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন, কখন তাঁর বাজাবার অবসর আসবে। আমি যদি নিমন্ত্রণকর্তা হতুম আর আগে থাকতে না জানতুম যে তিনি পিয়ানো বাজাতে পারেন, তা হলে তাঁর দশ আঙুলের বিশটা আংটি দেখে আমি বুঝতে পারতুম যে, তিনি পিয়ানো বাজাবেন ব'লে বাড়ি থেকে স্থির সংকল্প করে এয়েছেন। যখন একজন কোনো বিখ্যাত বাজিয়ে আপনার কেরামতি দেখাবার জন্যে বাজাতে বসে তখন তা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে ওঠে। আমি এখানকার গান বা বাজনার টপ্পা বা খেয়াল বেশ বুঝতে পারি, এক-একটা খুব ভালো লাগে, কিন্তু কালোয়াতি কোলাহলে এক-একবার আমাকে অত্যন্ত অধীর করে তোলে। তাঁর বাজনা সাঙ্গ হলে পর গৃহকর্ত্রী আমাকে গান গাবার জন্যে অনুরোধ আরম্ভ করলেন। আমি বড়ো মুশকিলে পড়লুম। আমি জানতুম, আমাদের দেশের গানের ওপর যে তাঁদের বড়ো অনুরাগ আছে তা নয়। তবে আমাকে গান করতে বলবার তাৎপর্য কী? গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী দুজনেই আমার গান পূর্বে শুনেছিলেন, সে গানগুলো তাঁদের অত্যন্ত হাস্যজনক লেগেছিল। তাঁদের তাতে এত আমোদ বোধ হয়েছিল যে বাড়িতে গিয়েই কর্তা-গিন্নিতে মিলে পরামর্শ করলেন যে, আগামী নেমন্তন্নে এই কালো Indianটাকে চীৎকার করাতে হবে—তা হলে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সে ভারী একটা 'treat' হবে। আমি মনে মনে সে সমস্তই জানি, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কী করি বলো? যদি বা ভদ্রতার খাতিরও লঙ্ঘন করতে পারতেম, কিন্তু পাশ থেকে যখন সুন্দরী Miss H তাঁর মিষ্টতম আদরের স্বরে বললেন 'Yes, do give us a song Mr. T!' তখন Mr. T বাক্য ব্যয় না করে গান গাওয়ার ভূমিকা-স্বরূপ দুই-একটি

আরম্ভসূচক কাশিধ্বনি করলেন। সমস্ত সভা শান্ত হল। আমি ভাবতে লাগলুম, কী গান গাব। আমি নিজে যে গানগুলি ভালোবাসি সেগুলিকে এমন উলুবনে ছড়াতে কেমন প্রাণে লাগে; সে গানগুলি শুনে যে সকলে হাসবে তা আমি সহ্য করতে পারতুম না। একটা গান তো আরম্ভ করলেম। এমন শোচনীয় অবস্থায় আমি আমার জীবনে আর কখনো পড়ি নি; কোনো প্রকার করে গোটা-কতক সুর ও কথার সমষ্টি গলার ভিতর থেকে বের করেছিলেম আর-কি। সভাস্থ Miss ও Mrs. -দের এত হাসি পেয়েছিল যে, সে স্রোতের উচ্ছ্বাসে ভদ্রতার বাঁধ টলমল করছিল— কোনোমতে তাঁরা হাসি গোপন করতে পারছিলেন না, কেউ কেউ হাসিকে কাশির রূপান্তরে পরিণত করলেন, কেউ কেউ হাত থেকে কী যেন পড়ে গেছে ভাণ করে ঘাড় নিচু করে হাসি লুকোতে চেষ্টা করছেন, একজন কোনো উপায় না দেখে তাঁর পার্শ্বস্থ সহচরীর পিঠের পেছনে মুখ লুকোলেন; যাঁরা কতকটা শান্ত থাকতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে চোখে চোখে টেলিগ্রাফ চলছিল। সেই সংগীতশাস্ত্রবিশারদ প্রৌঢ়াটির মুখে এমন একটু মৃদু ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের হাসি লেগেছিল যে, সে দেখে শরীরের রক্ত জল হয়ে আসে। এই রকম অবস্থায় আমার মতো ভালোমানুষ যে কী দুরবস্থায় পড়েছিল তা তোমরা বেশ কল্পনা করতে পারছ। গান যখন সাঙ্গ হল তখন আমার মুখ কান লাল হয়ে উঠেছে, কেবল কালো রঙ বলে কেউ দেখতে পায় নি। চার দিক থেকে একটা প্রশংসার কোলাহল উঠল, কিন্তু অত হাসির পর আমি আর সে দিকে বড়ো কর্ণপাত করলেম না। ছোটো Miss H আমাকে গানটা ইংরিজিতে অনুবাদ করে বলতে অনুরোধ করলেন, আমি অনুবাদ করলেম— গানটা হচ্ছে 'প্রেমের কথা আর বোলো না'।

তিনি অনুবাদটা শুনে আমাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের দেশে প্রেমের স্বাধীনতা আছে নাকি!' ভারতবর্ষের লোকেরা হ্যাট কোট পরে কি না, জ'ন্মে অবধি ইংরিজি কয় কি না ও শীত-কালে কখনো বরফের ওপরে skate করে কি না যিনি জানতেন না, তিনি এ খবরটি কোথা থেকে পেয়েছেন! আমি তো মুশকিলে পড়ে গেলুম, নতশিরে দুই-একটা অ্যা-য়োঁ করলুম আর-কি! যা হোক, সেই সন্ধ্যের মধ্যে আমাকে দুবার গান করতে হয়েছিল। এই রকম গানবাজানা গল্পসল্প চলতে লাগল। কতকগুলি রোমের ভগ্নাবশেষের ফোটোগ্রাফ ছিল, সেইগুলি নিয়ে গৃহকর্ত্রী কতকগুলি অভ্যাগতকে জড়ো করে দেখাতে লাগলেন। ডাক্তার M একটা telephone কিনে এনেছেন, সেইটি নিয়ে তিনি কতকগুলি লোকের কৌতূহল তৃপ্ত করছেন। পাশের ঘরে টেবিলে খাবার সাজানো আছে। এক-একবার গৃহকর্তা এসে এক-একজন পুরুষের কানে কানে বলে যাচ্ছেন, Miss অথবা Mrs. অমুককে supper-স্থানে নিয়ে যাও; তিনি গিয়ে সেই মহিলার কাছে তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন ও তাঁর বাহু গ্রহণ করে তাঁকে পাশের ঘরে আহারস্থলে নিয়ে গেলেন। এ রকম সভায় সকলে মিলে একেবারে খেতে যায় না, তার কারণ তা হলে আমোদ-প্রমোদের স্রোত অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। একে একে সকলের খাওয়া হয়ে যায়। এই রকম একসঙ্গে পুরুষ মহিলা সকলে মিলে গানবাজনা গল্প আমোদপ্রমোদ আহারাদিতে একটা সন্ধ্যা কাটানো গেল।

আমরা একটা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবের সময়েই লোকজন একত্রে ডেকে খাওয়াদাওয়া করি। আমাদের মধ্যে পরস্পর মিলনের উপলক্ষ্য খুব কম। তা ছাড়া, যাঁদের সভার অধিষ্ঠাত্রী করা উচিত সেই মহিলারাই আমাদের নিমন্ত্রণসভায়

উপস্থিত থাকেন না। খাওয়াদাওয়াই হচ্ছে আমাদের প্রধান আমোদ— তা ছাড়া আর বাকি যে-সব আমোদ, যেমন বাইনাচ যাত্রা গান প্রভৃতি, সমস্তই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেয়ে উচ্চতর আমোদ যে মানুষ পরস্পরে সমভাবে মিলে মেশামেশি করা, পরস্পর পরস্পরকে আমোদ দেবার জন্যে নিজের সমস্ত গুণ প্রকাশ করা, পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে প্রশংসা ও মমতা পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা, সে-সকল আমাদের মধ্যে নেই। কতকগুলো নীচ শ্রেণীর ভাড়াটে মেয়ে বা এক রাত্তিরের জন্যে ধার-করা গাইয়ে যখন জঘন্য অঙ্গভঙ্গী করছে, বা ভাবসম্পর্ক-শূন্য রাগিণী ভাঁজছে, তখন আমরা একদল নিমন্ত্রিত লোক হাঁ করে তাকিয়ে থাকি ও 'বাহবা বাহবা' করি। কিন্তু পরস্পরকে আমোদ দেবার জন্যে আমরা সকলে মিলে গানবাজনা আমোদপ্রমোদ করি নে। এই রকম কেনা বা ভাড়া-করা আমোদ আমরা নাট্যশালা বা রঙ্গভূমিতে প্রত্যাশা করি ; কিন্তু যখন একজন বন্ধুর বাড়িতে জড়ো হয়েছি তখন সকল ভদ্রলোকে মিলে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা ও সদ্ভাবের চর্চা করাই উচিত। আমরা যখন বাইনাচ-দেখা গান-শোনা বা ঐ রকম কোনো আমোদের জন্যে একত্র হই তখন মনে হয় কতকগুলো লোক একটা নাট্যগৃহে গেছে, কেবল প্রভেদের মধ্যে সেখেনে টিকিট কিনতে হয় না। সে রকম নিমন্ত্রণসভায় গেলে, মানুষ যে সামাজিক জীব, সে কেবল কতকগুলো প্রাণী আঁচড়া-আঁচড়ি না করে একত্রে রয়েছে দেখেই বোধ হয়। পরস্পরকে আমোদের জন্যে পরস্পরের উপর নির্ভর করতে হয় না। একজন গান করছে বা নাচছে আমরা সকলে মিলে শুনছি বা দেখছি, যদি নিজের নিজের বাড়িতে বসে শোনা বা দেখা যেত, তা হলে আমরা পরিশ্রম স্বীকার করে এক জায়গায় জড়ো হতেম না। মেয়ে

পুরুষে একত্রে মিলে আমোদপ্রমোদ করাই তো স্বাভাবিক। মেয়েরা তো মনুষ্যজাতির অন্তর্গত, ঈশ্বর তো তাদের সমাজের এক অংশ করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষে মানুষে আমোদপ্রমোদে মেশামেশি করাকে একটা মহাপাতক, সমাজবিরুদ্ধ, রোমাঞ্চজনক ব্যাপার করে তোলা শুদ্ধ অস্বাভাবিক নয়, তা অসামাজিক, সুতরাং এক হিসেবে অসভ্য। পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদপ্রমোদে লিপ্ত রয়েছে, আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি একটা পোষা প্রাণীর মতো অন্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে। এক দল বুদ্ধিমান বিবেচনাশক্তিবিশিষ্ট জীবকে কত শত শতাব্দী হতে নির্দয় লোকাচারের শাসন পীড়ন দমন বন্ধন করে করে পোষা জন্তুর চেয়ে নির্জীব বশীভূত সংকুচিত সংকীর্ণমন করে তোলা হয়েছে, সে একবার ভালো করে কল্পনা করে দেখতে গেলে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। কোনো একজন মানুষের 'পরে এ রকম সম্পূর্ণ একাধিপত্য করা — একজন বুদ্ধি ও হৃদয় -বিশিষ্ট মানুষকে জন্তুর মতো, এমন-কি, তার চেয়ে অধম একটা ব্যবহার্য জড়পদার্থের মতো সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রয়োজনের জিনিস করে তোলা— যদি তার এক তাল সুখের জন্যে তোমার এক তিল সুখের ব্যাঘাত হয় তা হলে সেটুকুও উচ্ছিন্ন করে দেওয়া— যদি তোমার ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্যে তাকে চিরস্থায়ী কষ্ট পেতে হয় তবে তাও অম্লানবদনে তার স্কন্ধে স্থাপন করা— এ-সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়; সমাজের অর্ধেক মানুষকে পশু করে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে প্রচার করো তা হলে তাঁর নামের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়। আমরা অনেক জিনিস না দেখলে দূর থেকে কল্পনা করতে পারি

নে, এমন-কি বিশ্বাস করতে পারি নে। এখেনে যতগুলি ভারতবর্ষীয় এয়েছেন, সর্ব প্রথমেই তাদের চোখে কী ঠেকেছে?— এখানকার সমাজের সুখ ও উন্নতি -সাধনে মহিলাদের নিতান্ত-প্রয়োজনীয় সহায়তা। যাঁরা স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, এখেনে এসে নিশ্চয়ই তাঁদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে।[১]

এখানকার নিমন্ত্রণসভা শিক্ষার যে কত সাহায্য করে তার ঠিক নেই। মুখে মুখে কথাবার্তায় মেয়ে-পুরুষদের মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে যায়। বিনা কষ্টে ও অলক্ষিত ভাবে মনের একটা শিক্ষা হতে থাকে। একটা বিষয়ে নানা লোকের মত শুনতে পাওয়া যায়; কিরকম করে মত গঠিত করতে হয়, কিরকম করে মত ব্যক্ত করতে হয় ও কিরকম করে মতের প্রতিবাদ করতে হয়, সে বিষয় প্রতি মুহূর্তে অভ্যাস হতে থাকে। সমাজে মিশতে গেলে নানা বিরোধী মতের একটা সংঘাত উপস্থিত হয়, সুতরাং একটা বিষয়ের চার দিক দেখতে পাওয়া যায়। যদি দৈবাৎ বিবেচনা না করে একটা মত স্থির করো অমনি সে মত চারি দিক থেকে হুঁচট খেতে থাকে, সুতরাং তোমাকে অনেকটা সাবধান হতে হয়। সাহিত্য বিজ্ঞান রাজনীতি -সম্বন্ধীয় খবর দেখতে দেখতে মুখে মুখে সমস্ত দেশময় রাষ্ট্র হয়ে যায়। একটা নতুন বই যদি ভালো হয়ে থাকে, তবে মুখে মুখে তার বিজ্ঞাপন প্রচার হয় ও দেশের মেয়ে-পুরুষ সকলেই সে বইয়ের অস্তিত্ব জানতে পারে। এই রকম করে চার দিকের বাতাসে যেন জ্ঞান ছড়িয়ে যায়, নিশ্বেসের সঙ্গে যেন জ্ঞান লাভ করা যায়। এখানকার নিমন্ত্রণসভা গুণীদের উৎসাহ দেবার প্রধান স্থান। সভায় তাদের সম্মানের আর সীমা নেই। যাঁদের সংগতি ও যোগ্যতা আছে তাঁরা সকলেই গুণীদের নিমন্ত্রণ করতে চান। এখানকার নিমন্ত্রণসভার তাঁরা 'lion'— সিংহ।

মহা মহা কুলীন ব্যক্তিদের ঘরে তাঁরা পদধূলি দিলে শত শত Duchess Countessরা আপনাদের কৃতার্থ মনে করেন। এখানে গুণের আদর দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আমাদের দেশের গুণীলোকদের যখন মনে করি তখন মনে হয়, তাঁরা যদি ইংলন্ডে জন্মাতেন তা হলে তাঁদের পক্ষে ভালো হত। স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের কাছে থেকে প্রশংসা ও মমতা পাবার জন্যে আপনার আপনার গুণের চর্চা করতে থাকে। সবসুদ্ধ জড়িয়ে এখানকার মেশামেশির ভাব অতি সুন্দর। সে না দেখলে ভালো বোঝবার যো নেই। বাইনাচ দেখে, গান শুনে ও লুচি সন্দেশ হজম বা বদ-হজম করে যে ফল হয়, তার চেয়ে এখানকার সমাজে মিশলে যে মনের কত উন্নতি হয় তা আমি এই ক্ষুদ্র চিঠির মধ্যে যথেষ্ট বর্ণনা করতে পারি নে।

এখানে আবার মিলনের উপলক্ষ্য কত প্রকার আছে তার সংখ্যা নেই। ডিনার, বল, conversazione, চা-সভা, lawn-parties, excursions, picnics ইত্যাদি। Thackeray বলেন : English Society has this eminent advantage over all others— that is if there be any society left in the wretched distracted old European continent— that it is above all others a dinner-giving society. অবসর পেলে এক সন্ধ্যে বন্ধুবান্ধবদের জড় করে আহারাদি করা ও আমোদপ্রমোদ করে কাটানো এখানকার পরিবারের অবশ্য-কর্তব্য কাজের মধ্যে। ডিনার-সভার বর্ণনা করতে বসা বাহুল্য। ডাক্তার Mএর বাড়িতে যে partyর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে ডিনার-পার্টির প্রভেদ কেবল দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে (এ ম্লেচ্ছদের দেশে ভক্ষণটা আবার দক্ষিণ বাম উভয় হস্তের ব্যাপার)। আমি একবার এখানকার একটি বোট-যাত্রা ও picnic

partyর মধ্যে ছিলুম। এখানকার একটি রাবিবারিক সভার সভ্যেরা এই বোট-যাত্রার উদ্‌যোগী। এ সভার সভ্য ও সভ্যারা sabbath-পালনের বিরোধী। তাই জন্যে তাঁরা রবিবারে একত্র হয়ে নির্দোষ আমোদপ্রমোদ করেন। এই রাবিবারিক সভার সভ্য আমাদের এক বাঙালি মিত্র ম— মহাশয় আমাদের অনুগ্রহ করে টিকিট দেন। লন্‌ডন থেকে রেলওয়ে করে টেম্‌সের ধারের এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলেম। গিয়ে দেখলুম টেম্‌সে একটা প্রকাণ্ড নৌকা বাঁধা রয়েছে, আর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন রবিবার-বিদ্রোহী মেয়েপুরুষে একত্র হয়েছে। দিনটা অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর যাঁদের যাঁদের আসবার কথা ছিল তাঁরা সকলে আসেন নি। আমার নিজের বড়ো এ পার্টিতে যোগ দেবার ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু ম— মহাশয় নাছোড়বান্দা, তিনি আমাকে বিশেষ করে লোভ দেখালেন যে সেখেনে অনেক সুন্দরীর সমাগম হচ্ছে। শুনে আমি একটু যত্ন ও পরিশ্রম -পূর্বক সাজগোজ করে যথাসময়ে হাজির হলুম। গিয়ে দেখি বোটে কেবল একটি মহিলা আছেন যাঁকে দূর থেকে দেখলে হঠাৎ সুন্দরী বলে ভ্রম হয়, আর বাকি মহিলাদের (তাঁদের প্রতি আমি অসম্মান করছি নে) কাউকেই আমার চোখে দর্শনযোগ্য বলে ঠেকে নি। যে একটি-মাত্র রূপসী ছিলেন তাঁর চার দিকে এমন একটি ঘন ব্যূহ বদ্ধ হয়েছিল যে তা ভেদ করবার চেষ্টা করা আমার মতো ক্ষীণপ্রাণীর পক্ষে দুরাশা। সুতরাং আমি সে টক আঙুর ফল পরিত্যাগ করে ম— মহাশয়ের কাছে গিয়ে কৈফিয়ত চাইলুম। কিন্তু কৈফিয়ত সন্তোষজনক হোক আর না হোক ফলে সমানই কথা। আমরা অনেক ভারতবর্ষীয় একত্র হয়েছিলুম। বোধ হয় ম— মহাশয় সকলকেই সুন্দরীর লোভ দেখিয়েছিলেন, কেননা, সকলেই প্রায় বাহারে

সাজগোজ করে গিয়েছিলেন। অনেকেই গলায় লাল ফাঁসি (neck-tie) বেঁধে এয়েছিলেন, অন্যের গলায় ফাঁসি লাগানো তাঁদের আন্তরিক অভিপ্রায় ; আর ম— মহাশয় স্বয়ং তাঁর neck-tieএ একটি তলবারের আকারের পিন গুঁজে এয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে একজন তাঁকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেশের সমস্ত tieএ যে তলবারের আঘাত করা হয়েছে, ওটা কি তারই বাহ্য লক্ষণ ?' তিনি হেসে বললেন 'তা নয় গো, বুকের কাছে একটা কটাক্ষের ছুরি বিঁধেছে, ওটা তারই চিহ্ন।' দেশে থাকতে বিঁধেছিল কি এখানে বিঁধেছে তা কিছু বললেন না। ম— মহাশয়ের হাসি-তামাশার বিরাম নেই ; সে দিন তিনি নৌকার সমস্ত লোকের সঙ্গে সমস্ত দিন ঠাট্টা ও গল্প করে কাটিয়েছিলেন। একবার তিনি সমস্ত মহিলাদের হাত দেখে গুনতে আরম্ভ করেছিলেন— তখন তিনি এত হাস্যজনক কথা বলেছিলেন ও বোট-সুদ্ধ মহিলাদের এত প্রচুর পরিমাণে হাসিয়েছিলেন যে, সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর উপর আমার মনে মনে একটুখানি দ্বেষের উদ্রেক হয়েছিল। বোট-সুদ্ধ মেয়ে যখন হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন, তখন আমি এবং আর দুই-চারিটি পুরুষ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়েছিলেম। যথাসময়ে বোট ছেড়েছিল। নদী এত ছোটো যে, আমাদের দেশের খালের কাছাকাছি পৌঁছয়। জায়গায় জায়গায় নদীর ধারের দৃশ্য মন্দ নয়, কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে যে বিশেষ সুন্দর দেখতে তা নয়। নৌকোর মধ্যে আমাদের আলাপ পরিচয় গল্পসল্প চলতে লাগল। একজন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের একজন দিশি লোকের ধর্মসম্বন্ধীয় তর্ক উঠল। আমাদের সঙ্গে একজনের আলাপ হল, তিনি তাঁদের ইংরিজি সাহিত্যের কথা তুললেন ; তাঁর শেলীর কবিতা অত্যন্ত ভালো লাগে, সে বিষয়ে

আমার সঙ্গে তাঁর মতের সম্পূর্ণ মিল হল দেখে তিনি ভারী খুশি হলেন; তিনি আমাকে বিশেষ করে তাঁর বাড়ি যেতে অনুরোধ করলেন ও বললেন, সেখানে গিয়ে আমরা দুজনে সাহিত্য আলোচনা করব। ইনি ইংরিজি সাহিত্য ও তাঁর নিজের দেশের রাজনীতি ভালো রকম করে চর্চা করেছেন, কিন্তু যেই ভারতবর্ষের কথা উঠল অমনি তাঁর অজ্ঞতা বেরিয়ে পড়ল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কোন্ রাজার অধীনে?' আমি অবাক হয়ে বললুম, 'ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের।' তিনি বললেন, 'তা আমি জানি, কিন্তু আমি বলছি কোন্ ভারতবর্ষীয় রাজার অব্যবহিত অধীনে।' কী ভয়ানক! কলকাতার বিষয়ে এঁর জ্ঞান এই রকম। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—'আমার অজ্ঞতা মাপ করবেন; ভারতবর্ষের বিষয়ে আমাদের ঢের জানা উচিত, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি আমি এ বিষয়ে খুব কম জানি।' এই রকম বোটের ছাতের উপর আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল; আমাদের মাথার উপরে একটা কাপড়ের আচ্ছাদন আছে; বোটের ঘরের মধ্যে আহারের আয়োজন হচ্ছে, সেখেনে স্থান নেই! মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছে, কাপড়ের আচ্ছাদনে সেটা নিবারণ করছে। কিন্তু হঠাৎ এমন ঘোরতর বাতাস ও বৃষ্টি হতে আরম্ভ হল যে কিছুতে নিবারণ হবার যো নেই। যে দিকে বৃষ্টির ছাঁট পৌঁচচ্ছে না সেই দিকে মেয়েদের রেখে আমরা আর-এক পাশে এসে ছাতা খুলে দাঁড়ালুম। ওমা, দেখি, আমাদের দিশি বন্ধু ক— মহাশয় সেই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন, আমি তাঁকে যথেষ্ট ঠাট্টা করে নিয়েছিলেম; তিনি বার বার করে বললেন যে, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য অভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি তা বিশ্বাস করি নে। আমি তাঁকে তখনি শাসিয়ে

রেখেছিলেম যে, দেশে এ কথা রাষ্ট্র করে দেব ; তিনি তখন বিশ্বাস করেন নি। তুমি এক কাজ কোরো তো— বিকেলে সেই ঘরটাতে যখন তোমাদের পাশার বৈঠক বসবে তখন তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে এই কথাটা ঘরের চারি দিকে বিস্তার করে দিয়ো। কিম্বা তা যদি না কর তো বিশ্বম্ভর দাদাকে এই কথাটা অতি গোপনে বোলো ও কাউকে বলতে বিশেষ করে বারণ কোরো, তা হলেই সপ্তাহের মধ্যে সকলের কানেই উঠবে। যা হোক, সে দিন আমরা বৃষ্টিতে তিন-চার বার করে ভিজেছিলেম। এই রকম ভিজতে ভিজতে আমরা আমাদের গম্য স্থানে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশে মেঘ আছে ও জমি ভিজে। মাঠে নেবে আমাদের খাওয়াদাওয়া করবার কথা ছিল, কিন্তু আকাশের ভাবগতিক দেখে তা আর হল না। খাবার সময় দেখি, আহারের অত্যন্ত বিস্তৃত আয়োজন। আমাদের partyর যিনি প্রধানা তিনি আমার অল্প খাওয়া দেখে বললেন যে, আমার picnicএর উপযুক্ত ক্ষিধে নেই ; কিন্তু তাঁর খাওয়ার পরিমাণ থেকে যদি picnicএর উপযুক্ত ক্ষিধের পরিমাণ অনুমান করে নিতে হয় তা হলে, আমি যদি গাছের পাতা ও হত্তুকি খেয়ে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে সহস্র বৎসর উপরে পা ও নীচে মাথা রেখে বৃকোদর ও অগস্ত্যমুনির আরাধনা করি তবু আমার picnicএর উপযুক্ত ক্ষিধে হয় না। খাওয়াদাওয়ার পর আমরা নৌকা থেকে নেবে বেড়াতে বেরলেম। কোনো কোনো প্রণয়ী-যুগল একটি ছোটো নৌকা নিয়ে দাঁড় বেয়ে চললেন, কেউ বা হাতে হাতে ধরে নিরিবিলি কানে কানে কথা কইতে কইতে মাঠে বেড়াতে লাগলেন। আমাদের সঙ্গে একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা তার ফোটোগ্রাফের সরঞ্জাম সঙ্গে করে এনেছিল, আমরা সমস্ত দল মাঠে দাঁড়ালেম— আমাদের ফোটোগ্রাফ নেওয়া হল। সে যন্ত্রে এক

সেকেন্ডের মধ্যে ফোটোগ্রাফ নেওয়া যায়, সুতরাং একটু-আধটু নড়লে-চড়লেও বড়ো একটা হানি হয় না। সহসা ম— মহাশয়ের খেয়ালে গেল যে আমরা যতগুলি কৃষ্ণমূর্তি আছি একত্রে সকলের ছবি নেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে তুই-একটি জন-বৃষের পুষ্যি বাছুর ছিলেন, তাঁরা এ প্রস্তাবে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন— পাছে কৃষ্ণ-মূর্তির দলের মধ্যে তাঁরাও পড়েন। কিন্তু এরকম একটা 'invidious distinction' করা তাঁদের মনঃপূত নয়। কিন্তু ম— মশায় ছাড়বার পাত্র নন ; তিনি ধরে বেঁধে দাঁড় করিয়ে আমাদের ছবি নেওয়ালেন। যা হোক, ছবি নেওয়া প্রভৃতি সাঙ্গ হলে পর নৌকা লন্ডন-অভিমুখে ছাড়া হল। তখন ভগবান মরীচিমালী তাঁহার সহস্ররশ্মিসংযমন-পুরঃসর অস্তাচলচূড়াবলম্বী কনকজলধরপটল-শয়নে বিশ্রান্ত মস্তক বিন্যাস-পূর্বক অরুণবর্ণ নিদ্রাতুর লোচন মুদ্রিত করিলেন ; বিহগকুল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবর্তন করিল ; গাভীবৃন্দ হম্বারব করিতে করিতে গোপালের অনুবর্তন করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আমরা লন্ডনের অভিমুখে যাত্রা করলেম। আমরা এক গাড়িতে কতকগুলি দিশিলোক ছিলেম ও আমাদের সঙ্গে একজন ইংরেজ পুরুষ ও ইংরেজ মহিলা ছিলেন। ম— মহাশয় আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং আমাদের হাসি-তামাশার আর অন্ত ছিল না। এইখানে তোমাকে একটা ঘোরতর গুপ্ত খবর দিচ্ছি, খবরদার আর কাউকে বোলো না। গাড়িতে আমাদের চ— মহাশয়ের রকম-সকম যদি দেখতে তবে অবাক হয়ে যেতে। মিস ড—য়ের সঙ্গে তিনি যে রকম ফিস্ ফিস্ করে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর মুখের 'পর যে রকম ভাবপূর্ণ দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন ও ঠিক তাঁর পাশে যে রকম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিলেন, যে, তাতে ক— মহাশয় ম— মহাশয় ও র— মহাশয়ের মধ্যে একটা

রহস্যপূর্ণ চোখ-টেপাটেপি পড়ে গেল ; ম— মহাশয় বাংলায় বলে উঠলেন, 'তুই ডাক্তারে মিলে তুজনের মনের উপর surgery প্র্যাক্‌টিস করছেন নাকি ?' চ— মহাশয় ডাক্তার এবং মিস ড—ও ডাক্তার।

১ স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে অতি সাবধানে কথাবার্তা কহা উচিত। ইংলন্‌ডে গেলেই বঙ্গীয় ইউরোপ-যাত্রীদের চর্মচক্ষে কী-যে এক বিস্ময়জনক ছবি পড়ে, তাহাতে করিয়া তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন একেবারেই বন্ধ হইয়া যায় ; ইংলন্‌ডের জলবায়ু স্বতন্ত্র, ইংলন্‌ডের পুরাবৃত্ত স্বতন্ত্র, ইংলন্‌ডের জন-সমাজের রুচি স্বতন্ত্র— আমাদের দেশের জলবায়ু পুরাবৃত্ত জনসমাজের রুচি স্বতন্ত্র— ইংলন্‌ডীয় প্রকৃতির উপর ইংলন্‌ডের সমাজ প্রতিষ্ঠিত, আমাদের দেশীয় প্রকৃতির উপর আমাদের দেশীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত— ইউরোপ-যাত্রী বঙ্গযুবকদের এ জ্ঞানটি সহসা বিলুপ্ত হইয়া যায়। লেখককে যদি জিজ্ঞাসা করি 'তুমি আমাদের দেশীয় প্রকৃতিকে সমূলে উন্মূলন করিয়া তাহার স্থানে ইংলন্‌ডীয় প্রকৃতিকে সিংহাসনস্থ করিতে চাও ?'— তাহা শুনিবামাত্র তিনি হয়তো শিহরিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ স্পষ্টাক্ষরে 'না' বলিবেন। আমাদের দেশের আচার ব্যবহার সভ্যতা যাহা-কিছু সমস্তই আমাদের দেশীয় প্রকৃতির গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি, অগ্রে সেই প্রকৃতিকে উন্‌মূলন না করিয়া তিনি কিরূপে তাহার সেই সন্তান-সন্ততিগুলির উচ্ছেদ-কামনাকে মনে স্থান দিতে পারেন ? অনতি-পূর্বে বহুতর ইংলন্‌ডীয় স্ত্রী-সমারোহের মধ্যে তিনি যখন একজনের মুখে দেশীয় স্ত্রীলোকোচিত মাধুর্য ও ভাবভঙ্গী অবলোকন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার কেন এত ভাব লাগিয়াছিল ? তখন তো বহিশ্চারিণী বহুভাষিণী ব্যাপিকা সমাজ-রাজ্ঞী অপেক্ষা অন্তঃপুরচারিণী মৃদুভাষিণী লজ্জাশীলা গৃহলক্ষ্মীর সৌন্দর্য তাঁহার চক্ষে ভালো লাগিয়াছিল। এখন কি তাঁহার সে ভাব অন্তরিত হইয়াছে ? তাহা তো বোধ হয় না— তিনি এক দিকে অধিক ঝোঁক দেওয়াতে লেখনীর বেগ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, ইহাই সম্ভব মনে হয়। শুধু কেবল স্বাধীনতা

হইলেই যদি স্ত্রীদিগের আর কোনো গুণের প্রয়োজন না হইত তাহা হইলে আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা তো নহে— যেমন স্বাধীনতা চাই তাহার সঙ্গে তেমনি শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি অনেকগুলি গুণ থাকা চাই তবেই তাঁহারা স্ত্রীলোকের আদর্শ-রূপে বরণীয় হইতে পারেন। নচেৎ স্ত্রীস্বাধীনতার আর-এক নাম স্বৈরচারিতা, ব্যাপিকতা, প্রগল্‌ভতা হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের দেশে এক্ষণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষাবিষয়ক স্বাধীনতা, রুচিবিষয়ক স্বাধীনতা ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার অপ্রতুল রহিয়াছে। তাহার সঙ্গে কী-মাত্রা স্ত্রীস্বাধীনতা ভালোয় ভালোয় টেঁকিয়া থাকিতে পারে তাহাই এখন বিবেচনাস্থলে। ইংলন্‌ডের আর-আর স্বাধীনতার সঙ্গে ইংলন্‌ডোচিত স্ত্রীস্বাধীনতা ইংলন্‌ডেই শোভা পায়; তেমনি যদি আমাদের দেশোচিত স্ত্রীস্বাধীনতা নৈসর্গিক শোভায় সমুত্থিত হয় তবেই ভালো। নইলে— মাথাটা খুব প্রকাণ্ড, ধড়খানি ছোটোখাটো— অথবা মাথায় হ্যাট, গায়ে জামা, পায়ে চটি— এইরূপ এক কিম্ভূতকিমাকার স্বাধীনতা সকলের সহিত খাপছাড়া হইয়া দিনকতক মিথ্যা দাপাদাপি করিয়া বেড়াইলে তাহাতে কাহার যে কী উপকার হইবে তাহা তো বুঝা যায় না। 'উঃ ইনি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন'— এরূপ যদি কেউ মনে করেন তবে তাঁহাদের জানা উচিত যে, এ স্বাধীনতা আত্মার স্বাধীনতাও নহে, দেশের স্বাধীনতাও নহে, কেবল পরপুরুষগণের সহিত স্ত্রীলোকগণের আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা— ইহা কতদূর প্রকৃতরূপে স্বাধীনতা নামের যোগ্য তাহাই সন্দেহস্থল। স্ত্রীরা যেমন গৃহকর্মের উপযুক্ত, পুরুষেরা সেইরূপ বহির্ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিবার উপযুক্ত। স্ত্রীগণের মধ্যে যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা অধিকাংশ কাল গৃহাভ্যন্তরে থাকিতে বাধ্য হন, এবং পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা অধিকাংশ কাল বাহিরে বিচরণ করিতে বাধ্য হন। অন্তঃপুরে থাকা স্ত্রীজনের পক্ষে সুবিধা বলিয়াই স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরবাসের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে; পুরুষেরা স্বার্থপর বলিয়া ওরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এ কথা কোনো কার্যের

কথা নহে। পুরুষেরা স্বার্থপর বলিয়া ছেলে-পিলে মানুষ করে না, রাঁধেবাড়ে না, ইত্যাদি কথা যদি সত্য হয় তবে এ কথাও কেন না সত্য হইবে যে, স্ত্রীরা স্বার্থপর বলিয়া আপিসে বেরোয় না, লাঙল চষে না, মোট বয় না ইত্যাদি। অন্তঃপুর একটা কারাগার, অন্তঃপুরবাসিনীরা একটা বোবা জানোয়ার, পিতা-মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা দাসত্ব, এ-সকল ইংরাজি বাঁধি বোল ইংরাজের মুখেই শোভা পায়— বিশেষতঃ সেই-সব মানোয়ারীই বলো আর জানোয়ারই বলো তাঁহাদের মুখে যাঁহারা নারিকেলের ছোবড়া ভক্ষণ করিয়া তাহার অবশিষ্ট অংশকে আঁটি মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। যে ব্যক্তি আপন পিঙ্গলনয়নে কল্পনার দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিয়া আমাদের অন্তঃপুর-বাসিনীদিগকে কেবল শাসনভয়ে জড়সড় হইয়া সকল কার্য করিতে দেখে, যাহারা দেখে যে পতিকে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়ানোতে পতির প্রতি পত্নীর ভালোবাসা প্রকাশ পায় না, পত্নীর প্রতি পতির নির্দয় শাসনই প্রকাশ পায়; কুলরমণীরা-যে যে-সে পুরুষের সঙ্গে আমোদ করিয়া বেড়ায় না সে কেবল পতির শাসন-ভয়ে, পতির প্রতি ভালোবাসা তাহার কারণ নহে; এমন-কি যাহারা পুত্রের ভূমিষ্ঠ প্রণামে পিতৃভক্তি দেখে না, দাসত্বমাত্রই দেখে; তাহারা আমাদের দেশীয় সভ্যতার ছোবড়াটুকুই সার পদার্থ, সুতরাং সেই মহার্হ সভ্যতাকে নিতান্ত অসার পদার্থ, মনে করিবে ইহা তো ধরাই আছে। কিন্তু তাহার প্রকৃত সার পদার্থ যে তাহার ভিতরকার শাঁস ইহা যদি একজন বাঙালিরও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয় তবে সে বড়ো রহস্য। একজন বাঙালিকে যদি শিখাইতে হয় যে অন্তঃপুর গৃহিণীগণের কারাগার নহে, কিন্তু তাঁহাদের সাধের নিকেতন— পিতামাতার প্রতি পুত্রের নম্র ব্যবহার ভক্তি এবং ভালোবাসার নিদর্শন, তাহার মধ্যে কঠোরতা কিছুমাত্র নাই— স্ত্রীলোকেরা-যে যে-সে পুরুষের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া আমোদ করে না সে কেবল এই জন্যে যে, তাহাদের পবিত্র গার্হস্থ্যভাব আমোদপ্রমোদ অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক যত্নের ধন— এই-সকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব যদি বাঙালিকে শিক্ষা দিতে হয় তবে নূতন একটা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি না করিলে আর চলে না।

—ভারতী-সম্পাদক

সপ্তম পত্র

দেখো, তোমাকে যে পত্র লিখেছি তা ভারতীতে আমার ইচ্ছামতে প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে এক জায়গায় স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করেছিলুম, সম্পাদক-মহাশয় তার বিরুদ্ধে এক নোটের বাণ বর্ষণ করেছেন। কিন্তু সেটা সম্পাদক-মহাশয়ের লেখা কি না সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ বর্তমান। তিনি যে সেটা লেখেন নি তার প্রধান প্রমাণ হচ্ছে এই যে, সম্পাদক-মহাশয়ের গাম্ভীর্য এতদূর বিচলিত হতে আর কখনো দেখি নি; দ্বিতীয়তঃ যে-সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে তা সম্পাদক-মহাশয়ের লেখনীর অযোগ্য। খুব সম্ভব, কোনো উদ্ধত যুবক সম্পাদকের ক্ষমতা নিজের তরুণ স্কন্ধে গ্রহণ করে ভারতীর এক কোণে অলক্ষিত ভাবে এই নোটটি গুঁজে দিয়েছেন। নোটে খোঁচা মারার প্রধান গুণ হচ্ছে যে, তার উত্তর দিতে বসতে প্রবৃত্তি হয় না। একটা নোটের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে কোমর বেঁধে আড়ম্বর করা শোভা পায় না। গোলা দিয়ে ওড়াতে এলে রীতিমত যুদ্ধসজ্জা করতে হয়, কিন্তু তুড়ি দিয়ে ওড়াতে এলে আর কথাটি নেই। যা হোক, নানা কারণে একটা উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হলুম। লেখক-মহাশয় আমার মুখে কতকগুলো কথা গুঁজে দিয়েছেন, যা আমি একেবারেই বলি নি;[১] তিনি কতকগুলো কথা নিয়ে অনর্গল বকাবকি করে গিয়েছেন যা একেবারে উত্থাপন করবারই কোনো আবশ্যক ছিল না।[২] তিনি অনেক জায়গায় তলোয়ার নিয়ে তুমুল আস্ফালন করেছেন, কিন্তু তার ঘা লেগেছে বাতাসের গায়ে। আবার অনেক জায়গায় তিনি আমার লেখার বিরুদ্ধে বন্দুক ছুঁড়েছেন; তার থেকে আগুনও ছুটেছে, ধোঁওয়াও বেরিয়েছে, শব্দও হয়েছে, কিন্তু

তাতে গুলি নেই, ফাঁকা আওয়াজ ; ধোঁওয়ার প্রাচুর্য ও শব্দের প্রাখর্য থেকে পাঠকেরা কল্পনা করবেন যে, যার প্রতি লক্ষ করা হয়েছে সে ব্যক্তি বাসায় গিয়ে মরে থাকবে— কিন্তু সে ব্যক্তির কানে তালা ধরা ও নাকে ধোঁওয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো রকম সাংঘাতিক অপকার হয় নি।[৩] লেখক-মশায় বলেছেন যে, 'শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্ত্রীলোকদের আর কোনো গুণের প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলেই আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা তো নহে— যেমন স্বাধীনতা চাই তেমনি তাহার সঙ্গে শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য ইত্যাদি অনেক গুণ থাকা চাই।' ইত্যাদি। কিন্তু এতটা হাঙ্গামা কেন ? বাংলা বা সংস্কৃত, আর্য বা অনার্য, সাধু বা অসাধু কোনো ভাষার অভিধানে যদি স্বাধীনতা অর্থে বেহায়ামো, অবিনয়, অসরলতা, উচ্চের প্রতি অ-ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অ-দয়াদাক্ষিণ্য লেখা থাকত তা হলে এতটা বাক্যব্যয় শোভা পেত ; নইলে সরলহৃদয় পাঠকদের চোকে ধুলো দেওয়া ছাড়া লাথি মেরে মেরে এতটা বাক্যের ধুলো ওড়ানোর আর তো কোনো ফল দেখি নে।[৪] এই-সকল বকাবকির পর লেখক-মহাশয় যেখানে 'প্রকৃত কথা' বলেছেন সেইখানেই আমি সব চেয়ে কম আয়ত্ত করতে পেরেছি। তিনি বলেন, 'প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের দেশে এক্ষণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষাবিষয়ক স্বাধীনতা, রুচিবিষয়ক স্বাধীনতা ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার অভাব আছে, তাহার সঙ্গে কী মাত্রায় স্ত্রী-স্বাধীনতা ভালোয় ভালোয় টেঁকিয়া থাকিতে পারে তাহাই এখন বিবেচনাস্থলে।' প্রথমতঃ, 'শিক্ষাবিষয়ক স্বাধীনতা' 'রুচিবিষয়ক স্বাধীনতা' ও 'ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতা'র অর্থ আমি তো ভালো করে বুঝতেই

পারলুম না ;[৫] দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে স্ত্রী-স্বাধীনতার কোন্‌খানটা যোগ আছে তাই আমি ভালো করে দেখতে পেলেম না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই বললে এই বোঝায় যে, আমরা ইংরেজদের অধীনে বাস করছি ;[৬] যদি এমন হত যে, স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ জাতি, তাদের অন্তঃপুর থেকে মুক্ত করে দিলে ইংরাজদের রাজত্ব লোপ হবার সম্ভাবনা, তা হলে বুঝতাম যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই বলে আমাদের দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার ঘোরতর ব্যাঘাত বর্ত্তমান। একটা স্বাধীনতা নেই বলে পৃথিবীতে যদি আর কোনো রকম স্বাধীনতা না থাকে, তা হলে আমাদের দেশে পুরুষদের স্বাধীনতা আছে কী করে? আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই, অতএব পুরুষরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে না কেন ?[৭] রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতার যদি কোনো যোগ থাকে, তবে পুরুষ-স্বাধীনতার সঙ্গেও তার সেই পরিমাণে যোগ আছে সন্দেহ নাই। দেশীয় রাজার অধীনে থাকলে স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে আমাদের এখনকার চেয়ে কী সুবিধা হত ও কোন্ সুবিধা হত সেইটে বললেই আমি চুপ করব।[৮] লেখক-মহাশয় হয়তো বলবেন, এখনো আমাদের দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার সময় আসে নি, সময় এলে স্বাধীনতা আপনা-আপনিই আসত। হঠাৎ যদি আজই সমস্ত স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হয়, তা হলে তার থেকে খারাপ ফল হতে পারে। খুব সম্ভব আমাদের দেশে আজও স্ত্রীলোকদের স্বাধীন হবার সময় হয় নি, কিন্তু আমি তো আর তলবার হাতে করে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচার করছি নে ; কিম্বা আমি তো আজই ভারতবর্ষের Governor-General হয়ে আইন বের করছি নে যে, যারা স্ত্রী-কন্যাদের স্বাধীনতা না দেয়, তাদের ফাঁসি

দেওয়া হবে। আমি একটা কাগজে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রার্থনীয় কি না সে বিষয়ে আমার মত প্রকাশ করেছি; আমার আশাও ছিল না উদ্দেশ্যও ছিল না যে, আমার প্রবন্ধটি পড়বামাত্র অমনি ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোক তৎক্ষণাৎ তাদের স্ত্রী কন্যা ভগ্নীদের অন্তঃপুর থেকে মুক্ত করে তাঁদের অসূর্যম্পশ্যরূপত্বের গর্ব থেকে বঞ্চিত করবে। আমি বিলক্ষণ জানতেম, সূর্যের এত সৌভাগ্য আজও হয় নি যে, এত সহজে তার যুগযুগান্তরের আশা পূর্ণ হবে। আমার অভিপ্রায় এই ছিল যে, যদি বা স্ত্রীস্বাধীনতার সময় আমাদের দেশে এখনও না এসে থাকে তবে সেই সময় যত শীঘ্র আসে আমাদের তার চেষ্টা করা উচিত।[৯] প্রথমে আন্দোলন, তার পরে কাজ, তার পরে সিদ্ধি। সময় আসে নি বলে যদি মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে হয় তা হলে সময় কোনো কালে আসে না। পৃথিবীতে কোন্ দেশে এমন কোন্ বৃহৎ সমাজসংস্কার হয়েছে যা আন্দোলন না করেই হয়েছে? অত কথায় কাজ কী? আমাদের বাংলাদেশে অতি অল্প দিন পূর্বে যে ধর্মসংস্কারের আরম্ভ হয় ও আজ পর্যন্ত যার আন্দোলন চলছে সেই বিষয়ে উদাহরণ দিলেই আমার যুক্তি অতি সহজে বোধগম্য হবে।[১০] ভারতবাসীদের মন এখনও অজ্ঞতাকুসংস্কারাচ্ছন্ন আছে, নিরাকার ঈশ্বরের ভাব তারা বুঝতে পারবে না, সুতরাং এখনও সত্যধর্মপ্রতিষ্ঠার সময় হয় নি বলে যদি রামমোহন রায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতেন, যদি তখনকার বৃদ্ধ পৌত্তলিক সমাজের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম না করতেন— সময়ের অভাব— সময়ের শূন্য ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করবার চেষ্টা না করে তিনি যদি ভিক্ষুক ভাবে অঞ্জলি পেতে সময়ের মুখপ্রতীক্ষা করে বসে থাকতেন, তা হলে আজকের এই ব্যাপ্যমান ব্রাহ্মধর্ম কোথায় থাকত?[১১] আমাদের দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব লোকে এখনও

ভালো করে অনুভব করতে পারে নি, কিন্তু তাই বলে কি চুপ করে বসে থাকতে হবে? ব্যক্তিবিশেষের যদি অস্বাভাবিক কারণে ক্ষিদে আদবে না থাকে তা হলে তাকে খেতে দিয়ো না, কেননা, সে হজম করতে পারবে না; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাকে কবিরাজ দেখানো কর্তব্য, যাতে তার ক্ষিদে হয় এমন বটিকা সেবন করানো আবশ্যক। আমি তাই ভেবে-চিন্তে ভারতীতে সমাজের জন্যে এক রতি বটিকার ব্যবস্থা করেছিলুম; কিন্তু রোগ এমন বদ্ধমূল ও কবিরাজের সাধ্য-মত বটিকার মাত্রা এমন যৎসামান্য যে, তাতে উপকার হবার সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু আমাদের দেশের সকল কবিরাজ মিলে যদি এই রকম বটিকা সেবন আরম্ভ করান তা হলে অচিরাৎ রোগীর ক্ষুধার সঞ্চার হবে। লেখক-মহাশয় বলেন—' 'উঃ ইনি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন' এরূপ কেউ যদি মনে করেন, তবে তাঁহাদের জানা উচিত যে, এ স্বাধীনতা দেশেরও স্বাধীনতা নহে, আত্মারও স্বাধীনতা নহে, কেবল পরপুরুষগণের সহিত স্ত্রীলোকগণের আমোদপ্রমোদে মেলামেশা!' কথাগুলো এমন করে বসানো হয়েছে যে, শুনলে অনেক পাঠকের গা শিউরে উঠবে। 'পরপুরুষ'! 'আমোদপ্রমোদ' !! 'মেলামেশা' !!! কী সর্বনাশ! আমাদের ভাষায় 'পরপুরুষ' কথাটার সঙ্গে একটা দারুণ বিভীষিকা লিপ্ত আছে, লেখক-মহাশয় সেই সুবিধা পেয়ে কথাটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমি জানতে চাই, গরিব 'পরপুরুষ' কথাটি কী অপরাধ করেছে, যে, সে বেচারির ওপরে এত নিগ্রহ! পর বলেই কি তার এত দোষ?[১২] কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে মহাত্মা লোকদের 'বসুধৈব কুটুম্বকং'। 'আমোদ-প্রমোদ' ও 'মেলা-মেশা' কথা দুটো এমন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে তার মধ্যে থেকে একটা ঘোরতর রহস্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু আমি আশা করি,

আমাদের দেশের রুচি এখনও এমন বিকৃত হয়ে যায় নি, দেশীয় লোকের মন এমন পশুত্বে পরিণত হয় নি, তাঁদের দৃষ্টি এমন 'পিঙ্গল' হয়ে যায় নি ও তাঁদের 'কল্পনার দূরবীক্ষণ' এত দূর পর্যন্ত বিগড়ে যায় নি যে তাঁরা 'আমোদ-প্রমোদ' ও 'মেলা-মেশা' মাত্রেরই মধ্যে একটা হীন, একটা জঘন্য, একটা বীভৎস ভাব দেখতে পান।[১৩] অতএব যদি 'আমোদ-প্রমোদ' ও 'মেলা-মেশা' মাত্রেরই খারাপ অর্থ না থাকে ও 'পরপুরুষ' মাত্রেই যদি বাঘ ভাল্লুক বা চোর ডাকাত না হয় তা হলে 'পরপুরুষের' সঙ্গে 'আমোদ-প্রমোদ' 'মেলা-মেশায়' কী দোষ আছে? একজন অন্যায়রূপে কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেবার বিরুদ্ধে তুমি তো বলতে পারো যে, 'এ স্বাধীনতা আত্মারও স্বাধীনতা নহে, দেশেরও স্বাধীনতা নহে, কেবল স্বজাতিবর্গের সহিত এক ব্যক্তির আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা— এ কতদূর স্বাধীনতা নামের যোগ্য তাহাই সন্দেহস্থল!' আত্মার স্বাধীনতা ও দেশের স্বাধীনতা ব্যতীতও আরও অসংখ্য স্বাধীনতা আছে যা প্রার্থনীয়।[১৪] উপসংহারে সম্পাদক-মহাশয় বলেছেন যে, স্ত্রীগণকে অন্তঃপুরে রাখা পুরুষদের স্বার্থপরতার ফল নয়, সাংসারিক কাজ-কর্মের অনুরোধে তা স্বভাবতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রীস্বাধীনতা-বিরোধীদের এই এক অতি পুরোনো যুক্তি আছে; কিন্তু আমার বোধ হয় এটা আর কারও চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না যে, প্রাচীরবদ্ধ অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকালের জন্যে প্রবেশ করা ও সমস্ত পৃথিবীর থেকে আপনাকে রুদ্ধ করে রাখা স্বাভাবিক হওয়াই নিতান্ত অস্বাভাবিক।[১৫] যদি সত্যই স্বাভাবিক হত তা হলে য়ুরোপে কেন এ স্বভাবের নিয়মের পরিবর্তন হল? এখানে কি স্ত্রীলোকদের স্বামী নেই, না সন্তান হলেই তারা গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দিয়ে আসে? লেখক-মহাশয় বলেন 'কুলরমণীরা যে যে-সে পুরুষের সঙ্গে আমোদ

করিয়া বেড়ায় না, সে কেবল পতির শাসনভয়ে নহে, পতির প্রতি ভালোবাসাই তাহার কারণ।' ও হরি! আমি কি বলেছি যে কুলরমণীরা 'যে-সে' পুরুষের সঙ্গে কেবল 'আমোদই' করে বেড়াবে? রেখাগুলিকে ঈষৎ বেঁকিয়ে-চুরিয়ে বাড়িয়ে-কমিয়ে একটি সুশ্রী ছবিকেও কদর্য করা যায়, শিবকেও বাঁদর গড়ে তোলা যায়। কোনো পাঠক-মহাশয় কি আমার লেখা থেকে মনে করেছেন যে আমাদের কুলরমণীরা পথে ঘাটে যাকে তাকে দেখবে তারই সঙ্গে আমোদ করে বেড়াবে?[১৬] অত কথায় কাজ কী, কোন্ দেশের পুরুষেরাই 'যে-সে' পুরুষের সঙ্গে 'আমোদ' করে বেড়ায়? আমরা তো অনেক লোকের সঙ্গে মিলে থাকি, আমরা কি কেবলমাত্র আমোদ করবার জন্যেই মিলি? আমরা কাজ-কর্মের জন্যে মিলি, ভদ্রতার খাতিরে মিলি, বন্ধুভাবে মিলি, সাহায্য করতে মিলি, সাহায্য গ্রহণ করতে মিলি এবং মেলবার আরও অসংখ্য উপলক্ষ আছে। পৃথিবীতে শত সহস্র মানুষ আছে ও মানুষ সামাজিক জীব, সুতরাং মানুষে মানুষে পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হওয়াই স্বাভাবিক। নিতান্ত চোকে ঠুলি দিয়ে না বেড়ালে বা অন্তঃপুরের সিন্ধুকে চাবি-বন্ধ না থাকলে এ রকম দেখাসাক্ষাৎ নিবারণের আর তো কোনো উপায় নেই। তা ছাড়া অন্য লোকের সঙ্গে মেশা কি স্বামীর প্রতি অপ্রীতির চিহ্ন? আমি তো তার একটা অর্থ খুঁজে পাই নে।[১৭] তোমার একটি নিতান্ত অন্তরঙ্গ প্রাণের বন্ধু আছে,কিন্তু তাই বলে কি তুমি ঘোমটা টেনে বসে থাকবে,[১৮] ও পরপুরুষের (অর্থাৎ বন্ধু ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের) মুখ দেখবে না বা তাদের সঙ্গে কথা কবে না?[১৯] তাদের মুখ দেখলে বা তাদের সঙ্গে কথা কইলে কি তোমার বন্ধুর ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়া হল না? এমন বন্ধুর সঙ্গে আমি তো কোনো কারবার রাখি নে।[২০]

যা হোক— 'এই-সকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ বিষয়ের তত্ত্ব' এই বাঙালিকে শিক্ষা দেবার জন্যে লেখক-মহাশয় একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করবার পরিশ্রম স্বীকার না করে যদি তাঁর অবসর-মত এই ভারতীতে এ বিষয়ে মাঝে মাঝে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, তা হলে এই য়ুরোপ-প্রবাসী বঙ্গযুবক গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ তাঁর নোটানলের ইন্ধনযোগ্য আরও কতকগুলো সৃষ্টিছাড়া সমাজ-সংস্কারক মত পাঠিয়ে দেবে।

১ যথার্থ যদি এরূপ হইয়া থাকে তবে সে কথাগুলা লেখকের উচিত ছিল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া। ভা. স.

২ কেন যে আবশ্যক ছিল না তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। লেখক আমাদের নিরীহ দেশটির প্রতি স্বচ্ছন্দে ধিক্কারের খরশাণ কৃপাণ এবং উপহাসের তীক্ষ্ণ বাণ অনর্গল চালাইতে পারেন, আর-এক ব্যক্তি ঢাল দিয়া তাহা আটকাইতে গেলে সে তাহা পারিবে না— কেননা লেখকের মতে তাহা অনাবশ্যক। এমন-কি হইতে নাই যে, লেখক এক পক্ষে বেশি ঝোঁক দেওয়াতে তাঁহার চক্ষে তিনিই দেখিতেছেন যে, তাঁহার বিরোধী পক্ষের কথাগুলি উত্থাপনেরই যোগ্য নহে? ভা. স.

৩ লেখক কী ভাবে কী কথা বলিতেছেন তাহার প্রতি তত আমাদের লক্ষ নহে যত— পাঠকেরা তাঁহার কথা কী ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহার প্রতি। আজিকার কালের কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রেরই লক্ষ দেশীয় কুসংস্কারের উপর— যিনি একটু কলম ধরিতে জানেন তিনি সর্বাগ্রে তাহার উপরেই আপনার গোলোন্দাজির পরীক্ষা করিতে যান, কিন্তু তাহার বন্দুকের গুলি-গুলো লাগে কোথায়? না, দেশীয় রীতি নীতি প্রথা যত-কিছু আছে সকলেরই গাত্রে— তা সে সু-ই হউক আর কু-ই হউক তার আর বাক্‌বিচার নাই। আমাদের দেশের ভালো রীতি ভালো প্রথা ইংরাজি রীতি-নীতি-প্রথার সহিত না মিলিলেই আজকের কালের কৃতবিদ্য লোকেরা সমস্তগুলিকেই কুসংস্কারের

কোটায় ফেলিয়া দেন— সেইগুলিকে বাঁচানোই আমাদের লক্ষ্য। পাছে লোকের মনে এই একটি কুসংস্কার জন্মে যে, বিবিদিগের চাল-চোল ধরণ-ধারণের নামই স্ত্রীস্বাধীনতা, আর আমাদের কুলস্ত্রীদিগের চাল-চোল ধরণ-ধারণের নামই হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি, অধুনা কেবল তাহারই প্রতিবাদ করা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ভা. স.

৪ অবশ্য কোনো অভিধানে স্ত্রীস্বাধীনতার ওরূপ অর্থ পাওয়া যায় না, কিন্তু কাজে কী দেখা যায়? লেখক যদি বিলাতি বিবিদিগকে আদর্শ না করিয়া বিশুদ্ধরূপে স্ত্রীস্বাধীনতা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে স্ত্রীস্বাধীনতার অতগুলি পার্ষ্ণিরক্ষক (body-guard) আবশ্যক হইত না; কিন্তু লেখক বিলাতি বিবিদিগের চাল-চোল ধরণ-ধারণের আনুষঙ্গিক রূপে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, এজন্য বিলাতানভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকের মনে সহসা এইরূপ একটা কুসংস্কার জন্মিতে পারে যে কার্যতঃ স্ত্রীস্বাধীনতা আর-কিছুই নহে— কেবল বিবিদিগের চাল-চোল ধরণ-ধারণ ইত্যাদি। ইহা একটি লোকবিখ্যাত বিষয় যে, বিবিদিগের shoppingএর জ্বালায়, নির্দোষ (?) আমোদাসক্তির জ্বালায়, তাহাদের স্বামীরা ধনে প্রাণে মারা যায়; অথচ স্ত্রীস্বাধীনতার একটু কোথাও পাছে আঁচড় লাগে এই ভয়ে তাঁহারা সকল অত্যাচার ঘাড় পাতিয়া লন, সকল বিষ হজম করিয়া ফেলেন। ইউরোপ ভিন্ন আর কোথাও যে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই এমন নহে— জাপানে আছে, বোম্বাইয়ে আছে, কিন্তু সে-সকল নিয়ে আলোচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে, সর্বদেশসম্মত স্ত্রীস্বাধীনতার বিশুদ্ধ আদর্শ নিয়ে আলোচনা করাও লেখকের উদ্দেশ্য নহে, ইংলন্ডে যেরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত তাই যা কেবল লেখকের একমাত্র আলোচ্য বিষয়; এরূপ যখন— তখন ইংলন্ডের প্রচলিত স্ত্রীস্বাধীনতা যে কী ভয়ানক বস্তু, তাহা যে শত সহস্র স্থানে নামে স্বাধীনতা কাজে স্বৈরচারিতা— তাহা যে ঔদ্ধত্য, প্রগল্‌ভতা, গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা, দেহ-পীড়ন-বেশ-বাহুল্য এরূপ কত শত দোষে দূষিত, *Saturday Review* প্রভৃতি কাগজে যাহার চীৎকার কাঁদুনি মধ্যে-মধ্যে ভুক্তভোগী জনের বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িতে শুনা গিয়া থাকে, লেখক সে-সকল

কথার একটুও উল্লেখ না করাতে দেশীয় লোকের চক্ষে একরূপ ধূলি দেওয়া হইয়াছে— প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, বিবিদিগের অনুকরণ করিলেই আমাদের কুলরমণীরা নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতাপথে বিচরণ করিতে পারিবেন। আমরা সেই ধূলি অপনয়ন করিবার জন্যই বলিতেছি যে, যখন স্বাধীনতার সঙ্গে শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, নীচের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য, অপ্রগল্‌ভতা, ঔদ্ধত্যবিহীনতা ইত্যাদি গুণসমূহ থাকিবে তখনই জানিবে যে তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা— ইংলন্ডীয় স্ত্রীস্বাধীনতা তাহা হইতে বহুদূরে স্থিতি করে। বোম্বাই দেশে যেমন স্ত্রীস্বাধীনতা আছে সেরূপ তীব্রতা-বিহীন নির্বিষ স্ত্রীস্বাধীনতা যদি লেখকের অভিপ্রেত হইত তবে তাহার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক তাহা আমরা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিতাম। যে স্ত্রীস্বাধীনতার নামের দোহাই দিয়া শত সহস্র স্বেচ্ছাচারিতা নিত্য নিত্য পার পাইয়া যাইতেছে সে স্ত্রীস্বাধীনতার নাম শুনিলেই আমাদের আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠে। ভা. স.

৫ অর্থাৎ, আমাদের আপনার দেশের রাজ্যশাসন-প্রণালী স্বদেশীয় লোকের আয়ত্তাধীন নহে। তাহা যদি আমাদের আপনাদের আয়ত্তাধীন হয়, তাহা হইলে আমরা রাজনীতিবিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই। শূন্যগর্ভ উপাধির টানে পড়িয়া আমাদের দেশের লোক স্বাভিপ্রেত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয় ও যেরূপ শিক্ষা তাহাদিগকে জোর করিয়া গিলাইয়া দেওয়া হয় তাহাই তাহারা কণ্ঠস্থ করে। শিক্ষাদান যদি আমাদের আপনাদের অভিপ্রায়-মাফিক হয় তবেই আমরা শিক্ষাবিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই।

কোট হ্যাট পরিলে কালোয় কালোয় মিশিয়া বাঙালিকে ভূতের মতো দেখিতে হয়, তবু তাহা ভালো— কেন? না, যেহেতু তাহা ইংরাজ-পছন্দ! রুচিরও কখনও কখনও দাসত্বশৃঙ্খল পরিতে সাধ যায়। রুচি যদি আমাদের আপনাদের আদর্শ-মাফিক হয়, অন্যের ধামা-ধরা না হয়, তবেই আমরা রুচি-বিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই। ভা. স.

৬ বটেই তো; ইংরাজদের অধীনে বাস করছি বলেই তো আমরা আমাদের স্ত্রীদিগকে তাহাদের সমক্ষে বাহির করিতে সংকুচিত হই। আমাদের

দুই দিকেই সংকট ; যদি আমরা ইংরাজদিগকে জেতৃজাতীয় লোক মনে করিয়া তাহাদের নিকটে কুঁকড়িয়া-সুঁকড়িয়া থাকি তবে তাহারা আমাদের অতি অপদার্থ জ্ঞান করিবে ও আমাদের স্ত্রীগণকে আয়াদিগের হইতে এক ধাপ নয় উঁচু মনে করুক— কিন্তু ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ সম্মানচক্ষে দেখিতে হয় তাহা তাহারা কখনোই করিবে না ; ক্রমাগতই শুনা যায় যে, বাঙালির স্ত্রীস্বাধীনতা রেল-গাড়িতে ইংরাজের পুরুষস্বাধীনতার হস্তে যার পর নাই অপমানিত হইয়া থাকে। এই এক দিক, আর-এক দিক এই যে, যদি আমরা ইংরাজদিগের সহিত সমকক্ষভাব ধারণ করিতে যাই তবে প্রথম-প্রথম হয়তো তাহারা মুখে একটু আপ্যায়িত করিবে এই পর্যন্ত, ভিতরে ভিতরে যে আমাদের স্পর্ধা-নিবারণের উপায় চিন্তা করিবে ইহাতে আর কিছুমাত্র ভুল নাই। ইংরাজেরা কত বাঙালিকে খুন করিয়া স্বচ্ছন্দে পার পাইয়া যাইতেছে আর একজন স্ত্রীলোকের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে ভয় পাইবে— ইহার কি কোনো অর্থ আছে? যদি পরিশেষে বাঙালি বিচারকর্তার হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত তবেই যা তাহাদের ভয়ের কারণ হইত— কিন্তু আমাদের দেশীয় বিচারালয়ের বিচার যেরূপ ইংরাজ-ঘেঁষা, তাহাতে আমাদের দেশের যেমন না কেন রাজরানী হউন-না, একজন সামান্য ইংরাজ তাঁহার যথেষ্ট অপমান করিলেও আদালতের সূক্ষ্ম বিচারে দাঁড়াইবে যে, বরং বাদিনীর দোষ, কেন সে প্রতিবাদীকে রাগাইয়া দিল— প্রতিবাদীর কোনো দোষ নাই। আবার, আমাদের দেশের এমন কতকগুলি ভাব আছে যাহা বিদেশীয় বিচারকের আমলেই আসিতে পারে না ; আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকের গায়ে সামান্য একটু অপমানের আঁচ লাগিলে তাহা যে কত অধিক বলিয়া বোধ হয় তাহা বিদেশীয় সর্বসহনক্ষম কঠোর মনে এক মুহূর্তও স্থান পাইতে পারে না। আমাদের দেশীয় লোকেরা আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ সম্মানচক্ষে দেখে ইংরেজেরা কখনোই সেরূপ দেখে না, ইহারও আবার প্রমাণ দিতে হইবে না কি? এই সেদিন একজন ইংরাজ বিচারকর্তা প্যায়দাকে দিয়া একজন দেশীয় স্ত্রীলোকের ঘোমটা খোলাইলেন— এ কী বলো দেখি! একজন বাঙালি বিচারকর্তা যদি ইউরোপীয় কোনো স্ত্রীলোকের

প্রতি ওরূপ ব্যবহার করিত, তবে কাণ্ডটা কী হইত বলো দেখি। এই সব বিচারকর্তার হস্তে যখন আমাদের ধন প্রাণ মান নির্ভর করিতেছে তখন স্ত্রীস্বাধীনতাতে কি আর রুচি হয়? বরং একজন কেরানির পক্ষে বহুমূল্য ইংরাজি আসবাব কেনা শোভা পায়, কেননা তাহাতে সে কেবল ধনে এবং পরিশেষে প্রাণে মারা যায় মাত্র; কিন্তু একজন রাজরানীর পক্ষেও স্ত্রীস্বাধীনতা শোভা পায় না, কেননা অমূল্য কুলমানের বিনিময় ভিন্ন আমাদের দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা কিনিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে— জেতৃজাতি জিতজাতির কুলমানের মূল্য অতি যৎসামান্য মনে করে; আমাদের ভদ্রলোকের স্ত্রীদিগকে আয়াদেরই সামিল মনে করে— তা চেয়ে নিচু বৈ উঁচু মনে করে না। কোনো বাঙালি ভদ্রঘরের স্ত্রী দুর্ভাগ্যবশতঃ কতিপয় সভ্য ইংরাজমণ্ডলীর সঙ্গে এক টেবিলে খানা খাইতে বসিয়াছিল, সেই সভ্য-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ বলা কহা করিতে লাগিলেন যে, 'শেষকালে মেৎরানির সঙ্গে আমাদের এক টেবিলে খানা খাইতে হইল!' বিদেশীয় রাজ্যে বাস করাতেই আমাদের ভাগ্যে সময়ে সময়ে ঐরূপ ঘটে; ম্যাঞ্চেস্টরের একজন তাঁতির ছেলে যেখানে আমাদের দেশের ভদ্রবংশীয় কায়স্থকন্যাকে মেৎরানি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, সেখানে ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকদিগকে কত সাবধানে আগলিয়া রাখা কর্তব্য তাহা কি আর বলিবার কহিবার বিষয়? ঠিক বিপরীত-পৃষ্ঠ দেখিতে চাও তো বলি শুন— আমাদের জ্ঞাতসারে একবার কোনো নৌকাযাত্রী-ভদ্রলোকের নৌকার তলা ফুটা হইয়া যাওয়াতে তিনি স্ত্রী-পুত্র-সমভিব্যাহারে তাড়াতাড়ি ডাঙায় উঠিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ডাঙায় কতকগুলি কুঁড়েঘর ও চাল-ডালের দোকান ছিল; তথাকার সকল লোকে মিলিয়া অতি যত্ন-পূর্বক স্ত্রীলোকটির সম্মান রক্ষার জন্য একটি কুঁড়ে ঘরের চার দিকে ঘের-ঘার দিয়া দিব্য একটি নিভৃত স্থান নির্দেশ করিয়া দিল এবং আবশ্যক যত-কিছু সকলেরই সহায়তা করিল, পারিতোষিকের কথা একবার মুখেও আনিল না; যে ব্যক্তি ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিল সে ঘরভাড়া-স্বরূপ যাহা পাইল তাহাতেই সন্তুষ্ট। দেখো আমাদের দেশের চাষাভুষা ইতর লোকেরাও কুলস্ত্রীকে কিরূপ সম্মানচক্ষে দেখে; ইহা ইউরোপ দেশের অতি ভক্তিপূর্ণ

গ্যালান্‌ট্রি নহে, ইহা আর এক বস্তু— কী? না, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ পবিত্র ভাবে দেখা। স্ত্রীলোকদিগকে মাতৃসম্বোধনে সম্মান করিবার প্রথা আমাদের দেশের যেটি আছে তাহার সহিত এবং ইউরোপ-দেশীয় gallantryর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দুয়ের মধ্যে স্বর্গ-নরক-প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। দেশীয় কুলরমণীর যে-একটি পবিত্র মর্যাদা তাহা কি gallantry-পরায়ণ ব্যক্তিরা জানে? না, তাহাদিগকে তাহা বলিয়া বুঝানো যাইতে পারে? কিন্তু গ্যালান্‌ট্রি যে কী বস্তু তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝি— তাহার বশবর্তী হইয়া একটি সুন্দরী মিস তাহার গুরুজনকে পশ্চাতে ফেলিয়া আপনি স্বচ্ছন্দে হট্‌ হট্‌ করিয়া প্রধান আসন গ্রহণ করেন— আমাদের দেশে এই-সকল চাল-চোল শিক্ষা হইলেই সর্বনাশ! ইংরাজেরা যখন জেতৃজাতি এবং তাহারা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের কুলমর্যাদার কোনো তক্কাই রাখে না তখন আমাদের কী-এত দায় পড়িয়াছে যে তাহাদের সমক্ষে আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে বাহির না করিলেই নয়! ভা. স.

৭ পুরুষের অপমানিত হওয়া এবং স্ত্রীলোকের অপমানিত হওয়া যদি একই কথা হইত তাহা হইলে লেখক ঠিকই বলিতেছেন যে, স্ত্রীজাতিকে যেরূপ সাবধানে রক্ষা করা হয় পুরুষজাতিকে সেরূপ রক্ষা করা হয় না কেন? কিন্তু বিলাতি গ্যালান্‌ট্রি-শাস্ত্রেও তো আছে যে স্ত্রীর গায়ে আঘাত লাগিলে যত লাগে পুরুষের গায়ে আঘাত লাগিলে উহার তুলনায় তাহা কিছুই নহে। ভা. স.

৮ আমাদের দেশে পূর্বকালে অতি এক নির্বিষ নিষ্কণ্টক স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত ছিল ইহা কাহারও অবিদিত নাই। বোম্বাই প্রদেশে এখনও তাহার কতকটা আভাস দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে স্বদেশীয় স্ত্রীস্বাধীনতা স্বদেশীয় রাজ্যশাসনপ্রণালীর আয়ত্তাধীনেই সুন্দর শোভায় পরিস্ফুট হইতে পারে। যেমন মুসলমানদিগের বাহুবল তেমনি ইংরাজদিগের বাহুবলতিরস্করিণী মন্ত্রবিদ্যা সর্বাঙ্গসুন্দর দিশি স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী। ভা. স.

৯ 'যত শীঘ্র আসে' এ চেষ্টা অপেক্ষা যত শোভনভাবে নির্বিষভাবে নিরুপদ্রবভাবে আসে, এই চেষ্টা অধিক প্রার্থনীয়। যদি বলো যে শেষোক্ত

চেষ্টা বৃথা হইবে, তবে আর-একজন বলিবে পূর্বোক্ত চেষ্টাও বৃথা হইবে ; প্রকৃত কথা এই যে দুই চেষ্টারই ফলের আশা এত অল্প যে, আমাদের ভাগ্যে উভয়ই এক প্রকার দুরাশা ; কিন্তু যদি 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ' এই ভাবিয়া কোমর বাঁধিয়া চেষ্টা করিতে হয় তবে শেষোক্ত প্রকারের চেষ্টাই সর্বতোভাবেই শ্রেয়। ভা স.

১০ আন্দোলন যাহাতে রীতিমত হয় অর্থাৎ এক-দিক-ঘেঁষা না হয় এই জন্যই বর্তমান প্রস্তাবটির পদে পদে টিপ্পনী-সংযোগের এত আয়াস পাওয়া যাইতেছে। ভা. স.

১১ রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দেওয়া হোক— তিনি যেরূপ দেশীয় আকারে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াছেন, স্ত্রীস্বাধীনতা সে ভাবে প্রচারিত হইলে আমরা তো বাঁচিয়া যাই— কিন্তু এ তো তা নয়— এ হচ্ছে বিবিদের গৌনের আঁচল ধরিয়া চলা, আয়া-গিরি করা। বোম্বাই দেশেও তো স্ত্রীস্বাধীনতা আছে— স্বাধীন যুক্তি ও রুচি -সহকারে স্ত্রীস্বাধীনতার ভালো একটা আদর্শ দাঁড় করাও, তাহা আমরা মাথায় করিয়া লইব ; কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার নামের খাতিরে তাহার একটা অন্তঃসারশূন্য চিকন-চাকন আদর্শকে 'এই উচ্ছিষ্টই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট' বলিয়া গলাধঃকরণ করিতে পারি না।

ভা. স.

১২ একজন পর-মানুষ কিছু দোষ করে নাই বলিয়া তাহার সহিত আত্মীয়স্বজনের মতো ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাকে ঘরের স্ত্রীলোকদিগের সহিত মেলা-মেশা করিতে দিতে হইবে, ইহা কোন্ ইংরাজি আইনে পাওয়া যায়? ভা. স.

১৩ লেখকের মত এই যে, যেমন পুরুষে পুরুষে আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা নিষ্কণ্টকে চলিতে পারে, পরপুরুষে পরস্ত্রীতেও তাহা তেমনিই নিষ্কণ্টকে চলিতে পারে। কিন্তু, কাজে কী দেখা যায়? দুইজন পুরুষমানুষের মধ্যে যতই কেন বন্ধুতা ও ঘনিষ্ঠতার মাত্রা বাড়ুক-না তাহাতে বিশেষ কাহারও কিছু আইসে যায় না ; কিন্তু পরস্ত্রী এবং পরপুরুষের মধ্যে নির্দোষ বন্ধুতার মাত্রা বাড়িলে অনেকেরই তাহা শঙ্কার বিষয় হয় কেন? ইংরাজ-সমাজের বিধানানুসারে

পরপুরুষদের সঙ্গে পরস্ত্রীদের হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে পর্যন্ত কোনো দোষ নাই, কিন্তু আমাদের চক্ষে ওটা কিছু আমোদ-প্রমোদ মেলা-মেশার আতিশয্য বলিয়াই ঠেকে। আমাদের দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল না এমন নহে এবং এখনও তাহা কোথাও কোথাও আছে, কিন্তু তথাপি স্ত্রীলোকেরা আমাদের এমনি সম্মানের পাত্রী যে পর-কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে ইহা আমরা দেখিতে পারি না। সখ্য এবং দাম্পত্য দুয়ের মধ্যে কেবল একটা বালির বাঁধ সংস্থাপন করিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন তাঁহারাই বলিতে পারেন — এতে দোষ কী, তাতে দোষ কী। কিন্তু যাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতা চান অথচ সখ্য ও দাম্পত্য দুইকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিতে চান, তাঁহারা ঐ স্থানে প্রস্তরের বাঁধ ভিন্ন আর-কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। লেখক যে বলিবেন— সু-চক্ষে দেখিলে সকলই সু, কু-চক্ষে দেখিলে সকলই কু, তাহার জো নাই; সহস্র বন্ধুনী হউন-না কেন, তাঁহার বাড়িতে যদি পুরুষ-মানুষ কেহ না থাকে তবে ইংরাজি শাস্ত্রে তাঁহার ঘরে গিয়া তাঁহার সহিত সখ্যালাপ করা অবিধি হইল কেন? সু-চক্ষে দেখিলে তাহাতে তো কোনো দোষ নাই। ভা. স.

১৪ আত্মার স্বাধীনতা সকল অবস্থাতেই নির্দোষ, কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা যে অংশে বুঝায় 'পরপুরুষগণের সহিত একত্রে আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা' সে অংশে তাহা নির্দোষ হইতেও পারে না হইতেও পারে; কে বলিতে পারে যে তাহা নির্দোষ ভিন্ন আর-কিছুই হইতে পারে না? সুতরাং আমরা এখনও বলিতেছি যে, পরপুরুষদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা আত্মার স্বাধীনতার ন্যায় দোষাশঙ্কার সীমা-বহির্ভূত এমন কোনো বস্তু নহে যে, তাহা স্ত্রীলোকের অবশ্যকর্তব্য কর্মের মধ্যে গণ্য হইবে; উহা অপেক্ষা বরং আপনাদিগকে মিথ্যা-অপবাদ নিন্দা-গ্লানি প্রভৃতি হইতে রক্ষা করা স্ত্রীলোকদিগের বেশি কর্তব্য কর্ম। স্ত্রীস্বাধীনতা প্রার্থনীয় নহে— ইহা আমরা কোনো কালে বলিও নাই বলিবও না, কিন্তু যে প্রকার স্ত্রীস্বাধীনতা হইতে সুফল অপেক্ষা কুফলেরই অধিক সম্ভাবনা সে স্ত্রীস্বাধীনতা থাকা অপেক্ষা না থাকা-ই অধিক প্রার্থনীয়। যে দেশে বুদ্ধিমান লোকের নিকট বিবাহ বিভীষিকা-বিশেষ সে দেশের স্ত্রীস্বাধীনতার অনুকরণ করিবার জন্য

হিন্দুসমাজের কী যে দায় পড়িয়াছে তাহা তো বুঝা যায় না। বোম্বাই দেশে কি স্ত্রীস্বাধীনতা নাই? মহারাষ্ট্রীয় দেশে কি স্ত্রীস্বাধীনতা নাই? সে-সব অগ্রাহ্য করিয়া ভয়ানক উৎপেতে য়ুরোপীয় স্ত্রীস্বাধীনতাকে আদর্শ করিয়া চলিতে আমাদের যে এত ব্যগ্রতা তাহার অর্থ আর কিছুই নয়, খালি— বিধাতার বিড়ম্বনা। তাহার অর্থ, অর্থের অপব্যয়, সময়ের অপব্যয়, শরীরের কষ্ট, মনের কষ্ট আর মেম-সাহেবি একটা তমো— এই যা-কিছু। ভা. স.

১৫ স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের সহিত এখানকার সম্পর্কই নাই— এখনকার যা-কিছু বিচার তা কেবল সুবিধা অসুবিধা নিয়ে। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থাতে স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুরবাস-প্রথা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ বলিয়াই তাহা প্রার্থনীয়। যদি চতুর্দিকে মানহানির ভয় সত্যসত্যই বিদ্যমান না থাকিত তাহা হইলে অন্তঃপুরকে কারাগারের সহিত তুলনা করিলে দোষের হইত না; কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, অন্তঃপুর কুলস্ত্রীদিগের কঠোর কারাগার নহে— তাহা তাহাদের নিরাপদ-দুর্গ, অভয়নিকেতন। আগে যথার্থ ধর্ম -প্রচার-দ্বারা চারি দিকের জঞ্জাল পরিষ্কার করো, তাহার পরে অন্তঃপুরপ্রথা অল্পে অল্পে পরিবর্তন করো— তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অমত নাই। কিন্তু তাও বলি অন্তঃপুরপ্রথা একেবারেই উচ্ছেদ করা কখনোই হইতে পারেও না, পারিবেও না; এমন-কি ইউরোপেও অন্তঃপুরপ্রথা একেবারে যে নাই তাহা বোধ হয় না। ও দেশে যদি পুরুষদিগের মেলা-মেশা করিবার স্বতন্ত্র স্থান ও স্ত্রীলোকদের মেলা-মেশা করিবার স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট না থাকে তবে সে অভাব যত শীঘ্র পূরণ হয় ততই ভালো। boudoir বোধ হয় কতকটা আমাদের অবরোধের কাছাকাছি যায়। যাহা হউক— আমাদের দেশের অন্তঃপুরপ্রথা পরিবর্তন করিবার যদি আবশ্যক হয় তবে আমাদের আপনাদের রকমে তাহা করা উচিত। 'আপনাদের রকমে' কাহাকে বলে তাহার একটা দৃষ্টান্ত— আমাদের দেশের অতিথিসেবা যেমন স্ত্রীলোক-দিগের দ্বারা যত্নের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাকে আদর্শ করিয়া আমাদের অন্তঃপুরপ্রথা পরিবর্তন করা যাইতে পারে, এমন-কি অন্তঃপুরের

গৃহিণী কোনো অভ্যাগত ব্যক্তির অতিথিসৎকার করিলে তাহা আমাদের দেশাচারের চক্ষে ভালো বৈ মন্দ দেখিতে হয় না। বোম্বাই প্রদেশে এইরূপ প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ভা. স.

১৬ যে-সে লোকের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়ানো, সর্বদাই হউক আর কদিচ কখনোই হউক, তাহা কুলস্ত্রীকে শোভা পায় না— যে-সে লোক বলিলে শুদ্ধ যে কেবল দুষ্ট লোকই বুঝায়, শুদ্ধ যে কেবল অভদ্র লোকই বুঝায়, শুদ্ধ যে কেবল পথের লোকই বুঝায় তাহা নহে। শান্তশিষ্ট লোক বলো, ভদ্র লোক বলো, পরিচিত লোক বলো, অবস্থা-বিশেষে সকলেই যে-সে লোকের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। লোকটি ভদ্রবংশীয়, লেখাপড়া জানে, কথাবার্তা বেশ, ভদ্র আচার ব্যবহার, আমার পরিচিত এই পর্যন্ত— কিন্তু আমি তাহার ধর্মাধর্ম এবং চরিত্রের জন্য দায়ী নহি— এমন যে ব্যক্তি ইনিও এক হিসাবে যে-সে লোকের মধ্যে ধর্তব্য। কোন্ হিসাবে? না, যখন তাঁহাকে অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের সহিত আলাপ করাইয়া দিবার কথা। যাহার সহিত সবে নূতন আলাপ হইয়াছে তাহার সহিত হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে স্ত্রীজনের যদি কোনো বাধা না থাকে তবে যে-সে লোকের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়াইতে যে কিসের বাধা, তাহা বুঝা যায় না— সকল সময়েই তো কিছু আর আমোদ-প্রমোদ দোষে কলঙ্কিত হয় না। ভা স.

১৭ কুলস্ত্রীরা যে পরপুরুষদিগের সহিত বেশি মেলা-মেশা ও আমোদ-প্রমোদ করে না তাহার কারণ অনেকগুলি। যথা—

১ পাছে কুলোকে কু ভাবে, যাহাকে খুব ভালো বলিয়া জানা আছে তাঁহারও অন্তঃকরণ কু হইবার আটক নাই।

২ পাছে সুলোকে কু ভাবে, ইহাতেও আটক নাই। পরস্ত্রী পরপুরুষে মেলা-মেশা কতটুকু পর্যন্ত শোভা পায় তাহার একটা মাত্রা রাজনিয়ম-দ্বারা আজি পর্যন্তও নির্ধারিত হয় নাই। আমি যাহা দেখিয়া বলিব 'ইহাতে দোষ নাই' আর-একজন বলিবে 'এতটা ভালো নয়'। সেক্‌স্‌পিয়রের উইণ্টর্‌স্ টেলের হর্‌মিওনী বেচারির ও তাঁহার স্বামীর দুর্দশা বিবিসাহেবদিগকে বিলক্ষণই ভোগ করিতে হয়, কিন্তু কী করিবেন? দুর্জয় দেশাচার— সুতরাং নাচার!

৩ পাছে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়। স্বামীর মনে হয়তো এইরূপ একটা মাত্রা নির্ধারিত আছে যে, পরপুরুষদের সহিত স্ত্রীলোকের এইটুকু পর্যন্ত মেলা-মেশাই ভালো, তাহা অপেক্ষা বেশি ঘনিষ্ঠতা ভালো না। যে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে সে স্ত্রী সেই মাত্রাটি অতিক্রম করিয়া স্বামীর মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হইবে না তো আর কে হইবে? সে মাত্রা কতটুকু স্বামীই তাহা জানে, স্ত্রী তাহা জানে না, সুতরাং যদি স্বামীর মনঃপীড়া জন্মানো স্ত্রীর প্রার্থনীয় না হয় তবে শেষোক্তের উচিত পরপুরুষদের সহিত আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা না করা— যে স্ত্রী স্বামীকে অধিক ভালোবাসে তাহার তাহাতে প্রবৃত্তিই হয় না। সেক্‌স্‌পিয়রের উইণ্টর্‌স্‌ টেলে লিয়ন্টীসের স্ত্রী হর্‌মিওনী যখন লিয়ণ্টসের একজন বন্ধুর সহিত সেক্‌হ্যান্‌ড্‌ করিতেছেন তখন লিয়ন্টীস আপন মনে বলিতেছেন—

Too hot, too hot !
To mingle friendship far is mingling bloods.
I have *tremor cordis* [হৃৎকম্প] on me ; my heart dances,
But not for joy, not joy. This entertainment
May a free face put on ; derive a liberty
From heartiness, from bounty, fertile bosom,
And well become the agent. 'T may, I grant ;
But to be paddling palms and pinching fingers,
As now they are, and making practis'd smiles
As in a looking-glass ; and then to sigh, as 'twere
The mort o' th' deer. [হরিণের মরণকালীন দীর্ঘনিশ্বাস]
O, that is entertainment
My bosom likes not, nor my brows !

এই তো গেল সেক্‌স্‌পিয়র— আমাদের কোনো সুবিচক্ষণ সাহেব-বন্ধুর মুখে আমরা স্বকর্ণে এইরূপ শুনিয়াছি— 'কী! আমার স্ত্রীর গাত্র অন্য লোকে স্পর্শ করিবে, আমি অন্য লোকের স্ত্রীর গাত্র স্পর্শ করিব— ছি!'

৪ স্বামী মনে করিতে পারে যে, আমি আমার স্ত্রীর চরিত্র যেরূপ জানি তাহাতে সে পরপুরুষদের সহিত সহস্র মেলা-মেশা করিলেও কোনো দোষের

সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সেরূপ করিলে অমুক অমুক ব্যক্তিরা কু মনে করিতে পারে— মিছামিছি একটা কলঙ্ক কুড়াইয়া প্রয়োজন কী? এরূপ যখন হইতেও পারে, হইয়াও থাকে, তখন পরপুরুষদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিবার কী এমন মূল্য যে, তাহার জন্য স্ত্রী স্বামীর মনে এক মুহূর্তেও ঐরূপ দুর্ভাবনা উদ্দীপন করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিবে! ভা স.

১৮ অত্যুক্তি। অন্তরঙ্গ লোকের নিকট কে ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকে? ঘোমটা যা দেওয়া থাকে তাই থাকে, টানিয়া বেড়াইবার প্রয়োজনাভাবে শুধু-শুধু কেন তাহা করিবে? অন্তরঙ্গ— প্রাণের কেন, মুখের বন্ধুর সঙ্গেও সকল স্ত্রীলোকেরই তো সহজভাবে কথাবার্তা চলিয়া থাকে। তবে যদি বলো যে ঘোমটা দেওয়াটাই অন্যায়, তবে সে কোনো কাজের কথা নহে। কেননা, তাহা ন্যায়ও নহে অন্যায়ও নহে, তাহা দেশাচার মাত্র। তাহা দেখিতেও ভালো বৈ মন্দ নহে। যদি ঘোমটা না দেওয়া প্রথা থাকিত তাহা হইলে কালিদাসের এই সুন্দর কবিতাটি আমরা দেখিতে পাইতাম না— কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা! অতিপরিস্ফুট লাবণ্যের তীব্রতাও নহে, অপরিস্ফুট লাবণ্যের মন্দতাও নহে, কিন্তু উভয়ের মাঝামাঝি অনতিপরিস্ফুট লাবণ্যের যে-একটি মাধুর্য তাহা কেবল অবগুণ্ঠন-দ্বারাই রক্ষিত হইতে পারে। ভা. স.

১৯ মুখ দেখিতেও দোষ নাই, কথা কহিতে দোষ নাই, আলাপ করিতেই দোষ— সুতরাং এটাও অত্যুক্তি। ভা. স.

২০ আমার বন্ধুর সহিত আমি কোনো কারবার রাখিব না, এমন-কি তাহার মুখ দর্শন করিব না— অপরাধ? না, তিনি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দেন নাই। একটা ব্যাঘ্রের মুখ হইতে আমিষ কাড়িয়া লইলে তাহারই বটে ঐরূপ ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। কিন্তু লেখকের অতবড়ো রাগের তেমন তো কোনো গুরুতর কারণ দেখা যায় না। ইংরাজেরা দেখো কেমন ধীরপ্রকৃতির লোক, তাঁহাদের স্ত্রীরা পরপুরুষদিগের সহিত নাচিলেও তাঁহাদের ধৈর্য লোপ হয় না। ভা. স.



বিলাতে রবীন্দ্রনাথ

অষ্টম পত্র

আমি বিলিতি মেয়েদের একটু নিন্দে করে লিখেছিলুম বলে বুঝি সেটা ভালো লেগেছে! কিন্তু আমি সেটা কেবল এক শ্রেণীর মেয়েদের একটা ভাগ দেখিয়েছিলুম মাত্র, তাঁরা হচ্ছেন fashionable মেয়ে, তাঁদের দোরস্ত করতে হলে দিন দুই আমাদের দিশি শ্বাশুড়ির ও ঘরের বিধবা ননদের হাতে তাঁদের রাখতে হয়। তাঁরা হচ্ছেন বড়োমানুষের মেয়ে কিম্বা বড়োমানুষের স্ত্রী— তাঁদের চাকর আছে, কাজ কর্ম করতে হয় না— একজন house-keeper আছে, সে বাড়ির সমস্ত ঘরকন্না তদারক করে— একজন nurse আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে— একজন governess আছেন (governess ভদ্রলোকের মেয়েদের থেকে নেওয়া হয়) তিনি ছেলেপিলেদের পড়াশুনো দেখেন ও অন্যান্য নানাবিধ তদারক করেন। তবে আর তাঁর পরিশ্রম করার কী রইল বলো ! কেবল একটা ঘোরতর পরিশ্রম বাকি আছে— সেইটে তাঁর দিনের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রধান পরিশ্রম, অর্থাৎ সাজসজ্জা করা। কিন্তু তার জন্য তাঁর lady's maid আছে, সুতরাং এমন সাধের পরিশ্রমটাও সমস্তটা তাঁকে নিজের হাতে করতে হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দিনটা তাঁর হাতে আস্ত পড়ে রয়েছে। সকাল বেলায় বিছানায় প'ড়ে, দরজা জানালা বন্ধ ক'রে সূর্যের আলোক আসতে না দিয়ে, দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে break-fast খান ও এগারোটার আগে শয়নগৃহ থেকে বেরোলে যথেষ্ট ভোরে উঠেছেন মনে করেন। তার পরে সাজ-সজ্জা— সে বিষয়ে তোমাকে কোনো প্রকার খবর দিতে পারছি নে। শোনা যায় খুব সম্প্রতি বিলেতে স্নানটা fashion হয়েছে, কিন্তু এ

fashionটা খুব কম দূর ব্যাপ্ত হয়েছে। সীমন্তিনীরা হাতের যতটুকু বেরিয়ে থাকে, মুখটি ও গলাটি, দিনের মধ্যে অনেকবার অতি যত্নে ধুয়ে থাকেন। বাকি অঙ্গ পরিষ্কার করবার তাঁরা তত আবশ্যক দেখেন না, কেননা মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনো প্রকার মরচে না পড়লেই হল। মাসে দুবার একটা sponge-bath নিলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন; sponge-bathএর অর্থ হচ্ছে একটা ভিজে স্পঞ্জ্ দিয়ে গা সাফ করে ফেলা, অর্থাৎ একটা ভিজে গামছা দিয়ে গা মোছা আর কী। আমি একটা ইংরেজ পরিবারের মধ্যে বাস করতে গিয়েছিলেম, তাঁরা আমি স্নান করি শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের কোনো প্রকার স্নানের সরঞ্জাম ছিল না। সমস্ত আমার জন্যে ধার করে আনতে হয়েছিল, এমন বিপদ! যা হোক, আমাদের বিলাসিনী স্নান করলেন কি না বলতে পারি নে, তার পরে তাঁর সাজ সজ্জার বিষয়ে আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ। কাপড়ের এখানে একটু ফিতে, ওখানে একটু পাড়, কোথাও একটু এলোমেলো করে দেওয়া, কোথাও একটু পিন দিয়ে আটকে রাখা। কত প্রকার টুকরো-টুকরো জিনিসপত্র এঁটে-সেঁটে, মুখে কত প্রকার রঙচঙ লেপে, মনোদুর্গ আক্রমণের জন্য যথাযোগ্য যুদ্ধসজ্জা সমাপ্ত হয়। তার পরে এই রকম বাহারে সাজ-সজ্জায় এক বান্‌ডিল রূপের মতো drawing-roomএর (অভ্যর্থনাশালার) কৌচে গিয়ে বসলেন; বাড়িতে লোক দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে আলাপচারি করা হচ্ছে তাঁর কাজ। অনেক লোক একসঙ্গে এলে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে— তাঁর বাক্য ও হাসির অমৃত সকলকে সমানভাবে বিতরণ করা, বিশেষ কারও সঙ্গে বেশি কথা কওয়া বা বিশেষ কাউকে বেশি যত্ন করা কোনোমতে উচিত নয়। এ কাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক অভ্যেসে দুরস্ত

হয়। আমি লক্ষ্য করে দেখি তাঁরা কী করে এ কাজ সিদ্ধ করেন। আমি দেখেছি তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা কন, তার পরে শেষ করেই সকলের দিকে চেয়ে একবার হাসেন; কখনো বা তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা আরম্ভ করেন, তার পর বলতে বলতে এক-এক বার করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নেন; কখনো বা তাস খেলবার সময় যে রকম করে চট্‌পট্‌ তাস বিতরণ করে তেমনি তাঁরা আগন্তুকদের একে একে করে একটি একটি কথার টুকরো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেন, এমন তাড়াতাড়ি ও এমন সহজে করেন যে তাঁদের হাতে যে অনেক কথার তাস গোছানো রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। একজনকে বললেন: Lovely morning, isn't it? তার পরেই তাড়াতাড়ি আর-একজনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন: কাল রাত্তিরে সংগীতশালায় মাডাম নীল্‌সন গান করেছিলেন, it was exquisite! যতগুলি মহিলা visitor বসেছিলেন সকলে ঐ কথায় এক-একটা বিশেষণ যোগ করতে লাগলেন— একজন বললেন 'oh charming', একজন বললেন 'superb', একজন বললেন 'something unearthly', আর একজন বাকি ছিলেন তিনি বললেন 'isn't it'। এই রকম সর্বদিক্‌ব্যাপী কথাবার্তা চলতে থাকে। আমার তো বোধ হয়, এ এক রকম সকাল বেলা উঠে কথোপকথনের মুগুর ভাঁজা। যা হোক, এই রকম মাঝে মাঝে visitor আনাগোনা করছে। বাকি সময় তিনি কী করেন? Mudie's Libraryতে তিনি subscribe করেন, সেখেন থেকে অনবরত নভেলগুলো তাঁর ওখেনে যাতায়াত করতে থাকে। সেগুলো অনবরত গলাধঃকরণ করছেন। তা ছাড়া flirt করা আছে। flirt করা কী জানো? ভালোবাসার অভিনয় করা। দুই পক্ষেই জানছেন যে কেউ ভালোবাসছেন না, অথচ

মিষ্টি হাসি ও মিষ্টি কথার অজস্র আদান-প্রদান চলছে। অভিনেত্রী হয়তো একটা অলীক ছুতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান করলেন, অভিনেতা অমনি একটু সান্ত্বনার অভিনয় করলেন। একটা হয়তো রসিকতার কথা বললেন, অমনি অভিনেত্রী তাঁর তুষারহস্তে ক্ষুদ্র মুষ্টি উদ্যত করে আদর-মাখা রাগের অভিনয় করে বললেন : Oh you naughty, wicked, provoking man! naughty man অত্যন্ত তৃপ্তিসূচক হাস্য করলেন। এই রকম রসিকতা হাসি তামাসা ও মিষ্টি কথার ক্ষণস্থায়ী গোলাগুলি-বর্ষণের নাম flirt করা। এতে অনেকটা সময় বেশ আমোদে কেটে যায়। তা ছাড়া (যদি তিনি miss হন) love-making আছে। flirt করার সঙ্গে হয়তো তার অল্প তফাত আছে। তবে এটা flirt করার চেয়ে আর একটু গম্ভীর ও স্থায়ী পদার্থ— যদিও সকল সময়ে স্থায়ী হয় কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত বলতে পারি নে। অনেক চোখের জল ও নিশ্বেস খরচ করতে হয়, সহচরীদের কাছ থেকে অনেক রহস্যপূর্ণ ঠাট্টা ও চোক-টেপাটেপি খেতে হয়, ও দিনের মধ্যে দশবার করে blush করতে হয়। অজস্র নভেল পড়ে মনটা এমন romantic হয়ে দাঁড়ায় যে, একটু অবসর পেলেই ভালোবাসায় পড়তে ইচ্ছে করে, খাঁটি heroineএর মতো লম্বাচৌড়ো কাজ করতে ও লম্বাচৌড়ো কথা কইতে সাধ যায়। সুতরাং নভেল-পড়া মেয়েদের ভালোবাসায় পড়া অত্যন্ত আমোদের অবস্থা। চোখের জল ও নিশ্বেস ফেলতে হয় বটে ; কিন্তু অনেক দিন থেকে তাঁদের বড়ো সাধ ছিল যে, একদিন এই রকম চোখের জল ও নিশ্বেস ফেলবার উপযুক্ত অবসর পান। এই রকম visitor অভ্যর্থনা করা, visit প্রত্যর্পণ করা, নতুন নভেল পড়া, নতুন fashion সৃষ্টি ও নতুন fashionএর অনুবর্তন করা, flirt এবং love করা হচ্ছে

তাঁদের কাজ। এই রকম ফড়িঙের মতো ঘাসে ঘাসে লাফালাফি করে তাঁদের জীবনের বসন্তকাল কাটে। এঁরাই হচ্ছেন fashionable মেয়ের দল। আমি দেশে থাকতে এখানকার মেয়েদের যে রকম মনে করেছিলুম, এখেনে এসে তার সঙ্গে ঢের তফাত দেখছি। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে, লেখা পড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আফিসে যেতে হবে না— এখেনেও তেমনি মার্ঘি দরে বিকোবার জন্যে মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিশ করতে থাকে, বিয়ের জন্যে যতদূর লেখা পড়া শেখা দরকার ততদূর শেখায়, তার বেশি শেখায় না, কেননা তাদের তো আফিসে যেতে হবে না! একটু গান গাওয়া, একটু পিয়ানো বাজানো, ভালো করে নাচা, খানিকটা French, একটু বোনা ও শেলাই করা জানলে, একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত বেশ একটি রঙচঙে পুতুল গড়ে তোলা হয়। এ বিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাত, আমাদের দেশের ও এ দেশের মেয়েদের মধ্যে ঠিক ততটুকু তফাত মাত্র। দিশি পুতুলের অত সাজগোজ রঙচঙের আবশ্যক করে না, আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়ানো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখবার আবশ্যক করে না— বিলিতি পুতুলের কিছু বাহার আবশ্যক করে, বিলিতি মেয়েদেরও অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখতে হয়— কিন্তু দুইই দোকানে বিক্রি হবার জন্যে তৈরি হয়। এখেনেও পুরুষেরাই হর্তাকর্তা, স্ত্রীরা তাদের সম্পত্তি। যেমন গাড়ি চালাবার জন্যে ঘোড়া আবশ্যক করে তেমনি সংসার চালাবার জন্যে একটা স্ত্রীর দরকার, স্ত্রী একটি আবশ্যক জিনিসপত্রের মধ্যে। স্ত্রীকে আজ্ঞা করা, স্ত্রীর মনের মুখে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছেমত চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিকার মনে করেন।

fashionable মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরও অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে বিলেতে সংসার চলত না। মধ্যবিৎ গৃহস্থদের মেয়ের কতকটা মেহেন্নত করতে হয়, অতটা বাবুয়ানা করলে চলে না। সকালে উঠে একবার kitchen তদারক করতে যেতে হয়— kitchen পরিষ্কার আছে কি না, জিনিসপত্র যথাপরিমিত আনা হয়েছে কি না, যথাস্থানে রাখা হয়েছে কি না, ইত্যাদি দেখাশুনা করেন ; রান্না ও খাবার জন্য জিনিস আনতে হুকুম দিতে হয়, পয়সা বাঁচাবার জন্য নানা প্রকার গিন্নিপনার চাতুরী খেলাতে হয়— কালকের মাংসের হাড়-গোড় কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে তা হলে বন্দোবস্ত করে তার থেকে আজকের স্যূপ চালিয়ে নেন, পরশু দিনকার বাসি রাঁধা মাংস যদি খাওয়াদাওয়ার পর খানিকটা বাকি থাকে তা হলে সেটাকে রূপান্তরিত করে আজকের টেবিলে আনবার সুবিধে করে দেন, এই রকম নানা প্রকার বন্দোবস্ত করতে হয়। তার পরে ছেলেদের জন্য মোজা কাপড়-চোপড় নিজের হাতে তৈরি করেন, এমন-কি নিজেরও অনেক কাপড় নিজে তৈরি করেন। এঁদের সকলের ভাগ্যে নভেল পড়া ঘটে ওঠে না ; বড়ো জোর খবরের কাগজ পড়েন, তাও সকলে পড়েন না দেখেছি। অনেকের পড়াশুনার মধ্যে কেবল চিঠি পড়া ও চিঠি লেখা, দোকানদারদের বিল পড়া ও হিসাব লেখা। খানিকটা লেখাপড়ার চর্চা না থাকলে লেখাপড়ায় রুচি জন্মায় না। তাঁরা বলেন, 'politics এবং অন্যান্য গ্রামভারি বিষয় নিয়ে পুরুষরা নাড়াচাড়া করুন ; আমাদের কর্তব্য কাজ স্বতন্ত্র।' তাই জন্যে তাঁরা লেখাপড়া চর্চা করেন না। যেন পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে নিতান্ত সংকুচিত বলেই তাঁরা লেখাপড়া করেন না, যেন নিতান্ত অনধিকার প্রবেশ হয় বলেই তিনি প্রায় তাঁর স্বামীর Libraryতে পদার্পণ করেন না। কিন্তু আমি এর মধ্যে কর্তব্য

অকর্তব্য কিছু দেখতে পাই নে ; আসল কথাটা হচ্ছে, ইচ্ছে নেই ; লাইব্রেরি যদি ball-room হত, তা হলে তাঁরা অধিকার অনধিকার নিয়ে বড়ো মাথা ঘোরাতেন না। আর politics যদি নভেলের ভায়রা-ভাই হত, তা হলে তাঁরা পুরুষের পাত থেকে politics নিয়ে দু হাতে করে গিলতেন। দুর্বলতা মেয়েদের একটা ভূষণ বলে গণ্য, এই জন্যে দুর্বলতা মেয়েদের একটা গর্বের বিষয় ; মেয়েরা দু পা চলে একেবারে এলিয়ে পড়লে আমাদের চোকে যে কেমন একটু ভালো লাগে আমার বোধ হয় তার কারণ, ও রকম দেখলে আমাদের আশ্রয় দেবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়— আশ্রয় দেবার প্রবৃত্তি কতকটা গর্ব থেকে হয়। নিজের শক্তি খাটাবার একটা অবসর পেলুম ব'লে বেশ একটু তৃপ্তি হয় ; বিশেষতঃ বেশ একটি সুন্দর পদার্থ যার দিকে আমাদের স্বভাবতঃ মনের টান, সে আমাদের আশ্রয়ে আমাদের ছায়ায় লতার মতো জড়িয়ে থাকুক তা আমাদের ইচ্ছে করে। এই জন্যে মেয়েদের দুর্বলতা আমাদের ভালো লাগে, তাই জন্যে আমরা তার মধ্যে একটু সৌন্দর্য দেখি, সুতরাং অনেক মেয়ে শ্রান্ত না হলেও এলিয়ে পড়েন— যিনি দশটা কাজ সহজে করতে পারেন তিনি দেড়খানা কাজ করেই হাঁপাতে থাকেন। বুদ্ধিবিদ্যার বিষয়েও এই রকম ; মেয়েরা জাঁক করে বলেন, 'আমরা, বাপু, ওসব politics science বুঝি নে, শুঝি নে।' বিদ্যার অভাব, বুদ্ধির খর্বতা, একটা প্রকাণ্ড জাঁকের বিষয় হয়ে ওঠে। পুরুষরা অমনি অতি স্নেহপূর্ণ আদর করে তাঁদের বলেন, 'হাঁ, ঠাকরুনরা, তোমরা ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকো, ছেলেপিলে মানুষ করো, ও-সকল শুষ্ক কাষ্ঠের বোঝা তোমাদের বইতে হবে না।' ভাবটা যেন, 'তোমাদের একটা মহা কষ্ট থেকে উদ্ধার করলেম।' কিন্তু বিদ্যাচর্চা রহিত করলে একটা ভার থেকে মুক্ত করা হয় না, একটা অধিকার থেকে বঞ্চিত

করা হয়। এখানকার মধ্যবিৎ শ্রেণীর মেয়েরা বিদ্যাচর্চার দিকে ততটা মনোযোগ দেন না, তাঁদের স্বামীরাও তার জন্যে বড়ো দুঃখিত নন, তাঁদের জীবন হচ্ছে কতকগুলি ছোটোখাটো কাজের সমষ্টি। যা হোক, সমস্ত দিন এই রকম ছেলেদের দেখাশুনা ক'রে, কাপড় বুনে, visitorদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে কেটে যায়। সন্ধ্যে বেলায় স্বামী কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন, স্ত্রীর কাছ থেকে একটি আদরের চুম্বন উপার্জন করলেন (পরিবার-বিশেষে যে তার অন্যথা হয় তা বলাই বাহুল্য)— ঘরে তাঁর জন্যে আগুন জ্বালানো আছে, খাবার সাজানো আছে। সন্ধ্যে বেলায় স্ত্রী হয়তো একটা সেলাই নিয়ে বসলেন, স্বামী তাঁকে একটি নভেল চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন, সুমুখে আগুন জ্বলছে, ঘরটি বেশ গরম, বাইরে হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে, জানলা-দরজাগুলি বন্ধ। হয়তো স্ত্রী পিয়ানো বাজিয়ে স্বামীকে খানিকটা গান শোনালেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী— courtshipএর সময় স্ত্রীর গলা অত্যন্ত ভালো লাগত, কিন্তু বিয়ের পর স্ত্রীর গান শুনতে খুব কম লোকের আগ্রহ হয়। রোজ রোজ সেই একই রকম গলা, একই ধাঁচের গান, শুনে খুব কম লোকেরই অরুচি না জন্মায়। গিন্নির গলা নেমন্তন্নের দিন কাজে লাগে; দশজন বন্ধুবান্ধবকে ডিনারে নেমন্তন্ন করলে যেমন টেবিল সাজাবার জন্যে অনেক জিনিস সিন্দুক থেকে বেরোতে থাকে যা সচরাচর ব্যবহার করা হয় না, তেমনি সেদিন স্ত্রীরও গলা বেরোয়। এখানকার মধ্যবিৎ শ্রেণীর গিন্নিরা এই রকম সাদাসিদে, যদিও তাঁরা ভালো করে লেখাপড়া শেখেন নি তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার। এ দেশে কথায়-বার্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়। তাঁরা অন্তঃপুরে বদ্ধ নন; বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তা কন, আত্মীয়-

সভায় একটা কোনো উচ্চ বিষয় নিয়ে চর্চা হলে তাঁরা শোনেন ও নিজের বক্তব্য বলতে পারেন— এই রকম করে অনেক জানতে পারেন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একটা বিষয়ের কত দিক দেখেন ও কি-রকম চক্ষে দেখেন তা বেশ বুঝতে পারেন। সুতরাং একটা কথা উঠলে তিনি ভালো করে কইতে পারেন, কতকগুলো ছেলেমানুষি আকাশ-থেকে-পড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না ও বুঝতে না পেরে তাঁকে হাঁ করে থাকতে হয় না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খুব সহজ ভাবে গল্পসল্প করতে পারেন, নিমন্ত্রণসভায় মুখ ভার করে বা লজ্জায় অবসন্ন হয়ে থাকেন না, পরিচিতদের সঙ্গে অন্যায় ঘেঁষাঘেঁষি নেই কিম্বা তাদের কাছ থেকে নিতান্ত অসামাজিক দূরেও থাকেন না। লোকসমাজে মুখটি খুব হাসিখুশি প্রসন্ন ; যদিও নিজে খুব রসিকা নন কিন্তু হাসি তামাসা বেশ উপভোগ করতে পারেন, একটা-কিছু ভালো লাগলে মন খুলে প্রশংসা করেন, একটা কিছু মজার কথা শুনলে প্রাণ খুলে হাস্য করেন। ঠোঁট বন্ধ করে থাকা ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়া এখানকার মেয়েদের আচরণের আদর্শ নয়। মনে করে দেখো দেখি একটা নিমন্ত্রণসভায় ৩০টি মেয়ে ঘাড় হেঁট করে চুপচাপ বসে আছেন, সে সভায় পুরুষদের কী দুরবস্থা! ক্রমে ক্রমে তাঁদেরও মুখ বন্ধ হয়ে আসে, মনের ভিতর এক রকম অসোয়াস্তি উপস্থিত হয় ও ঘোমটা থাকলে ঘোমটা দিতে ইচ্ছে করে। লজ্জায় চুপচাপ করে থাকা অত্যন্ত অসামাজিক গুণ। তুমি তো কতকগুলো বাঘের মধ্যে পড় নি— আপনার জাত, মানুষ, বিশেষতঃ ভদ্রলোক— কোনো অভদ্র কুচরিত্র দলের মধ্যে গিয়ে পড় নি— তবে বেশ মিলে মিশে গল্পসল্প করবে না তো কী? লজ্জা দু দণ্ড দেখতে বেশ মন্দ লাগে না, হয়তো তার মধ্যে বেশ কবিত্ব-মাখা মাধুর্য দেখতে পাওয়া যায়— কিন্তু দিন রাত লজ্জার সঙ্গে কারবার করা

অত্যন্ত যন্ত্রণা। দু-তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করে একটা কথার উত্তর পেলেম, একবার সওয়া গেল— কিন্তু দিন রাত যদি ঐ রকম একটা কথা শোনবার জন্যে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয় তা হলে তো বাঁচা যায় না। তুমি যদি আমার সঙ্গে মন খুলে আমোদ-প্রমোদ না কর তা হলে দায়ে পড়ে তোমার সংসর্গ ছেড়ে আমাকে অন্য সংসর্গ খুঁজতে হয়। বিয়ের মন্ত্র কিছু ভালোবাসা জন্মাবার মন্ত্র নয়, বিয়ে হলেই ভালোবাসা হয় না। ভালোবাসাও নেই, অথচ আমার স্ত্রী যদি আমাকে কথায় বার্তায় আমোদে না রাখতে পারেন, তা হলে আমি আমার সেই মূক সঙ্গিনী ছেড়ে কি অন্যত্র আমোদের সন্ধান করব না? আমার তাই বোধ হয় মেয়েদের একটা অস্বাভাবিক লজ্জা ও সংকোচ চলে যাওয়া ভালো; যৌবনের একটা স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের ও মনোবৃত্তির স্বাভাবিক বিস্তার শিক্ষা ও অভ্যেসের চাপে না পিষে ফেলা ভালো।

আমি দিন-কতক আমার শিক্ষকের পরিবারের মধ্যে বাস করেছিলুম। সে বড়ো অদ্ভুত পরিবার। Mr. B মধ্যবিত্ত লোক। তিনি লাটিন ও গ্রীক খুব ভালো রকম জানেন। তাঁর ছেলেপিলে কেউ নেই— তিনি, তাঁর স্ত্রী, আমি আর একটা দাসী, এই চার জন মাত্র একটি বাড়িতে থাকতুম। Mr. — আধবুড়ো লোক, অত্যন্ত অন্ধকার মূর্তি, দিন রাত খুঁৎখুঁৎ খিট্‌খিট্ করেন, নীচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট্টো-জানলা-ওয়ালা দরজা-বন্ধ অন্ধকার ঘরে থাকেন, একে তো সূর্যকিরণ সে ঘরে সহজেই প্রবেশ করতে পারে না তাতে জানলার ওপর একটা পর্দা ফেলা, চার দিকে পুরোনো ছেঁড়া ধুলো-মাখা নানা প্রকার আকারের ভীষণ-দর্শন গ্রীক লাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা— ঘরে প্রবেশ করলে এক রকম বদ্ধ হাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠতে হয়। এই ঘরটা হচ্ছে তাঁর

study, এইখানে তিনি বিরক্ত মুখে পড়েন ও পড়ান। তাঁর মুখ সর্বদাই বিরক্ত, আঁট বুট জুতো পরতে বিলম্ব হচ্ছে, বুট জুতোর ওপর মহা চটে উঠলেন; যেতে যেতে দেয়ালের পেরেকে তাঁর পকেট আটকে গেল, রেগে ভুরু কুঁকড়ে ঠোঁট নাড়তে লাগলেন। তিনি যেমন খুঁৎখুঁতে মানুষ তাঁর পক্ষে তেমনি খুঁৎখুঁতের কারণ প্রতি পদে জোটে; আসতে যেতে তিনি চৌকাঠে হুঁচট খান, অনেক টানাটানিতে তাঁর দেরাজ খোলে না, যদি বা খোলে তবু যে জিনিস খুঁজছিলেন তা পান না, এক-এক দিন সকালে তাঁর studyতে এসে দেখি তিনি অকারণে বসে বসে ভ্রূকুটি করে উ-আ করছেন— ঘরে একটি লোক নেই। কিন্তু B আসলে ভালোমানুষ, তিনি খুঁৎখুঁতে বটে কিন্তু রাগী নন, তিনি খিট্‌খিট্ করেন কিন্তু ধমকান না। নিদেন তিনি মানুষের ওপর কখনো রাগ প্রকাশ করেন না— Tiny বলে তাঁর একটা কুকুর আছে তার ওপরেই তাঁর যত আক্রোশ, সে একটু নড়লে-চড়লে তাকে ধমকাতে থাকেন আর দিন রাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন। তাঁকে আমি প্রায় হাসতে দেখি নি। তাঁর কাপড়-চোপড় ছেঁড়া অপরিষ্কার। মানুষটা এই রকম। তিনি এক কালে পাদ্রি ছিলেন; আমি নিশ্চয় বলতে পারি, প্রতি রবিবারে তাঁর বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের নরকের বিভীষিকা দেখাতেন। Mr. —র এত কাজের ভিড়, এত লোককে তাঁর পড়াতে হত যে, এক-এক দিন তিনি ডিনার খেতে অবকাশ পেতেন না। এক-এক দিন তিনি বিছানা থেকে উঠে অবধি রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমন অবস্থায় খিট্‌খিটে হয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্য নয়। Mrs. B খুব ভালো মানুষ, অর্থাৎ রাগী উদ্ধত লোক নন। এক কালে বোধ হয় ভালো দেখতে ছিলেন। যত বয়স তার চেয়ে তাঁকে বড়ো দেখায়, চোখে

চশমা পরেন— সাজগোজের বড়ো আড়ম্বর নেই। নিজে রাঁধেন, বাড়ির কাজকর্ম করেন (ছেলেপিলে নেই, সুতরাং কাজকর্ম বড়ো বেশি নয়)— আমাকে খুব যত্ন করতেন। খুব অল্প দিনেতেই বোঝা যায় যে, Mr. ও Mrs.এর মধ্যে বড়ো ভালোবাসা নেই। কিন্তু তাই বলে যে দুজনের মধ্যে খুব ঝগড়াঝাঁটি হয় তা নয়, নিঃশব্দে সংসার চলে যাচ্ছে। Mrs. B কখনো Mr. Bর studyতে যান না, সমস্ত দিনের মধ্যে খাবার সময় ছাড়া দুজনের মধ্যে আর দেখাশুনা হয় না, খাবার সময়ে দুজনে চুপচাপ বসে থাকেন, খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু দুজনে পরস্পর গল্প করেন না। Mr. Bর আলুর দরকার হয়েছে, তিনি গোঁ গোঁ করতে করতে Mrs. Bকে বললেন : Some potatoes। (please কথাটা বললেন না কিম্বা শোনা গেল না।) Mrs. B বলে উঠলেন : I wish you were a little more polite. Mr. B বললেন : I did say please. Mrs. B বললেন : I didn't hear it. Mr. B বললেন : It was no fault of mine that you didn't ! কথাটা সমস্তটা ভালো করে শোনা গেল না, এইখেনেই দুই পক্ষ চুপ করে রইলেন। মাঝের থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পড়ে যেতেম। একদিন আমি ডিনারে যেতে একটু দেরি করেছিলেম, গিয়ে দেখি Mrs. B Mr. Bকে ধমকাচ্ছেন, অপরাধের মধ্যে Mr. B মাংসের সঙ্গে একটু বেশি আলু নিয়েছিলেন। আমাকে দেখে Mrs. B ক্ষান্ত হলেন, Mr. B সাহস পেয়ে প্রতিহিংসা তোলবার জন্যে দ্বিগুণ করে আলু নিতে লাগলেন। Mrs. B তাঁর দিকে একটি নিরুপায় মর্মভেদী কটাক্ষপাত করলেন। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে dear বা darling বলে ভুলেও সম্বোধন করেন না, কিম্বা কারও Christian নাম ধরে ডাকেন

না, পরস্পর পরস্পরকে Mr. B ও Mrs. B বলে ডাকেন। আমার সঙ্গে Mrs. B হয়তো বেশ কথাবার্তা কচ্ছেন এমন সময় Mr. B এলেন, অমনি সমস্ত চুপচাপ। দুই পক্ষেই এই রকম। একদিন Mrs. B আমাকে piano শোনাচ্ছেন এমন সময় Mr. B এসে উপস্থিত হলেন, বললেন : When are you going to stop ? Mrs. B বললেন : I thought you had gone out. পিয়ানো থামল। তার পরে আমি যখনি পিয়ানো শুনতে চাইতেম Mrs. B বলতেন, 'that horrible man যখন বাড়িতে না থাকবেন তখন শোনাব।' আমি ভারী অপ্রস্তুতে পড়ে যেতুম। দুজনে এই রকম অমিল, অথচ সংসার বেশ চলে যাচ্ছে। Mrs. B রাঁধছেন-বাড়ছেন, কাজকর্ম করছেন, Mr. B রোজগার করে টাকা এনে দিচ্ছেন। দুজনে কখনো প্রকৃত ঝগড়া হয় না, কেবল কখনো কখনো দুই-একবার দুই-একটা কথা কাটাকাটি হত ; তা এত মৃদু স্বরে যে পাশের ঘরের লোকের কানে পর্যন্ত পৌঁছায় না। যা হোক, আমি সেখানে দিন কতক থেকে বিব্রত হয়ে সে অশান্তির মধ্যে থেকে চলে এসে বেঁচেছি।

নবম পত্র

আর-বারে আমি অন্য লোকদের মুখ থেকে তাঁদের বিলেতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেছিলুম তোমাদের উপকারার্থে তা আমি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে যথা সময়ে পাঠিয়েছি। আমার যা কর্তব্য তা আমি করেছি, এখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে সেটি আদ্যোপান্ত পাঠ করা ও সে বিষয়ে তোমাদের মতামত ব্যক্ত করে যত শীঘ্র পারো আমাকে একটা উত্তর লিখে পাঠানো। কেমন ?

এর আগে তোমাদের যে-সব চিঠি পাঠিয়েছি তাতে যখন যা মনে হয়েছে বলেছি, এখন সেইগুলোকে আর-একটু শৃঙ্খলবদ্ধ করে লিখতে চাই। এখেনে কী কী দেখে আমার মনে কিরকম সংস্কার হল, আমি কী নতুন জ্ঞান লাভ করলুম, আমার মনে কী নতুন মত গড়া হল ও কী পুরোনো মত ভেঙে গেল, তাই লিখতে চেষ্টা করব। অতএব এবারকার চিঠির প্রধান নায়ক হচ্ছেন 'আমি'। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত— 'আমি'। সুতরাং খুব সম্ভব যে, এই চিঠির কাগজের চার পৃষ্ঠা -পূর্ণ অহমিকা পড়তে পড়তে অর্ধ পথে তোমার গা ঝিমিয়ে আসবে, চোখের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে ও নাসারন্ধ্র হতে একটা বেসুরো কোলাহল উত্থিত হতে থাকবে। 'আমি' পদার্থের মতো প্রিয় ও আমোদজনক আর কী হতে পারে বলো। কিন্তু আমরা সকল সময়ে বিবেচনা করি নে যে, 'আমি' আমারই কাছে 'আমি', কিন্তু তোমার কাছে 'তুমি' বৈ আর কিছুই নয়। এই রকম সাত পাঁচ ভেবে 'আমি' বলে একটা বস্তুকে সহসা তোমাদের সভার মধ্যে নিয়ে গিয়ে বলপূর্বক খাড়া করে তুলতে আমার কেমন সংকোচ বোধ হচ্ছে। বিলেত সম্বন্ধে আমার নিজের যৎসামান্য অভিজ্ঞতার সারাংশ প্রকাশ করতে প্রস্তুত হয়েছি। এইখানে একটা কথা বলে রাখি, কথাটা কিছু গম্ভীর ছাঁচের। অভিজ্ঞতা বলতে কী বোঝায়? কতকগুলি বিশেষ ঘটনার বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করা ও তার থেকে একটা সাধারণ মত প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া। আমি অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করছি যে, যে দিক থেকে দেখো, আমার অভিজ্ঞতার মূল্য বড়ো অধিক নয়। প্রথমতঃ, আমি এখেনে এত অধিক দিন নেই ও এত বিশেষ সুবিধে পাই নি যা থেকে এখানকার সমাজের অনেক দেখে শুনে নিতে পারি; দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ ঘটনাবলী থেকে একটি যথার্থ সাধারণ মত তৈরি

করে নিতে যতটা বুদ্ধির আবশ্যক ততটা আপাততঃ আমার তহবিলে আছে কি না সে বিষয়ে আমার নিজের ও আমার আলাপী বন্ধুবর্গের ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। অতএব আমার এই আধ-সিদ্ধ অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনগুলো তোমাদের পাতে দিচ্ছি, যদি রুচিজনক হয় ও তোমাদের পাকযন্ত্রের হানি-জনক বিবেচনা না করো তা হলে সেবা কোরো। এইখানে আমার উদ্যোগপর্ব ও বিনয়পর্ব শেষ করে প্রবন্ধের যথাশাস্ত্র মুখবন্ধ করে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করি।

আমরা লন্‌ডনে দুই-এক ঘণ্টা থেকেই ব্রাইটনে প্রস্থান করি। ব্রাইটন সমুদ্রের ধারে— একটা বড়ো শৌখিন (fashionable) শহর। দেখতে শুনতে আকারে ইঙ্গিতে লন্‌ডনেরই মতো, কেবল লন্‌ডনের মতো সে রকম অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন ভ্রূকুটিকুটিলমুখ নয়। আমাদের একটি বাঙালি পরিবার ব্রাইটনে বাস করেন, তাঁদের সেখেনে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। দেখি যে আমাদের গৃহিণী তাঁর দিশি বস্ত্র প'রে ছেলেপিলে নিয়ে ঘরে অন্নপূর্ণার মতো বিরাজ করছেন।

তাঁর দিশি কাপড় দেখে তাঁর বিলিতি বন্ধুরা অত্যন্ত প্রশংসা করেন ও তাঁর দিশি বন্ধুরা সেই পরিমাণে খুঁৎখুঁৎ করেন। তাঁর দিশি কাপড় দেখে তাঁর বিলিতি বন্ধু Miss — বলেন 'ঐ রকম ভাঁজ-ভাঁজ কাপড়ে যে-একটি সুন্দর শ্রী আছে, তা আঁট-সাঁট ছাঁটা-ছোঁটা গাউনে পাওয়া যায় না' ; তাঁর দিশি বন্ধু Miss — (একজন বিলিতি বাঙালি) বলেন যে, 'যে কাপড়টা পরা হচ্ছে সেটা একে তো সম্পূর্ণ দিশি নয় (অর্থাৎ ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে শাড়ি নয়) তার উপরে তাতে যদি এক রত্তি শ্রী থাকত তা হলেও নাহয় ভদ্রসমাজে পরা যেত, কিন্তু তাও নেই।' এই রকম বিলিতি ও দিশি বন্ধুদের মধ্যে মতের আকাশ পাতাল তফাত দেখা যাচ্ছে। আমি তো আগেই

বলেছি যে, বাঙালি সাহেব হয়ে উঠলে তিনি সাহেবের ঠাকুরদাদা হয়ে ওঠেন ; আপনার লোক পর হয়ে গেলে সে যেমন পর হয়ে যায় এমন আর কেউ হয় না। যা হোক, আমাদের দেবীর যে এখনো অনেকগুলি 'কুসংস্কার' আছে দেখে আমরা তৃপ্তি লাভ করলেম। এমন-কি তিনি বললেন যে, বিলেতে এসে তাঁর 'কুসংস্কার'গুলি আরও বদ্ধমূল হচ্ছে। কী সর্বনাশ! দেশের উপর ভালোবাসা আরও বেড়েছে। কী আশ্চর্য! তিনি বললেন তাঁর মনের এতদূর পর্যন্ত উন্নতি হয় নি যে, সার্বভৌমিক ভাব তাঁর মনে বদ্ধমূল হতে পারে, বরঞ্চ সে বিষয়ে তাঁর মন আরও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তোমরাই বলো, বিলেতে এসেও এঁর যদি এই দুর্দশা তা হলে এঁর কি আর শোধরাবার উপায় আছে? ছেলেপিলেরা দেখলুম অত্যন্ত খুশিতে আছে, তাদের স্ফূর্তি ও উদ্যম দেখে কে! সমস্ত দিনের মধ্যে লাফালাফি ছুটোপাটির তিলেক বিশ্রাম নেই। এইমাত্র সু— এসে আমার লেখার সম্বন্ধে কত শত প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল। জিজ্ঞাসা করছিল কী করে আমি এত বড়ো চিঠি বাড়িতে লিখি, সে এর অর্ধেকও লিখতে পারে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল এত বড়ো চিঠি লেখবার আবশ্যক কী, ছোটো করে লিখলে তো সেই একই কথা। তৃতীয় প্রশ্ন হল, 'অত কষ্ট করে হাতে করে না লিখে যদি ছাপিয়ে পাঠিয়ে দেও তা হলে কী হানি'— ছাপিয়ে পাঠালে তার মতে কত প্রকার সুবিধে তাই একে একে বলতে লাগল। তার পরে আমার চিঠি পড়তে চেষ্টা করতে লাগল। তার পরে তার শেষ উপসংহার হচ্ছে যে আমার লেখা অত্যন্ত খিজিবিজি, বাঁকাচোরা, অপরিষ্কার (সে নিজে বুঝতে পারলে না ব'লে বোধ হয়) —মুক্ত কণ্ঠে এই মতটি ব্যক্ত করে টেবিলের চারি দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলে। ইতিমধ্যে কখন বি—

এসে আমার চৌকির পিছন দিক থেকে আমার কাঁধে চড়ে বসবার বন্দোবস্ত করছে, তাকে কাঁধে চড়তে দেখে সু—র জেদ হল সেও কাঁধে চড়বে, অবশেষে তুজনে আমার তুই কাঁধে চড়ে বসেছে— আমি তো এই অবস্থায় লিখছি। তোমরা এ কথা শুনে হয়তো অবাক হয়ে গেছ— বিশেষতঃ তুমি যে শাসনভক্ত, তোমার চুল হয়তো দাঁড়িয়ে উঠেছে। এ ছেলেদের পেলে তুমি দিন-কতক পিটিয়ে মনের সাধ মেটাও— না? তুরন্ত ছেলে তুমি তু চক্ষে দেখতে পারো না। তুমি চাও— ছেলেরা গুরুলোকদের কাছে চুপচাপ করে ঘাড়টি গুঁজে বসে থাকবে, কথা জিজ্ঞাসা করলে তবে কথা কবে, কথা কবার সময় গলার স্বর অত্যন্ত নিচু হবে, গুরুলোকদের সাক্ষাতে কোনো প্রকার নিজের মত ব্যক্ত করবে না,[১] তাঁদের অত্যন্ত ভক্তি ও মান্য করবে ইত্যাদি। এ যে শুধু ছেলেপিলেদের প্রতিই খাটবে তা নয়, গুরুলোকদের কাছে লঘু লোক মাত্রেরই এই-সকল কর্তব্য। তোমার মত হচ্ছে: লালনে বহবোদোষাস্‌-তাড়নে বহবোগুণাঃ, তস্মাৎ পুত্রঞ্চ ভৃত্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ।[২] যা হোক, এই গুরুভক্তির বিষয়ে আমার অনেকটা মতপরিবর্তন হয়েছে, সে বিষয়ে তোমাদের একটুকু বিস্তৃত করে বলছি। আমাদের সমাজের পথে ঘাটে ভালোবাসার চেয়ে ভক্তির প্রাতুর্ভাব দেখা যায়। আমাদের দেশে পরিবারের মধ্যে গুরুজনের সম্বন্ধে ভালোবাসার সম্পর্ক যেন একেবারে নেই;[৩] সমস্তই ভক্তি ও স্নেহ। বয়সের অতি সামান্য তারতম্যে, সম্পর্কের অতি সামান্য উঁচু-নিচুতে, ভক্তি ও স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; অত কথায় কাজ কী, আমাদের তা ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক মূলে নেই— কেবল যমজ সন্তানদের মধ্যে কিরকম হয় বলতে পারি নে। কিন্তু এ রকম ভক্তিকে ভক্তি নাম দিলে সে নামের অসদ্‌ব্যবহার

করা হয়— এ এক রকম অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি, এক রকম অস্বাভাবিক ভয়। বড়োদের আমরা স্বভাবতই ভক্তি করি, তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখে আমরা স্বভাবতই তাঁদের উপর নির্ভর করি, কিন্তু আমাদের পরিবারের মধ্যে যে ভক্তি যে নির্ভরের ভাব বদ্ধমূল সে কি স্বাভাবিক? প্রতি পদে শিক্ষা শাসন ও অভ্যাসের প্রভাবেই কি তার জন্ম হয় না?· ছেলেবেলা থেকে প্রতি পদে আমাদের কানে মন্ত্র দিতে হয় যে, পিতা দেবতুল্য, গুরু দেবতুল্য। কেন, দেবতুল্য কেন? দেবভাবের কঠোর ও সুদূর সম্ভ্রম কেন তাঁদের উপর অর্পণ করা হয়? তাঁরা আমাদের ভালোবাসার পিতা, ভালোবাসার মাতা, ভালোবাসার সঙ্গে আমরা তাঁদের মুক্ত আলিঙ্গনে গিয়ে বদ্ধ হব[৪] না যোড়হস্তে বিনীত ভাবে, আমাদের মানুষ পিতার কাছে না গিয়ে, আমাদের জাতের বহির্‌ভূক্ত কোনো দেবতুল্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে অতি সন্তর্পণে বসে থাকব— অতি মৃদুস্বরে কথা কব— অতি নত ভাবে আত্মনিবেদন করব? এর মধ্যে কোন্‌টা স্বাভাবিক?[৫] আমাদের পরিবারে গুরুলোকদের 'পরে এই রকম একটা অস্বাভাবিক ভক্তির উদ্রেক করে দেওয়া হয়, গুরু-লোকেরাও সেই অন্ধ ভক্তির প্রভাবে বলীয়ান হয়ে ছোটোদের উপর যথেচ্ছব্যবহার করেন। তাঁরা চান, তাঁদের সমস্ত মত সমস্ত আজ্ঞা ছোটোরা অবিচারে শিরোধার্য করে নেয়, সে বিষয়ে তারা তিলমাত্র দ্বিরুক্তি বা দ্বিধা না করে; যেন ছোটোরা কতকগুলি কলের কাঠের পুতুল, তাদের মন নেই, তাদের মনোবৃত্তি নেই, তাদের ইচ্ছে নেই, তাদের বিচারশক্তি নেই! সংসারে তোমার যত প্রকার বড়ো আছে (কেবল লম্বায় ছাড়া) তাদের কাছে তোমার বিবেচনা ও ইচ্ছে কিছুমাত্র খাটিয়ো না, সেগুলি আপাততঃ সঞ্চিত করে রেখে দেও, অবসর পেলে তোমার ছোটোদের কাছে

তা অন্ধভাবে খাটাতে পারবে; তাতে সমাজের কোনো আপত্তি নেই। আমাদের শাস্ত্রে বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা[৩] পিতৃতুল্য, কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রতুল্য; শুনে শুনে অভ্যেস হয়ে গেছে বলে ও আমাদের দেশে এই রকম একটা ভাব বর্তমান আছে বলে এর হাস্যজনকতা ঘুচে গিয়েছে, নইলে এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে? ভ্রাতা কি ভ্রাতার তুল্য হতে পারে না? সংসারে কি পিতা পুত্র ছাড়া আর কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই? ভাই ভাইয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বলে কি একটা ভাব বর্তমান নেই? কোনো প্রকারে কান ধরে ভাইয়ের সম্পর্ক কি পিতা পুত্রের সম্পর্কের সঙ্গে মেলাতে হবেই? এমন যন্ত্রণাও তো দেখি নি। তা হলে তো তুমি বলতে পারো হাত মাথার তুল্য; কিন্তু আমি বলি ও রকম তুলনার স্পৃহাটি পরিত্যাগ করে হাতকে হাতের স্থানে ও মাথাকে মাথার স্থানে স্ব স্ব কাজে বজায় রাখা হোক। প্রকৃতি যা করে দিয়েছে সেটাকে ভেঙেচুরে মুচড়ে একটা বিকৃতাকার করে তুলো না। আমাদের দেশের শাস্ত্র যেমন (শাস্ত্র বোধ হয় সকল দেশেই সমান) আজ্ঞা করে, বুঝিয়ে বলে না— ভয় দেখায়, কারণ দেখায় না— আমাদের গুরুলোকেরাও তাই করেন। তাঁরা প্রতিপদে কারণ না দেখিয়ে আজ্ঞা করেন, ছোটো যদি একবার জিজ্ঞাসা করে 'কেন?' তা হলে তাঁরা চোখ রাঙিয়ে বলেন, 'হাঁ, এত বড়ো স্পর্ধা!' এতে যে ছোটোদের মনের একেবারে সর্বনাশ হয় তা তাঁরা বোঝেন না। একটা ঘোড়া কিম্বা এক পাল গোরুকে অবিচারে যেখানে ইচ্ছে চালিয়ে বেড়াও তাতে হানি নেই, কেননা তাতে বড়ো জোর তাদের শরীরের কষ্ট হবে, কিন্তু তাতে তাদের মনোবৃত্তির বিকাশ ও বিচারশক্তি-পরিস্ফুটনের কোনো ব্যাঘাত হবে না। কিন্তু কোনো মানুষকে সে রকম কোরো না, বিশেষতঃ তোমার নিজের ভাই

নিজের ছেলেকে। তুমি নিশ্চয় জেনো যে, ছেলেবেলা, যখন আমাদের মন খুব কোমল থাকে, তখন থেকে যদি আমরা ক্রমাগত যুক্তিবিহীন আজ্ঞা পালন করে আসতে থাকি, বড়ো লোক বলছেন বলেই দ্বিরুক্তি না করে সব কথা আমাদের শিরোধার্য করে নিতে হয়, তা হলে বড়ো হলেও আমাদের মনের সে অস্বাভাবিক অভ্যাস দূর হয় না, প্রশ্ন কব্বার স্বভাবটা একেবারে চলে যায় আর সে রকম মনে কুসংস্কার অতি শীঘ্র আপনার শিকড় বিস্তার করতে পারে।[৭] আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের একবার দেখো-না— তাঁরা অনেক পড়েছেন, কিন্তু তবু নিজের একটা স্বাধীন মত প্রকাশ করতে তাঁদের কেমন সাহস হয় না। যদি মিল কিম্বা স্পেন্সেরের নাম করে তাঁদের নিতান্ত একটা আজগুবি কথা বলো, দ্বিরুক্তিমাত্র না করে তা তাঁরা মাথায় করে নেন ; বিলিতি কেতাবে ইংরাজি ছাপার অক্ষরে যা লেখা আছে তা তাঁরা আর বুঝে হজম করতে শ্রম স্বীকার করেন না, শুক পাখির মতো মুখস্থ করে যান, কেননা বিলিতি 'authority'র উপর তাঁদের এমন অটল ভক্তি যে বিচার না করেই ধরে নেন যে কথাগুলো সত্য হবেই। তাতে আমি তাঁদের দোষ দিতে পারি নে ; কেননা ছেলেবেলা থেকে তাঁদের মন এমনি ছাঁচে গড়া যে, বড়ো লোকের মুখের সামনে একটা প্রশ্ন করতে তাঁদের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করে, বড়ো লোক যা বলেছেন তার উপরে আর কথা নেই।[৮] তবে দুই বড়ো লোকের মধ্যে যখন মতের অনৈক্য হয়, তখন আমরা চুপ করে অপেক্ষা করতে থাকি— আর-একজন বড়ো লোক এসে তার কী মীমাংসা করে দেন। আমরা বড়ো লোকের নামের ঢেউ দেখলেই যুক্তির হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি। কিন্তু এ রকম না হওয়াই আশ্চর্য। আমাদের নীতিশাস্ত্রে গুরুলোকের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন

করাই হচ্ছে পুণ্য।[৯] ছোটোদের পক্ষে গুরুদের আজ্ঞা পালন করা বাস্তবিকই ভালো, আমি ছোটোদের গুরুদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করতে বলছি নে, কিন্তু গুরুদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন যে তাঁরা যেন ছোটোদের আজ্ঞা না করেন; হয় অনুরোধ করেন নয় কারণ প্রদর্শন করেন, যখন কারণ প্রদর্শন করেও ফল হল না তখন একটুখানি গুরুত্ব প্রয়োগ করতে পারেন। কেননা, অপরিমিত ভক্তির রাজ্যে যুক্তির অত্যন্ত হীন পদ; তিনি ক্রমে এত মুষড়ে যেতে থাকেন যে অবশেষে তাঁর আর মাথা তোলবার শক্তি থাকে না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের আবার একটা-আধটা গুরুলোক নয়, পদে পদে গুরুলোক। এই রকম ছেলেবেলা থেকে গুরুভারে অবসন্ন হয়ে একটি মুমূর্ষু জাতি তৈরি হচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে বলের অন্ধ দাসত্ব করে আসছে, সুতরাং বড়ো হলে সে অবস্থা তার নতুন বা অরুচিজনক বলে ঠেকে না, তার কাছে এ অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আজ্ঞা[১০] পালন করে করে তার এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, আজ্ঞা করে বললেই তবে সে একটা কথা গ্রাহ্য করে, বুঝিয়ে বলতে গেলেই তবে বেঁকে দাঁড়ায়। এখনকার বিখ্যাত বাংলা-লেখকদের লেখায় কেমন একটা আজ্ঞার ভাব দেখতে পাওয়া যায়— কথাগুলি অসন্দিগ্ধ, স্পষ্ট, জোর-দেওয়া; পাঠকদের সঙ্গে সমান আসনে বসে যে বিচার করছেন তা মনে হয় না কিম্বা কথা কয়ে কয়ে যে চিন্তা করছেন তাও মনে হয় না, তাঁরা কতকটা গুরুমহাশয়ের মতো কথা কন; মনে হয় হাতে একটা বেত আছে, চোখে একটা চশমা আছে, মুখে একটা কঠোর স্বাতন্ত্র্যের ভাব বর্তমান— ইংরাজিতে যাকে dogmatic বলে তাঁদের লেখার আপাদমস্তক সেই রকম। তাতে তাঁদের দোষ নেই, নইলে পাঠকেরা তাঁদের কথা মানে না; পাঠকেরা যেই

দেখেছেন তুমি একটু ইতস্ততঃ করছ কিম্বা একটা কথা খুব জোর দিয়ে বলছ না, কিম্বা তোমার উচ্চ আসন থেকে এতদূর পর্যন্ত নেবে এসেছ যে তাঁদের সঙ্গে সমান ভাবে বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছ, তা হলেই তোমার কথা একেবারে অগ্রাহ্য হয়ে দাঁড়ায়। তুমি যুক্তি না দেখিয়ে একটা কথা জোর করে বলো (অবিশ্যি তোমার একটু নাম থাকা দরকার) তাঁরা মনে করেন 'এটা বুঝি একটা ধরা-কথা, কেবল অজ্ঞতাবশতঃ আমরা জানি নে' ; তাঁরা অপ্রস্তুত হয়ে সমস্বরে সবাই মিলে বলে ওঠেন, 'হাঁ এ কথা সত্য, এ কথা সত্য।' যুক্তি দেখাতে গেলেই তাঁরা মনে করেন তবে বুঝি এটাতে কোনো প্রকার সন্দেহ আছে, এটা একটা স্থির সিদ্ধান্ত নয় ; অমনি তাঁরা চোখ-টেপাটেপি করতে থাকেন ; অত্যন্ত অবিশ্বাসের ভাব দেখান ; মনে করেন এ বিষয়ে অনেক কথা ওঠানো যেতে পারে, অর্থাৎ আমি যদি বা না পারি আমার চেয়ে আর কোনো বুদ্ধিমান জীব হয়তো পারেন, যুক্তিটা শুনেই যে আমি বলে যাব 'হাঁ সত্যি'— আবার দুদণ্ড বাদে যদি ওর একটা ভুল বেরিয়ে পড়ে তা হলে কি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ব ? পাঠকেরা যে লেখকের কথা পালন করতে চান সে লেখকের পাঠকদের চেয়ে একটা স্বতন্ত্র প্রাণী হওয়া আবশ্যক ; পাঠকদের কাছে এমন বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে হবে যে তিনি সব জানেন, তাঁর উপরে আর কারও কিছু বলবার কথা নেই। বলবার কথা থাকলেই তিনি একেবারে মাটি হয়ে গেলেন। তার মূল কারণ, ছেলেবেলা থেকে আমরা শাসনের বশ, যুক্তির রামরাজ্যে আমরা বাস করি নি। তুমি ঘর থেকে গ'ড়ে-পিটে তৈরি করে আমাদের একটা অসন্দিগ্ধ আজ্ঞা দেও আমরা পালন করব, কিন্তু তোমার ঝুড়ি থেকে তোমার যুক্তির মালমশলাগুলি বের করে আমাদের সুমুখে

একটি পরামর্শ তৈরি করো সে কোনো কাজে লাগবে না। কেননা আমরা ছেলেবেলা থেকে আমাদের গুরুলোকদের অভ্রান্ত বুদ্ধির উপর নির্ভর করছি, আমরা যেখেনেই আমাদের নিজের মত খাটাতে গিয়েছি সেইখেনেই তাঁরা ছেলেমানুষ বলে আমাদের চুপ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কখনো যুক্তি দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করেন নি। ছেলেমানুষের কাছে যুক্তি প্রয়োগ করা তাঁরা বৃথা পরিশ্রম মনে করেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও এক কালে তাই মনে করতেন; তাঁরা শ্রম সংক্ষেপ করবার জন্যে সত্যকথাগুলিও মিথ্যার আকারে প্রচার করেছেন ও যুক্তির বদলে বিভীষিকা দেখিয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছেন। যদি বলো গুরুলোকেরা আমাদের চেয়ে জ্ঞানী, সুতরাং তাঁদের হাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে গচ্ছিত রাখা আমাদের পক্ষে ভালো— তা যদি বলো তা হলে ইংরাজদের কাছ থেকে কতকগুলি স্বাধীনতা পাবার জন্যে আমরা খবরের কাগজে দাপাদাপি করে মরি কেন? ইংরাজরা যে আমাদের চেয়ে জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সম্পর্কে-বড়ো কিম্বা বয়সে-বড়োর চেয়ে গুণে-বড়োর কাছে আত্মবিসর্জন করা ঢের বেশি যুক্তিসিদ্ধ।[১১] তবে কেন তাঁদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে আমরা নিজের হাতে কতকগুলি স্বাধীনতা নিতে চাই? তুমি বলবে, যাঁদের আমাদের উপরে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাঁদের কাছে আমরা সর্বতোভাবে আজ্ঞাবহ হয়ে থাকব। তা থাকো-না কেন। কিন্তু ফলে যে সমানই কথা। তোমার চড় মারবার অধিকার আছে বলে যে ব্যক্তি চড় খাবে তার যে কিছু কম লাগবে তা তো নয়। যেখানেই অন্ধ একাধিপত্য সেইখানেই খারাপ। যখন গুরুলোকেরা আপনার ইচ্ছা ও সংস্কার এমন-কি কুসংস্কারের বিরোধী হল ব'লে ছোটোর

প্রত্যেক ইচ্ছা অবিচারে দলন না করবেন, তখন অনেক উপকার হবে।[১২] আমাদের দেশের অশুভের মূল ঐখান থেকে অনেকটা পোষণ পাচ্ছে। এখানকার তুলনায় আমি সেইটি ভালো করে বুঝতে পেরেছি। সু—বি—দের দেখো, তাদের উদ্যম উৎসাহ, অধীর বাল্যভাব ও স্বাধীনতাস্পৃহার সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেদের শুষ্ক মলিন গম্ভীর ধীর ভাব[১৩] ও সম্পূর্ণরূপে পর-নির্ভরতার তুলনা করে দেখো— সে কী অনৈক্য! আমি ইংরেজের ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করলুম না, পাছে তুমি বল তাদের জাতিগত স্বভাবের সঙ্গে আমাদের জাতীয় স্বভাবের ভিন্নতা আছে। কিন্তু আমাদের দেশীয় ছেলেই যথোপযুক্ত স্বাধীনতার সঙ্গে পালিত হলে তার কিরকম স্ফূর্তি হয়, তার মনের স্বাস্থ্য কিরকম অক্ষুণ্ণ থাকে তাই দেখো। ছেলেদের স্বাভাবিক ভাব হচ্ছে প্রশ্ন করা, একটা জানবার ইচ্ছে। এখানকার ছেলেরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে সারা হয়। সু— আমাকে প্রশ্ন করে করে অস্থির করে তোলে; আকাশের তারা থেকে পৃথিবীর তৃণ পর্যন্ত এমন কোনো পদার্থ নেই, বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি করে সে যার ঘরের খবর না জানতে চায়। আমি যখন টর্কিতে ছিলুম তখন একটি ছেলে আমার সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছিল; পৃথিবীর যা-কিছু দেখত তাই যেন তার ভারী আশ্চর্য লাগত, প্রতি পদে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে আমাকে ভারী মুশকিলে ফেলত— তার কৌতূহলের আর আদি অন্ত নেই। তা ছাড়া এখানকার ছেলেদের এক রকম স্বাধীন ও পৌরুষের ভাব দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তার প্রধান কারণ, এখানকার গুরুলোকেরা তাদের প্রতি পদে বাধা দেয় না, আর অনেকটা সমান সমান ভাবে রাখে। আমি এখানকার একটা প্রাইবেট স্কুল দেখেছিলেম— মাস্টার ছেলেদের সঙ্গে ঠাট্টাঠুট্টি করেন,

খেলা করেন, কত যে স্বাধীনতা দেন তার ঠিক নেই ; অথচ তাতে কিছু তাদের 'মাথা-খাওয়া' হয় নি, পড়াশুনোতে তাদের কিছুমাত্র ক্রুটি নেই।[১৪] এই তো গেল ছেলেদের কথা। আর বড়োরা যে গুরুর সঙ্গে খুব কম সম্পর্ক রাখে তা বলাই বাহুল্য। এখানে এমন স্বাধীনভাব বর্তমান যে, প্রভু ভৃত্যের মধ্যেও সে রকম আকাশ-পাতাল সম্পর্ক নেই।[১৫] এখানে চাকরকে গালাগালি দেওয়া ও মারাও যা একজন বাইরের লোককে গালাগালি দেওয়া ও মারাও তাই। আমাদের দেশের মতো চাকরদের বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত অধিকার মনিবদের হাতে নেই। চাকর কোনো কাজ করে দিলে 'thank you' ও তাকে কিছু আজ্ঞা করবার সময় 'please' বলা আবশ্যক।[১৬] একবার কল্পনা করে দেখো দেখি, আমরা চাকরদের বলছি 'অনুগ্রহ করে জল এনে দেও' বা 'মেহেরবানি কর্‌কে পানি লে আও' ও জল এনে দিলে বলছি 'বাধিত রইলুম'।[১৭] তুমি হয়তো বলবে 'thank you' ও 'please' —ও কেবল একটা মুখের কথা মাত্র। কিন্তু জাতীয় আচার ব্যবহার প্রতি পদে যে কথা-দুটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় জাতীয় হৃদয়ে তার কারণ নিশ্চয়ই বর্তমান আছে। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে হয়তো জোর করে তর্ক করছি, তুমি হয়তো মানো যে হৃদয়ের মাটিতে শিকড় না থাকলে একটা কথা তিন দিনে শুকিয়ে মারা যায়। এখানে মনিবরা টাকা দেন ও চাকরেরা কাজ করে দেয়, উভয়ের মধ্যে কেবল এইটুকু বাধ্যবাধকতা আছে। তুমি টাকা না দিলে চাকর কাজ করবে না, চাকর কাজ না করলে তুমি টাকা দেবে না। কিন্তু একটুখানি কাজের ক্রুটি হলে তাকে ও তার অনুপস্থিত নির্দোষ পিতা পিতামহ বেচারিদের সম্পর্কবিরুদ্ধ বিশেষণ প্রয়োগ করবার কী অধিকার আছে ? এখানে চাকরদের

মধ্যে দাসত্বের ভাব যে কত কম তা হয়তো তুমি না দেখলে ভালো করে বুঝতে পারবে না। আমি একটি পরিবার জানি, সেখানে মনিবরা রান্না ঘরে যেতে হলে রাঁধুনির অনুমতি চেয়ে পাঠাতেন, পাছে তার কাজের মধ্যে intrude করলে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে! এই থেকে কতকটা বুঝতে পারবে। এই রকম এখানকার পরিবারে স্বাধীনতা মূর্তিমান, কেউ কাউকে প্রভুভাবে আজ্ঞা করে না ও কাউকে অন্ধ আজ্ঞা পালন করতে হয় না। এমন না হলে একটা জাতির মধ্যে এত স্বাধীনভাব কোথা থেকে আসবে? কিম্বা হয়তো আমি উলটো বলছি, একটা জাতির হৃদয়ে স্বভাবতঃ এতটা স্বাধীন-ভাব না থাকলে এমন কী করে হবে? যাদের হৃদয়ে স্বাধীনভাব নেই তারা যেমন অম্লানবদনে নিজের গলায় দাসত্বের রজ্জু বাঁধতে পারে, একটু অবসর পেলেই পরের গলায়ও তেমনি অকাতরে দাসত্বের রজ্জু বাঁধতে ভালোবাসে। আমাদের সমাজের আপাদ-মস্তক দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ। আমরা পারিবারিক দাসত্বকে দাসত্ব নাম দিই নে; কিন্তু নামের গিলটি করে আমরা বড়োজোর দাসত্বের লোহার শৃঙ্খলকে সোনার আকার ধরাতে পারি, কিন্তু তার শৃঙ্খলত্ব ঘোচাতে পারি নে, তার যা কুফল তা থেকে যায়। আমি আগে মনে করতুম যে হিন্দুদের মনে একটা সহজ স্বাভাবিক ভাব আছে, কোনো প্রকার অস্বাভাবিক বাঁধাবাঁধি আইন-কানুন নেই। কিন্তু কোন্ লজ্জায় আর তা বলব বলো। হিন্দুদের মধ্যে অস্বাভাবিক আইন-কানুন নেই? তাদের পরিবারের মধ্যে দেখো! আপনার ভাই-বোন পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে কতটা বাঁধাবাঁধি আছে একবার দেখো। ভাইয়ের প্রতি কিরকম ব্যবহার করতে হবে তা কোন্ দেশে শেখাতে হয় বলো দেখি। তবে যদি বলো যে, ভাইয়ের প্রতি পিতা বা পুত্রের মতো ব্যবহার করতে হবে, তা হলে শেখাবার

খুব আবশ্যক করে বটে,[১৮] কোনো মানুষের সহজ অবস্থায় আত্ম-প্রত্যয় থেকে ও কথা মনে আসবার কোনো সম্ভব নেই। গুরু-লোকদের কাছে বেশি কথা কওয়া বা হাসা পর্যন্ত নিষেধ। কী ভয়ানক! যাদের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা[১৯] অনবরত থাকতে হবে তাদের সঙ্গে যদি মন খুলে কথাবার্তা না কবে, প্রাণ খুলে না হাসবে, তাদের কাছেও যদি জিবের মুখে লাগাম লাগিয়ে, হাস্যোচ্ছ্বাসের মুখে পাথর চাপিয়ে আর মুখের ওপর একটা সম্ভ্রমের মুখস প'রে দিন রাত্রি থাকতে হয় তা হলে কোথায় গিয়ে আর বিশ্রাম পাবে?[২০] ইনি দাদা, উনি কাকা, তিনি মামা, এ ছোটো ভাই, ও ভাইপো, সে ভাগ্নে, কারু কাছে ভালো করে মুখ খোলবার জো নেই।[২১] কী করা যায়? বাড়ি থেকে বেরিয়ে বোসেদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে আড্ডা গাড়তে হয়, সেখানে পাঁচ জনে মিলে তামাক খাওয়া, দাবা খেলা ও হাসি তামাসা করা যায়। এ দুর্দশা কেন বলো দেখি! আফিস থেকে এসে যেমন আফিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাঁফ ছাড়া যায় তেমনি বাড়িতে প্রবেশ করেই লৌকিক ব্যবহারের খোলষ পরিত্যাগ করে মনটাকে কেন একটুখানি হাত পা ছড়াতে দেওয়া হয় না? তখনো কেন আমি স্ত্রীর সঙ্গে চুপিচুপি ফিস্ ফিস্ করে কথা কব, পাছে পাশের ঘর থেকে শ্বশুর ভাসুর বা ঐ রকম একটা কোনো মান্যবর পূজনীয় সম্পর্কের ব্যক্তি আমার স্ত্রীর গলা শুনতে পায়? স্ত্রীর গলা বা হাসি শুনলে কার কী সর্বনাশ হয় বলো দেখি। একেই কি সহজশোভন ভাব বলে? এর মধ্যে সহজ ভাবটা কোন্‌খানে বলো দেখি। বিলিতি-বাঙালিরা যে দেশে ফিরে গিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করেন ও বলেন আমাদের দেশে 'home' নেই, বিলেতেই যথার্থ 'home' আছে, তাঁরা বোধ হয় তার এই অর্থ করেন যে— বিলাতের পরিবারে একটা স্বাধীন-উচ্ছ্বাসের ভাব

আছে।[২২] বাপ-মা ভাই-বোন স্ত্রী-পুত্রে মিলে হাসি গল্প গানে অগ্নিকুণ্ডের চার ধার উচ্ছ্বাসময় করে তোলে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বাড়িতে এসে একটা উল্লাস— একটা মেশামেশির ভাব দেখতে পাওয়া যায়।[২৩] এক ঘরে শ্বশুর তাঁর দুই চারটি বৃদ্ধ বন্ধু জুটিয়ে তামাক খেতে খেতে এখনকার ছেলেপিলেদের অশাস্ত্রীয় ব্যবহারে কলির দ্রুত উন্নতির আশঙ্কা করছেন, আর-এক ঘরে বউ সাত হাত ঘোমটা টেনে তাঁর শাশুড়ির কাছ থেকে নীরবে তাঁর দৈনিক তিরস্কার সেবন করছেন, আর-এক ঘরে স্বামী তাঁর দুই-একটি যুবা বন্ধু জুটিয়ে নিন্দালাপ[২৪] করছেন —এ রকম চিত্র এখানকার কেউ কল্পনা করতে পারে না। আমাদের মুখ খোলবার জায়গা পরের কাছে। বউয়ের দুই-চারটি সমবয়সী সই আছে, তাদের কাছে অবসরমত স্বামীর ভালোবাসার গল্প করে; শাশুড়ির কতকগুলি প্রৌঢ়া প্রতিবাসিনী আছে, সকলে মিলে পাড়ার অন্তঃপুরের সুস্বাদ গুপ্ত খবরের আলোচনা করা হয়; স্বামীর কতকগুলি যুবা বন্ধু আছে তাদের সঙ্গে কালেজীয় অশাস্ত্র আলোচনা চলে; আর শ্বশুরের চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ার কতকগুলি খুড়ো ও দাদা-মহাশয়ের আমদানি হয়, ও ঐ সকল পাকা বুদ্ধিতে মিলে ইহকাল ও পরকালের অনেক কঠিন বিষয় মীমাংসা করেন। আমাদের পরিবারে পরকে আপনার করে নিতে হয়, কেননা আপনার সকলে পর।[২৫] অসদ্‌ব্যবহার বা পাপকার্যে লোকের স্বাধীনতা যত কমাও ততই ভালো, কিন্তু নির্দোষ এমন-কি উপকারজনক বিষয়ে স্বাধীনতা যত কম ছাঁটা যায় ততই ভালো। শ্বশুরে স্ত্রীর গলা শুনলে পৃথিবীর কী হানি ও নরকের কী শ্রীবৃদ্ধি হয় বলো দেখি। আপনার লোক সকলে মিলে মিশে গল্পসল্প করলে উপকার ছাড়া অপকার কী হয় বলো দেখি। অনেকে

সমাজের অনেক রকম বড়ো বড়ো সংস্কারের কথা পাড়েন, আমি একটা ছোটোখাটো পরামর্শ দিচ্ছি শোনো দেখি— আমাদের পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যজনক স্বাধীনতা সঞ্চার করে দেও দেখি, টানাটানি বাঁধাবাঁধি শাসন ও পরনির্ভরতা কমিয়ে দেও দেখি। তুমি হয়তো ভারী চটে উঠেছ; তুমি বলছ যে, 'তুমি বিলেতে কী দেখেছ শুনেছ তাই বলো, আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি; কিন্তু এ রকম যদি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করো তা হলে তো আর আমাদের ধৈর্য থাকে না।' কিন্তু তোমাকে এইখেনে বলে রাখছি, আমি এ চিঠিতে টেম্‌স্‌টানেল ও ওয়েস্ট্‌মিনিস্টর হলের বর্ণনা করতে বসি নি। বিলেতের সমাজ আদি দেখে আমার কী মনে হল ও আমার কিরকমে মত পরিবর্তন ও গঠিত হল তাই বলব। আজ আমার যে মত তোমাদের বিস্তৃত করে লিখলুম তা এখানকার সমাজ দেখে আস্তে আস্তে আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে। একটা সমাজের ভিতরে না থেকে, বাইরে থেকে তা আলোচনা করলে তার অনেক বিষয় যথার্থরূপে চোখে পড়ে; ভিতরে থাকলে খুব কম বিষয় আমাদের চোখে পড়ে, সকলই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আমার তাই একটি মহা সুবিধে, আর-একটি সমাজের সঙ্গে তুলনা করতে পারছি। তোমার নিজের মতের সঙ্গে মিলল না ব'লে তুমি হয়তো বলবে 'বিলেতে গিয়ে লোকটার মাতা ঘুরে গিয়েছে'। এ কথা বললে কোনো যুক্তি না দেখিয়ে আমার সমস্ত কথাগুলো এক তোপে উড়িয়ে দিতে পারো। কিন্তু আমি তোমাদের বিশেষ করে বলছি, বিলেতে এসে কারু যদি মাথা না ঘুরে থাকে তো সে তোমাদের এই বিনীত দাসের।

১ এ জায়গাটা ভারী গোলমেলে— ছোটো ছেলেরা ঘাড় গুঁজে বসে থাকবে এটি আমাদের দেশের কোন্ পিতা বা কোন্ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি চক্ষে দেখিতে পারে? আর, ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা বিনয় নম্রতা ও ভদ্রতা শিক্ষা না করিয়া ভদ্রসমাজে পুৎলোবাজির ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবে ইহাই বা কোন্ পিতা সভ্যতার চরম সীমা জ্ঞান করিতে পারে? আমাদের দেশের কোন্ পিতার মন এরূপ কঠিন তাহা জানি না যে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র তাঁহার কোনো কথার উত্তর না দিয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া থাকিলে তিনি মনে মনে বড়োই আহ্লাদিত হন— আহ্লাদের কারণ শুধু এই যে, পুত্রের উপর দেখো কেমন আমার প্রভুত্ব! এ-সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করিতে হইতেছে, ইহাতে হাসিও পায় কান্নাও পায়। ভা. স.

২ লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥

৩ ভালোবাসা ব্যতীত ভক্তি হতেই পারে না। ভক্তি হতে যদি ভালোবাসা উঠাইয়া লওয়া যায় তবে শুদ্ধ কেবল শাসনভয় মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ভালোবাসা পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে। দম্পতি-ভালোবাসা পুত্রকন্যার প্রতি কিছু অর্শিতে পারে না; পুত্রবাৎসল্য কিছু বন্ধুবর্গের প্রতি অর্শিতে পারে না; ভ্রাতৃসৌহার্দ্য কখনো গুরুজনের প্রতি অর্শিতে পারে না। দম্পতির ভালোবাসাকে দম্পতিপ্রেম কহে, পুত্রকন্যার প্রতি যে ভালোবাসা তাহাকে স্নেহ কহে, বন্ধুবর্গের ভালোবাসাকে বন্ধুতা সখ্য প্রণয় ইত্যাদি কহা যায়, উচ্চের প্রতি যে ভালোবাসা তাহাকে ভক্তি কহে; অতএব ভক্তি ভালোবাসা হইতে স্বতন্ত্র একটি বস্তু নহে— তবে কি-না ভক্তির ভালোবাসা প্রণয়ের ভালোবাসা নহে, স্নেহের ভালোবাসা নহে, দম্পতি-প্রেমের ভালোবাসা নহে, উহা অপেক্ষা আর একটু উচ্চ দরের ভালোবাসা। যাঁহারা কেবল যাত্রার গীতেরই মর্মজ্ঞ, উচ্চ অঙ্গের গীত তাঁহাদের কাছে গীতই নহে; তেমনি শুদ্ধ যাঁহারা কেবল সখ্যরসেরই মর্মজ্ঞ, ভক্তি তাঁহাদের চক্ষে ভালোবাসাই নহে— সখ্যকে ধরিয়া বাঁধিয়া ভক্তির সিংহাসনে বসাইলে তবেই তাঁহাদের মনঃপূত হয়। কিন্তু তাঁদের জানা উচিত যে, যাত্রার সুরে

খেয়াল ধ্রুপদ গান করা আর ভক্তিভাজন ব্যক্তির সহিত সখ্যরসের আলাপ করা উভয়ই সমান— বেসুরো, বেতালা, বেমানান— সমজদার ব্যক্তি তাহা শুনিবা মাত্র কানে হাত দেন। ভা. স.

৪ অবশ্য, শৈশবকালে এইরূপ আচরণই স্বাভাবিক, কিন্তু একজন ষোলো-বর্ষ-বয়স্ক পুত্র ওরূপ ব্যবহার করিলে সেটা অত্যন্ত বেতালা ও বেসুরো হয় কি না একবার ভাবিয়া দেখা হউক— একটু যাহার বুদ্ধি হইয়াছে সে পুত্র শুধু-শুধু কেনই বা ওরূপ করিবে! ষোলো বর্ষের বালক পিতার নিকট পাঁচ বর্ষের শিশুর ভাণ করিয়া, অথবা দম্পতিপ্রেমোচিত অধীর ভালোবাসার ভাণ করিয়া দৌড়াদৌড়ি পিতাকে আলিঙ্গন করিলে সে যে কী এক অদ্ভুত দৃশ্য হয় তাহা বর্ণনাতীত। ভা. স.

৫ গুরুজনের সঙ্গে সখ্যরসের আলাপ করা অস্বাভাবিক কি স্বাভাবিক ইহা হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করো— যিনি সর্বতোভাবে ভালো চান তাঁকে কোনোরূপে কোনো পীড়া দিতে তুমি চাও না; তুমি জানো যে তোমার কোনো বিষয়ে একটু কিছু ত্রুটি দেখিলে তাঁহার মনে যত লাগিবে এত আর কাহারও মনে লাগিবে না— এইজন্য তাঁর কাছে তুমি ভয়-ভয় করিয়া চল। ইহা নিশ্চয় জানিয়ো এরূপ ভয় ভালোবাসা হইতেই জন্মগ্রহণ করে; পুত্র যদি পিতাকে ভালো না বাসে তবেই সে তাহার পিতার মনে আঘাত দিতে কিছুমাত্র ভীত বা সংকুচিত হয় না— সুতরাং সে-তাহার-ভয় কঠোর শাসন-ভয় হওয়া দূরে থাকুক, তাহা অতি সুকোমল ভালোবাসার ভয়, সুতরাং অতি সন্তর্পণে রাখিবার সামগ্রী। বন্ধুবর্গের সহিত যখন আমরা সখ্যরসে মিলিত হই তখন আমরা অনেকটা অসংকোচ ভাবে চলা-বলা করি— কেন? না, বন্ধুরা পিতার ন্যায় আমাদের মঙ্গলের জন্য একান্ত লালায়িত নহে; বন্ধুদিগের লক্ষ্য আমোদ-প্রমোদের দিকে— আমোদ-প্রমোদের পক্ষে ঢিলাঢালা ভাব যেমন আবশ্যক মঙ্গলের পক্ষে সংযত ভাব তেমনি আবশ্যক। বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে মনের শৈথিল্য স্বভাবতঃ শোভা পায়, গুরুজন-সন্নিধানে মনের সংযত ভাব স্বভাবতঃ শোভা পায়— তা যদি না বলো তবে ভক্তি শব্দটাকে অভিধান হইতে উঠাইয়া দেও। ভা. স.

৬ ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ নয় যে এক-আধ বৎসরের ছোটো বড়ো ধর্তব্য ; এখানে এই ইংরাজি প্রবাদটি স্মরণ করা উচিত : Letter killeth but spirit giveth life। [টীকাকার-মহাশয় এই বচনটি উপদেশ না দিয়া যদি নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থন করিতেন তবে লেখকের পাঠকদের যথার্থ উপকার হইত। —লেখক।] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জন্মিতে দেখিয়াছে ; পিতা মাতা যেমন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তাহাকে সেইরূপ আদর করিয়াছে, তাহার পাঠাদি শিক্ষার সহায়তা করিয়াছে, তাহার যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয় তাহাতে সচেষ্ট হইয়াছে, বন্ধুবর্গ যেমন বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ করিতে পারিলেই পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গলের অতি অল্পই খোঁজ-খবর রাখে— জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভাব সেরূপ নহে ; কনিষ্ঠ ভ্রাতার যদি কোনো অমঙ্গলের সূত্রপাত হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমনি তাহার প্রতিবিধানের জন্য সচেষ্ট হয় ; এ-সকল আমলে না আনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলে যে 'তুমি কেবল বয়সেই জ্যেষ্ঠ', এরূপ কথাতে ভ্রাতৃভাব না ভ্রাতৃভাবের অভাব কোন্‌টি প্রকাশ পায় ? ইংরাজরা যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হুট্‌ করিয়া উড়াইয়া দেয় অথবা তাহার সহিত বয়ো-বিরুদ্ধ সখ্যভাবের কথাবার্তা কহিতে লজ্জা বোধ না করে তাই ব'লে আমাদেরও কি সেইরূপ না করিলেই নয় ? ইংরাজদিগের সভ্যতার ছোবড়া ভক্ষণ করিতে যাঁহারা ভালোবাসেন তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেও— তাঁহারা দেখেন স্বাধীনতা, শেখেন পরজাতির দাসত্ব ; দেখেন civilization, শেখেন devilization ; দেখেন স্বদেশানুরাগ, শেখেন স্বদেশের প্রতি নির্মমতা ; দেখেন দেশীয় পরিচ্ছদ, স্বদেশীয় আচার ব্যবহার, স্বদেশীয় চাল-চলন ইত্যাদি, সকলের প্রতি ন্যায়সংগত পক্ষপাত, শেখেন কী ?— না, স্বদেশীয় পরিচ্ছদের প্রতি, স্বদেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি, স্বদেশীয় সুরীতি-সকলের প্রতি ন্যায়বিরুদ্ধ বিরাগ ! ভা. স.

৭ গুরুজনের প্রতি ভক্তি-অভক্তি ও শিক্ষার সু-প্রণালী কু-প্রণালী এ দুটি বিষয় স্বতন্ত্ররূপে বিচার্য। ভা. স.

৮ আমরা আমাদের নিজের জীবনের পরীক্ষাতে দেখিয়াছি যে, লেখক

যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, যাঁহারা যথার্থ ভক্তির পাত্র তাঁহাদিগকে ভক্তি করিলে মনুষ্যের স্বাধীনতা বৃদ্ধি হয় বৈ হ্রাস হয় না। শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুজনের প্রতি, জননী জন্মভূমির প্রতি, মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্বের প্রতি যদি ভক্তি সমর্পণ না করো, তবে কাজেই চটক লাগানো মন-ভোলানো ভড়ঙ-দেখানো যা-তা তোমার চক্ষের সামনে পড়িলেই তারই কাছে ভক্তির অপব্যয় করিতে মন তোমার ধাবিত হইবে; আমি বিশেষ এক ব্যক্তিকে জানি যাহার স্বদেশের প্রতি ও গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি থাকাতেই সে এতগুলি মহাপ্রভুর দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে রক্ষা পাইয়াছে— ১ মিল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অতিবাদ ২ রঙচঙে ইংরাজী সভ্যতা ৩ হুটপেটে ইংরাজী চাল-চলন ৪ সুরুচিবিরুদ্ধ সংক্ষিপ্তসার ইংরাজী ঢঙের কোর্তা যাহা তাহারা নিজেই তাহাদের স্বদেশীয় বড়ো লোকদের প্রস্তর-মূর্তির গায়ে পরাইতে নারাজ ৫ দেশীয় ভাষার প্রতি অবহেলা ইত্যাদি।

সার কথা এই যে, গুরুভক্তি (অর্থাৎ শুভাকাঙ্ক্ষী উচ্চ উচ্চ লোকদের প্রতি ভক্তি) এবং সর্বোচ্চ ধরিতে গেলে ঈশ্বরভক্তি স্বাধীনতার প্রাণ; স্বাধীনতা হইতে ভক্তিটিকে তফাত করো, অমনি তা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইবে।

ভা. স.

৯ মস্তিষ্কের গুরুলোককে আমি মস্তিষ্কের ভক্তি করিব, হৃদয়ের গুরু-লোককে হৃদয়ের ভক্তি করিব, এ কথাটি লেখক বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন। কার্লাইলের মতের সহিত আমার মতের অনৈক্য হইলে আমি তাঁহার সহিত কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে তাঁহার মনে আঘাত লাগিবে কি না-লাগিবে তাহা আমি একবার মনেও করিব না, কিন্তু গুরুজনের সহিত কোনো বিষয়ের তর্ক করিবার সময় একেবারেই তাঁহার বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিতে মনের প্রবৃত্তিই হইবে না— ভালোবাসার রীতিই এইরূপ। যদি গুরুজন অপেক্ষা কোনো বিষয় আমি ভালো বুঝি তাই বলিয়া কি সেই ভালো-বোঝাটুকুর মূল্য এতই অধিক যে— 'এ বুদ্ধির কাছে কে বা কোথা আছে'! যদি বুদ্ধি জারি করা নিতান্তই প্রয়োজন হয় তবে তার দেশ-কাল-পাত্র আছে, তার প্রথা আছে— তর্কের অনুরোধে গুরুজনের মনে পীড়া দিতেই

হইবে, কোনো মতে ছাড়া হইবে না, কোনো দেশের কোনো শাস্ত্রে এরূপ লেখে না। ভা. স.

১০ পুত্র বড়ো ও উপযুক্ত হইলে গুরুজনেরা কখনোই তাহাকে বলপূর্বক পরিচালন করেন না। গুরুজনেরা সত্য-সত্যই কিছু এরূপ বোধশূন্য পাষাণ-অবতার নহেন যে, ছেলেপিলেদের উপর ক্ষমতা জারি করিবার জন্য তাহাদের উপর তাঁহারা প্রভুত্ব করেন; আর ছেলেপিলেরাও পেটে থেকে পড়েই কিছু এতদূর বুদ্ধিবিদ্যার বৃহস্পতি হয় না যে গুরুজনের কথা শুনিয়া চলিলে তাহাদের উপকার না হইয়া অপকার হয়— তাহার স্বাধীনবুদ্ধি খেলিতে পায় না, বুদ্ধিবৃত্তি দমনে থাকে, মন দমিয়া যায় ইত্যাদি। প্রকৃত কথাটা এই, ছোটো বালকদিগের পক্ষে শরীর-চালনা ও সামান্য স্মরণশক্তি-চালনাই যথেষ্ট, বালকদিগকে অতিশয় বুদ্ধি-চালনা শিক্ষা দিয়া তাহাদের অল্প বয়সেই প্রবীণ করিয়া তুলিলে তাহাদের মূলে আঘাত করা হয়। প্রকৃতি এইরূপ শিক্ষা দেন যে শরীরের স্ফূর্তি প্রথমে, মনের স্ফূর্তি তাহার পরে এবং বুদ্ধির স্ফূর্তি সবাকার শেষে হইলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়; এমন-কি নিউটন রাফেএল প্রভৃতি অসাধারণ লোকেরাও তাঁহাদের গুরুদিগকে দেবতুল্য (অর্থাৎ আপনা হইতে অনেক বড়ো) জ্ঞান করিতেন। আগে যাহারা শ্রদ্ধাবান ভক্তিমান আজ্ঞাকারী সাকৃরেত না হয় পরে তাহারা কখনোই ওস্তাদ হইতে পারে না— ইহা বেদবাক্য। ভা. স.

১১ এ কথাটি হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কের কথা। সম্পর্কের বড়োর সঙ্গে হৃদয়ের যেমন যোগ, জ্ঞানে ও গুণে বড়োর সঙ্গে সেরূপ হওয়া দুর্ঘট। ভা. স.

১২ পুত্র পিতার অসম্মতিতে বিবাহ করাতে পিতা তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছে— ইংলন্ডে তো সর্বদাই এরূপ ঘটিতে দেখা যায়। ভা. স.

১৩ রুগ্ন ছেলে ভিন্ন অন্য কোনো ছেলেকে আমি তো আজ পর্যন্ত শুষ্ক মলিন ধীর গম্ভীর দেখি নি। যে বয়সের যেটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম তাহা এখানেও যেমন বিলাতেও তেমনি— বিলাতে নয় ব্যাট-বল খেলে, আমাদের দেশে নয় গুলিডাণ্ডা খেলে; বিলাতে হাইড-অ্যান্ড্-সীক খেলে, আমাদের দেশে নয় লুকাচুরি খেলে— প্রভেদের এই পর্যন্ত সীমা। ভা. স.

১৪ আমাদের দেশের টোলে এইরূপ প্রথাতেই শিক্ষা দেওয়া হইত, এক্ষণকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের 'routine business' প্রণালীতে বালকদিগের মন দমিয়া যায় ইহা আমি সম্পূর্ণ শিরোধার্য করি। ভা. স.

১৫ আমাদের দেশের পাড়াগাঁ অঞ্চলেও এইরূপ দেখা যায়— লেখক শহুরে Lord-দের ঘরে স্বতন্ত্ররূপ প্রথা দেখিবেন ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। ভা. স.

১৬ লেখক এইমাত্র বলিলেন চাকর মনিবে বেশি তফাত ভাব নাই, ইহাতে বুঝায় যে তাহারা বাড়ির লোকেরই সামিল; আমাদের দেশের গৃহস্থ মানুষদের ঘরেও চাকর মনিবের মধ্যে ঐরূপ ভাব দৃষ্ট হয়— তাহার সাক্ষী চাকরানিকে ঝি বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রথা। কিন্তু চাকরদের সঙ্গে পদে পদে সম্মানসূচক ব্যবহার করা— আষ্টে-পৃষ্টে কাষ্ঠসভ্যতার ভার বহন করা— আমাদের দেশের সহজসভ্য লোকদিগের পোষায় না। গর্দভও ভার বহন করিতে ভার বোধ করে, আমরা মনুষ্য হইয়া যদি ইচ্ছাপূর্বক আপন স্কন্ধে আপনি ভার চাপাই তবে তার চেয়ে আমরা বড়ো কিসে? ভা. স.

১৭ এ-সকল কৃত্রিম সভ্যতার না আছে অর্থ, না আছে কিছু। আমাদের দেশে এরূপ মৌখিক ভদ্রতার যত কম আমদানি হয় ততই ভালো। মনে করো ছেলের জ্বর হয়েছে আর যেই তার বাপ একটা হাতপাখা তুলে নিয়ে তার গায়ে বাতাস দিতে লাগল অমনি ছেলে বলে উঠলেন 'thank you বাবা'— এরূপ কাষ্ঠসভ্যতা কাষ্ঠহৃদয়ের উপরেই গুণ করিতে পারে, সহজ হৃদয়কে আগুন করিয়া তোলে। ভা. স.

১৮ মনে করো একটি বড়ো পুত্র এবং একটি ছোটো পুত্র রাখিয়া পিতা মাতা লোকান্তর গমন করিয়াছেন, এখন ছোটোটিকে তাহার পিতা যেমন যত্ন করিতেন তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহাকে সেইরূপ যত্ন না করিলে তাহার পক্ষে তাহা কর্তব্যবিরুদ্ধ হৃদয়বিরুদ্ধ ও নিন্দনীয় হয় কি না? পিতার অবর্তমানে যাহা এইরূপ অবশ্যম্ভাবী, পিতা বর্তমানে তাহা হইলে আরও ভালো হয় কি না? যে যাহাকে পুত্রের মতো যত্ন করে তাহাকে সে পিতার মতো ভক্তি করিবে কি না? ধাত্রীকে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশু স্বভাবতই মাতার মতো এবং স্থল-

বিশেষে তাহা অপেক্ষা অধিক ভালোবাসে কি না? ধাত্রী পর হইয়াও যদি মাতার ন্যায় হইতে পারে তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপনার হইয়া কেননা পিতৃতুল্য হইতে পারিবে? বড়োর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে না তো কাহার প্রতি করিবে? ভা. স.

১৯ চব্বিশ ঘণ্টা গুরুলোকের সঙ্গে থাকলে ছেলেরা দু দিনে বুড়িয়ে যায়— কোনো ছেলেকে আজ পর্যন্ত ওরূপ করিতে দেখি নাই। ভা. স.

২০ গুরুলোকেরা শিক্ষার স্থান, ভক্তিশ্রদ্ধার স্থান— বিশ্রামের স্থান বা বিনোদের স্থান নহেন। তাঁহারা যদি বিনোদের স্থান হইবেন তবে সমবয়স্কেরা কী করিতে রহিয়াছে? ক্ষুধার জন্য অন্ন রহিয়াছে, তৃষ্ণার জন্য জল রহিয়াছে, ইহা বিস্মৃত হইয়া ক্ষুধা পাইলে যে ব্যক্তি জল খায় ও তৃষ্ণা পাইলে ভাত খায়, সেই ব্যক্তিরই কর্ম— বিনোদ-ইচ্ছা হইলে গুরুলোকের নিকট যাওয়া ও সদুপদেশ এবং উচ্চ সহবাসের ইচ্ছা হইলে সমবয়স্কদিগের নিকট যাওয়া। ভক্তিভাজন ব্যক্তির সম্মুখে মন স্বভাবতই প্রশান্ত সংযত ভাব ধারণ করে— মনঃসংযম যাহা অনেক শিক্ষার ফল তাহা আপনা-আপনি হয়, এ কিছু কম কথা নহে। ভা. স.

২১ কেন মুখ খুলিবার জো নাই? অবশ্য মুখ খুলিবার জো আছে— কেবল এলোমেলো যা-ইচ্ছা তাই বকিবার জো নাই। গুরুজনদিগের কথা-বার্তা রীতি-চরিত্র দেখিয়া শুনিয়া বালকেরা কথাবার্তা কহিতে, বসিতে, দাঁড়াইতে যত দিন না শেখে ততদিন তাহারা অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিলে আদর বৈ ভর্ৎসনা লাভ করে না এবং বালকদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চাপল্য হ্রাস পায় ও গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তিভাবের উদয় হয় —ইহা সকল দেশেই সমান। ভা. স.

২২ এইরূপ স্বাধীন উচ্ছ্বাসের ভাব দেখিবার জন্য বিলাতে যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, একজন সামান্য খৃস্টান বাঙালির ঘরেও ঐরূপ স্বাধীন উচ্ছ্বাসের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ উচ্ছ্বাস বাস্তবিক স্বাধীন উচ্ছ্বাস কিম্বা প্রবৃত্তির অন্ধ উত্তেজনা, এইটির প্রতি একটু মনোযোগ করিলে ভালো হয়। দেশকালপাত্রোচিত কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিয়া যে কার্য করা হয় তাহাই স্বাধীন নামের যোগ্য; স্বাধীন, কি-না স্ববশ। কিন্তু

স্ববশ দূরে থাকুক, আমি যখন এরূপ অবশ হইয়া পড়িয়াছি যে গুরুজনের প্রতি একটুও দৃক্‌পাত নাই, আপনার সুখেই আপনি অচেতন, তখনকার সে মূঢ় ভাবকে স্বাধীনতা বলা আর পা'কে মাথা বলা উভয়ই সমান। স্ত্রীর সহিত যেরূপ মন-খোলাখুলি করিয়া কথাবার্তা কহা যায় তাহা কি গুরুজনের শ্রুতিযোগ্য না গুরুজনেরা তাহা শুনেন ইহা কাহারও প্রার্থনীয়? স্ত্রী পুরুষদের নির্জনে কথাবার্তা কহিবার রীতি সকল দেশেই প্রচলিত আছে, কেবল আমাদের দেশে নহে। ইহার কারণ এই যে, পতিপত্নীর মধ্যে এরূপ অভেদ সম্বন্ধ যে উভয়ের মধ্যে গোপনীয় কিছুই নাই, সুতরাং পতিপত্নী নির্জনে যেরূপ কথাবার্তা কহে গুরুজন-সমক্ষে তাহারা সেরূপ কথাবার্তা কহিলে তাহাদের পতি-পত্নীত্ব ভূত-পেত্নীত্বে পরিণত হয়। পতি-পত্নী যখন গুরুজনসমক্ষে সর্বান্তঃকরণে আলাপ করিতে পারে না তখন সে জায়গায় আলাপ না করাই তো ভালো, যে জায়গায় আমি মন খুলিয়া হাসিতে না পারি সেখানে না হাসাই তো ভালো —এই-সকল সোজা বিষয়কে নানা রূপে বাঁকাইয়া তাহা কোনো জন্মে যা নয় তাই করিয়া তোলা বক্তৃতাশক্তির অপব্যবহার ভিন্ন আর-কিছুই নহে। ভা. স.

২৩ একটা গল্প মনে পড়িল— একজন সহস্রমারী দলের কবিরাজ রোগীকে দেখিতে আসিয়া তাহার ঘরের লোকদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কোনো চিকিৎসককে কি দেখানো হইয়াছিল?' তাঁহারা বলিলেন, 'অমুক চিকিৎসককে দেখানো হইয়াছিল।' কবিরাজ বলিলেন,'তিনি কী বলিয়াছেন?' তাঁহারা বলিলেন তিনি বলিয়াছেন যে, 'নাড়ীতে এখনো একটু বেগ আছে, আজকের দিন স্নানটা স্থগিত রাখিলে ভালো হয়।' কবিরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'আরে, আমি কি বলছি ওকে অষ্টপ্রহর জলে চুবিয়ে মেরে ফেল্! আর কী বললেন?' উত্তর— 'আর বলেছেন আজকের দিন ভাত না দিয়ে খই বাতাসা এমনি-সকল সামগ্রী খেতে দেওয়া হয়।' কবিরাজ বলিলেন, 'আরে, আমি কি বলছি ওকে গাণ্ডে-পিণ্ডে যা-তা খাইয়ে ওকে একেবারে শেষ করে ফেল্!' ইত্যাদি। বিলাতি শাস্ত্র বলছেন— লোকজন মিলে মিশে আমোদ করা ভালো; আরে, আমাদের শাস্ত্র কি বলছে যে,

দুজন লোককে এক ঠাঁই মিলে আমোদ করতে দেখেছ কি আর অমনি মারো লাঠি! আমাদের দেশে কি বন্ধুবর্গেরা একত্র মিলে মিশে আমোদ করে না? বাপ-মার কাছে ছেলেরা বসিয়া কি কখনও সুখের আস্বাদ পায় না? না স্ত্রী পুরুষেরা পরস্পরের সহবাসে সুখভোগ করে না? না ছেলেপিলেরা আপনাদের মধ্যে বাল্যক্রীড়া করিয়া সুখী হয় না? অপরাধের মধ্যে পতি-পত্নীরা পিতা মাতা শ্বশুর শাশুড়ির সমক্ষে পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ করে না। না করিল তাহাতে কাহার কী ক্ষতি হইল? পতিপত্নীর পরস্পর হৃদয়-বিনিময়ের কিছু ব্যাঘাত জন্মিল, না বন্ধুজনগণের আমোদের কিছু ব্যাঘাত জন্মিল, না পিতা-পুত্রের স্নেহভক্তির কোনো ব্যাঘাত জন্মিল! যাহা ঠিক, যাহা স্বাভাবিক, যাহা সভ্যোচিত, যাহা শোভন তাহাই হইল— যাহা বেঠিক বেচাল অসভ্যোচিত অশোভন তাহাই হইল না। অন্তঃপুরবাসিনীরা আপনাদের মধ্যে যেমন সখ্যরসের আলাপ করিতে পারে পুরুষদের সঙ্গে কখনোই তেমন পারে না। যেখানে পাঁচজন স্ত্রীলোকে মিলিয়া সখ্যরসের আলাপে নিমগ্ন হয় সেখানে পুরুষমানুষ গেলে তাহাদের আমোদে ব্যাঘাত পড়ে। এজন্য সখায় সখায় সম্মিলনের জন্য বহিরালয় এবং সখীতে সখীতে সম্মিলনের জন্য অন্তঃপুর সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে পরিবারের স্ত্রীলোকদের এবং পুরুষদের সম্মিলনের কোনো বাধা নাই, দুই-এক স্থলে যা বাধা আছে তাহা দেশাচারের কোটায় ফেলিয়া দেওয়া উচিত (কোন্ দেশের দেশাচার একেবারেই কুসংস্কার-বিহীন?)। 'বাধা নাই' কেবল নহে, পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের পুরুষদের মধ্যে সম্মিলনঘটনার সময়ও নির্ধারিত হইতে পারে, যেমন মধ্যাহ্নভোজনের সময় ইত্যাদি। স্ত্রীলোকেরা আপনাদের মধ্যে যেমন অসংকোচে সখ্যরসের আলাপ করিতে পারে, পুরুষদের সঙ্গে তাহারা তেমনটি পারে না বলিয়া সখ্যালাপ-স্থলে এ দেশে স্ত্রীলোকদের পুরুষদের একত্র সম্মিলনের প্রথা নাই। যদি কেবল অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পুরুষেরা সন্ধ্যাযাপন করে তবে তাহারা বাহিরের বন্ধুদিগের সঙ্গে মিলিয়া প্রকৃতপক্ষে সখ্যরস উপভোগ করিবে কখন? যদি বলো যে 'সখারা এবং সখীরা সকলে একত্রে মিলিয়া বন্ধুতালাপ করিতে হানি কী' তাহার এই উত্তর যে তাহা হইলে ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইবে যে, সখার

সঙ্গে সখার কিংবা সখীর সঙ্গে সখীর বন্ধুতা অতি নিচু-দরের বন্ধুতা— সখা-সখীর মধ্যে চখা-চখীর ভাবই আসল বন্ধুতা। তাহার সাক্ষী— বল্‌-মজলিশে পরপুরুষদের সঙ্গে নাচিবার জন্য ইউরোপবাসিনীদের মন কেমন নাচিয়া উঠে! ভা. স.

২৪ ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, নিন্দালাপই আমাদের একমাত্র আলাপ ও ইংরাজেরা সে রসে বঞ্চিত। gossiping শব্দের অর্থ তবে কী? বিবিদের সম্মিলনে নিন্দাবাদের ফোয়ারা কেমন খুলিয়া যায় তাহার একটি জাজ্বল্যমান ছবি লেখকের হস্ত দিয়া ভারতীতে পূর্বে একবার বাহির হইয়া গিয়াছে।

২৫ বিলাত থেকে ফিরে এলে অধিকাংশেরই এইরূপ দশা ঘটে।

দশম পত্র

স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে সম্পাদক-মহাশয়ের সঙ্গে আমার ঝগড়াটা নিতান্তই চলল দেখছি। কিন্তু সে তো এক প্রকার সুখেরই বিষয়। বিষয়টা গুরুতর; সে সম্বন্ধে দু পক্ষের মতামত ব্যক্ত হয়ে একটা আন্দোলন হওয়াই প্রার্থনীয়। কিন্তু কথাটা যতই গুরুতর ও সারবান হোক-না, আমার গলার দোষে মারা যায় বা! অর্থাৎ সম্পাদক-মহাশয় পাছে তাঁর অত্যুচ্চ অট্টহাস্যের প্লাবনে আমার ক্ষীণকণ্ঠের কথাগুলো একেবারে ভেঙে-চুরে উলটে-পালটে তোলপাড় করে ভাসিয়ে নিয়ে যান, কথাগুলো একেবারে পাঠকদের কানে ভালো করে না পৌঁছয়। এখেনে একটা সেখেনে একটা তাঁর ছুঁচোলো নোটের হাস্যবিষাক্ত খোঁচা খেয়ে খেয়ে আমার গরিব ভালোমানুষ মতগুলি প্রাণের দায়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দেশছাড়া হয় বা! পাঠক-মহাশয়েরা আমার কথাটা একবার অবধান করুন; আর কিছু নয়, লেখক-মহাশয় আমার কথাটা আপনাদের ভালো করে শুনতে দিচ্ছেন না। আমি একটা কথা বলতে মুখ খোলবার উপক্রম করেছি-কি, অমনি তিনি দশটা কথা কয়ে একটা ঘোরতর কোলাহল উত্থাপন করেছেন আর আমার কথাটা একেবারে মাথা তুলতে পারে নি। পাঠক-মহাশয়েরা যদি এক পক্ষের কথা শুনতে না পান ও গোলেমালে একটা ভুল বুঝে যান তবে বড়ো দুঃখের বিষয় হবে।

লেখক-মহাশয়ের নোটের বিরুদ্ধে আমার প্রধান নালিশ ছিল এই যে, আমি যে কথা বলি নি সেই কথা আমার মুখে বসানো হয়েছে। তার উত্তরে তিনি বলেন যে, 'লেখক কী ভাবে কী কথা বলিয়াছেন তাহার প্রতি তত আমাদের লক্ষ নহে যত

পাঠকেরা তাঁহার কথা কী ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহার প্রতি।' দোহাই পাঠক-মহাশয়দের, আমি এক কথা বললে আপনারা আর-এক কথা যদি শোনেন তবে আমি গরিব মারা যাই কেন? আমি যদি বলি বিশ্বম্ভর বাবুর দুই পা আর আপনাদের মধ্যে কেউ শোনেন বিশ্বম্ভর বাবুর চার পা, তা হলে যদি সম্পাদক-মহাশয় আমার চুলের ঝুঁটি ধরে বিধিমতে নিগ্রহ করেন ও দশটা শাস্ত্র থেকে প্রমাণ উদ্‌ধৃত করে দশ জন পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মত নিয়ে আমাকে দশ ঘণ্টা ধরে গম্ভীর ভাবে বোঝাতে আরম্ভ করেন যে বিশ্বম্ভর বাবুর দুই পায়ের অধিক পা হবার কোনো প্রকার সম্ভাবনা নেই— শুদ্ধ তাই নয়, তাই নিয়ে হাসি-টিটকিরি ক'রে, ঠাট্টা-মসকরা ক'রে, দশ জন ভদ্রলোকের কাছে আমাকে বিধিমতে অপদস্থ করেন যদি— তবে আমি সহ্য করি কী করে বলুন দেখি! শাশুড়িরা যে ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেন, তাতে যে অনেক সময়ে অনেক উপকার হয় সে বিষয়ে আমি দ্বিরুক্তি করি নে, কিন্তু আপনারা কি অস্বীকার করতে পারেন যে, উপকারটা বউয়ের হোক কিন্তু যদি কারু পিঠে বেদনা হয় তো সে ঝিয়েরই। আচ্ছা, ভালো— আমার পিঠ বেকার অবস্থায় পড়ে আছে আর সম্পাদক-মহাশয়ের মুষ্টির যদি আর কোনো কাজ না থাকে তবে আমার নিরীহ পিঠের ওপর যথেচ্ছাচার করুন, কিন্তু এটা যেন মনে থাকে সে কিলগুলো প্রাপ্য আপনাদের, কেবল সম্পাদক-মহাশয়ের অপূর্ব বিচারে সে কিলের ভার যিশুখৃস্টের মতো আপনাদের হয়ে সমস্ত আমাকেই বহন করতে হচ্ছে।

লেখক-মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা বিবাদ ছিল এই যে, তিনি স্বাধীনতা অর্থে বেহায়ামো, অবিনয়, অসরলতা, উচ্চের প্রতি

অ-ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অ-দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি ঠাউরেছেন কেন? তার উত্তরে তিনি যা বলেন তার ভাবটা হচ্চে এই যে, পাছে পাঠকেরা তাই ঠাউরে থাকেন এই কারণ-বশতঃ, আর কিছু নয়! কিন্তু আমার অপরাধ? 'লেখক বিলাতি বিবিদের চাল-চোল-ধরণ-ধারণের আনুষঙ্গিক-রূপে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, এজন্য বিলাতানভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকের মনে এইরূপ একটা কুসংস্কার জন্মিতে পারে যে কার্যতঃ স্ত্রীস্বাধীনতা আর কিছু নহে, কেবল বিবিদিগের চাল-চোল-ধরণ-ধারণ ইত্যাদি। ইহা একটি লোকবিখ্যাত বিষয় যে, বিবিদের shoppingএর জ্বালায়, নির্দোষ (?) আমোদাসক্তির জ্বালায়, তাহাদের স্বামীরা ধনে প্রাণে মারা যায়, অথচ স্ত্রীস্বাধীনতার একটু কোথাও পাছে আঁচড় লাগে এই ভয়ে তাঁহারা সকল অত্যাচার ঘাড় পাতিয়া লন— সকল বিষ হজম করিয়া ফেলেন।' ইত্যাদি। এর থেকে অনেক কথা উঠতে পারে। প্রথমতঃ সম্পাদক-মহাশয় তা হলে এই কথা বলেন যে, বিবিদের চাল-চোল-ধরণে অবিনয়, অসরলতা, বেহায়ামো, উচ্চের প্রতি অ-ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অ-দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ পায়; দ্বিতীয়তঃ, যেন আমি বিবিদের অবিনয় অসরলতা বেহায়ামো প্রভৃতির আনুষঙ্গিক স্বরূপেই স্ত্রীস্বাধীনতা উল্লেখ করেছিলুম। সম্পাদক-মহাশয় যে কেন বলেন, বিবিরা অবিনয়ী, অসরল, উচ্চের প্রতি তাদের ভক্তি নেই, নীচের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য নেই— তা সম্পাদক-মহাশয়ই জানেন। একমাত্র shoppingএর উদাহরণ দিয়ে তিনি ইংরেজ-মহিলাদের স্কন্ধে অতগুলো পাপের বোঝা চাপিয়েছেন। আমি ইংলন্ডে যতই বেশি দিন থেকেছি ততই সেখানকার ইংরেজ-পরিবারের মধ্যে ভালো করে মিশেছি, আমি যতদূর জানি তাতে এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি (অনেক

পাঠক-মহাশয়ের অযথা দেশানুরাগে হয়তো আঘাত লাগতে পারে) যে, সম্পাদক-মহাশয় ইংরাজ মহিলাদের প্রতি যতগুলি দোষারোপ করেছেন তার কোনোটা সত্য নয়। কোনো ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ অভিধানে যদি বিনয় অর্থে যথাসাধ্য কথার উত্তর না দিয়ে, ঘোমটা টেনে, সংকোচে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হয়ে বসে থাকা না হয় তা হলে ইংরেজ ভদ্রমহিলারা বিনয়ের আদর্শ। ইংরাজ-পরিবারের মধ্যে এমন কত শত বালিকা (আমাদের দেশের পূর্ণ-যৌবনা) দেখা যায় যারা সরলতার প্রতিমা, যারা তুষারের মতো, নিজের শুভ্র ললাটের মতো নিষ্কলঙ্ক; নিষ্কলঙ্ক অর্থে শুদ্ধ কার্যতঃ নিষ্কলঙ্ক নয়, তাদের মন বিশুদ্ধ; ছেলেবেলা থেকে তাদের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস স্ফূর্তি পেয়েছে, দাসীদের কাছ থেকে বা অসংযমনা সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে বিয়ের কথা, বরের কথা, সংসারধর্মের কথা বা কোনো রকম অসৎ কথা একটিমাত্র শোনে নি— সর্বদা হাস্যোচ্ছ্বাসময়ী। উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা যদি বল তবে তা ইংলন্‌ডে যেমন আছে এমন অন্যত্র সচরাচর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যেখেনে Carlyleকে গাড়ি চড়ে যেতে দেখলে কত শত রাস্তার লোক টুপি খুলে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটেছিল— যেখানে কোথায় Shakespeare একটা গাছ পুঁতেছিলেন, কোথায় Addisonএর একটা চৌকি আছে, সে-সমস্ত লোকে একেবারে তীর্থস্থান করে তুলেছে— যেখেনে একজন কবির পাণ্ডুলিপি, একজন খ্যাত ব্যক্তির নিজের হাতের নামসই পেলে লোকে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে— সেখেনে উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা নেই কী করে বলব? আর সেই উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা হতে সেখানকার স্ত্রীলোকেরাই যে বিশেষ বঞ্চিত এমন নয়। এ কথার উত্তর তেমন আর কিছু হতে পারে না যেমন, একটিবার বিলেতে যাওয়া।

কেননা আমি বলব 'না', সম্পাদক-মহাশয় বলবেন 'হাঁ', আবার আমি বলব 'না', আবার তিনি বলবেন 'হাঁ'— এমন করে যতক্ষণে না হাঁপিয়ে পড়া যায় ততক্ষণ হয়তো 'হাঁ' 'না' চালানো যেতে পারে। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ এ বিষয়ে সম্পাদক-মহাশয়ের আমার চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং এমন স্থলে আমার চুপ করে থাকাই শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু সম্পাদক-মহাশয়ের মতে যাই হোক, আমি কখনো বিবিদের অবিনয় অসরলতা ইত্যাদির আনুষঙ্গিকরূপে স্ত্রী-স্বাধীনতার উল্লেখ করেছি কি না সেইটি বিবেচ্য স্থল। বিলেতে নিমন্ত্রণসভায় স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলে নির্দোষ আমোদপ্রমোদ করে, একটা নতুন ভালো বই উঠলে সে বিষয়ে পরস্পর আপনাদের মতামত ব্যক্ত করে, একটা নতুন যন্ত্র উঠলে গৃহকর্তা তাই নিয়ে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে দেখান, গৃহকর্ত্রী রোমে গিয়েছিলেন, সেখানকার প্রসিদ্ধ স্থানের যে-সকল ফোটোগ্রাফ নিয়েছিলেন তাই দেখিয়ে সকলকে আমোদে রাখেন ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপলক্ষে কথায় কথায় আমি স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করি; এর থেকে যদি কোনো বিলাতানভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে থাকেন যে, shopping করাকেই স্ত্রীস্বাধীনতা বলে বা বিলাতের মহিলারা যা কিছু মন্দ-আচরণ করেন (সত্যই হোক আর জনশ্রুতিই হোক) তারই নাম স্ত্রীস্বাধীনতা, তা হলে বেয়াদবি মাপ করবেন) তাঁদের মস্তিষ্কের দোষ জন্মেছে এ কথা স্বীকার করতেই হয়।

সত্য-সত্য যা কিছু দোষ করি, একে তো তার জন্যই আমরা ইহকালে পরকালে দায়ী; কিন্তু যে দোষ করি নি তার জন্যেও যদি কৈফিয়ত দিতে হয় তা হলে সংসারের পায়ে গড় করি! সম্পাদক-মহাশয় মহা খাপা হয়ে চক্ষু রাঙিয়ে বলছেন, 'য়ুরোপ ভিন্ন আর কোথাও যে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই এমন নহে— জাপানে আছে,

বোম্বাইয়ে আছে, কিন্তু সে-সকল নিয়ে আন্দোলন করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে। সর্বদেশসম্মত স্ত্রীস্বাধীনতার বিশুদ্ধ আদর্শ নিয়ে আলোচনা করাও লেখকের উদ্দেশ্য নহে। ইংলন্ডে যেরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত তাই যা কেবল লেখকের একমাত্র আলোচ্য বিষয়, এরূপ যখন— তখন ইংলন্ডের প্রচলিত স্ত্রীস্বাধীনতা যে কী ভয়ানক বস্তু, তাহা যে শত সহস্র স্থানে নামে স্বাধীনতা কাজে স্বৈরচারিতা— লেখক সে-সকল কথার উল্লেখ না করাতে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে বিবিদের অনুকরণ করিলেই আমাদের কুলরমণীরা স্বাধীনতা-পথে বিচরণ করিতে পারিবেন।' ইংলন্ডের ধান ভানতে গিয়ে আমি জাপানের বা বোম্বায়ের শিবের গান তুলব, সম্পাদক-মহাশয় যদি কখনো এ রকম আশা করে থাকেন তা হলে বলা বাহুল্য আমার মতো প্রকৃতিস্থ লোকের কাছে সে আশা করা দুরাশা। আমি চোখে চশমা এঁটে, চাপকান প'রে, জগতের অজ্ঞানতিমির-মোচন নিতান্ত মহামূল্য মতগুলি অনুগ্রহপূর্বক পাঠকদের বিতরণ করছিলুম না; আমি বৈঠকখানায় বসে পাঠক-মহাশয়ের সঙ্গে দু দণ্ড গল্পসল্প করছিলুম। একটা গল্প থেকে আর-একটা গল্প ওঠে। একটা নিমন্ত্রণসভা বর্ণনা করে সেই সূত্রে স্ত্রীস্বাধীনতার কথা আমার মনে এল, সে বিষয়ে আমার যা-কিছু বক্তব্য ছিল সব বলে ফেললুম। আমার সে বক্তব্যের মধ্যে ইংলন্ডের স্ত্রীস্বাধীনতার উল্লেখমাত্র ছিল না, আর, সত্যের খাতিরে সম্পাদক-মহাশয়ের কাছে নিতান্ত লজ্জার সহিত স্বীকার করতে হচ্ছে, জাপানের ও বোম্বায়ের স্ত্রীস্বাধীনতা আমার মনেও আসে নি। মনে আসে নি— অপরাধ হয়েছে বটে! তা, সম্পাদকীয় বেত্রাঘাতে মনে না আসবার জন্যে যথেষ্ট শাস্তিও পেয়েছি। আচ্ছা, নাহয় এবার থেকে আমি যখনি স্ত্রীস্বাধীনতার কথা ভাবব তখনি জাপান ও বোম্বায়ের

কথা মনে করতে ভুলব না। সে কথা যাক, আমার মত হচ্ছে এই যে, বুট জুতো পরাকেও স্ত্রীস্বাধীনতা বলে না, গৌন পরাকেও স্ত্রীস্বাধীনতা বলে না, আর মটন দিয়ে রাই খেলেও স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যত্যয় হয় না। যদি কোনো পাঠক এমন বুঝে থাকেন যে, বিবিরা যা করে তাই স্ত্রীস্বাধীনতা ও সেইজন্যে আমার প্রতি মহা রুক্ষ হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁকে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এই ভুল বোঝা সম্বন্ধে যদি কারু কোনো দোষ থাকে তো সেটা তাঁর বুদ্ধির। তাঁর কানের যদি এমন একটা সৃষ্টিছাড়া রোগ হয়ে থাকে যে, যা তাঁকে বলা যায় নি তা তিনি শোনেন তা হলে সে কান-দুটো যতক্ষণে না বিশেষরূপে মেরামত করা হয় ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে আমার মতো লেখক কোনো এলাকা রাখেন না। যা হোক, আমি যদি বলি যে, ইংরাজ বিবিয়ানাকে স্ত্রীস্বাধীনতা বলে না (কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলি, জাপান-বিবিয়ানা বা বোম্বাই-বিবি-য়ানাকেও স্ত্রীস্বাধীনতা বলে না) তা হলেই বোধ করি সম্পাদক-মহাশয়ের সঙ্গে ও সম্বন্ধে আমার বিবাদটা চুকে গেল। কেননা সম্পাদক-মহাশয় একপ্রকার স্বীকারই করেছেন যে বিবিদের বিষাক্ত (!) অশোভন (!!) স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে যদি 'নির্বিষ শোভন' স্বাধীনতা লেখক প্রচার করেন তা হলে তিনি তা আদরের সহিত গ্রহণ করবেন। অনর্থক একটা ভুল বোঝার দরুন গোড়াতেই তিনি তা করতে পারেন নি। ভালো, এখন তো সব মিটমাট হয়ে গেল— তবে এখন স্বস্তিবাচন-পূর্বক স্বাগতসম্ভাষণ করে আমার মতটিকে আদরের সহিত ঘরে নিয়ে যাওয়া হোক— দরজা থেকেই হাঁকিয়ে না দেওয়া হয়।

সম্পাদক-মহাশয়ের সঙ্গে সাধারণ বিষয়ে তো এক রকম ঐক্য হল, এখন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এমনি ভালোয় ভালোয় মতের মিল

হয়ে গেলে বড়ো খুশি হওয়া যায়। সম্পাদক-মহাশয় তো বললেন 'নির্বিষ' স্ত্রীস্বাধীনতার সঙ্গে তাঁর কোনো মনান্তর নেই; এখন কাকে তিনি 'নির্বিষ স্ত্রীস্বাধীনতা' বলেন সেইটে মীমাংসা হয়ে গেলেই অধিক বক্তব্য থাকে না। সম্পাদক-মহাশয়ের লেখা দেখে বোধ হয়, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আলাপ মাত্র হওয়া তাঁর মতে প্রার্থনীয় নহে,[১] কেননা 'তাহাতে পাছে কু লোকে কু ভাবে, সু লোকে কু ভাবে ও স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়।' তা যদি হয় তা হলে বাইরের কিছু দেখবার জন্যে মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে বের হওয়াও প্রার্থনীয় নয়— কেননা পাছে তাতে করে 'কু লোকে কু ভাবে, সু লোকে কু ভাবে, ও স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পাবার কোনো কারণ ঘটে।'[২] তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তাই 'নির্বিষ' স্বাধীনতা। কেন, তাঁদের তো নিশ্বাস ফেলবার স্বাধীনতা আছে, সেটা একটা 'নির্বিষ স্বাধীনতা'; হাই তোলবার ও পান সাজবার স্বাধীনতা আছে, সেটা আর-একটা 'নির্বিষ স্বাধীনতা'; আহার করবার স্বাধীনতা আছে, যদি কেউ আড়ি ক'রে তাতে বিষ না মিশিয়ে দেয় তা হলে সেটাও একটা 'নির্বিষ স্বাধীনতা'! তা হলে তো আমাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল, আর কিছু করবার নেই। কিন্তু সেইটে গোড়ায় বললেই তো হত। এটা কিরকম হল জানো? করুণরসে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে একজন গরিবকে বলা হল, 'আমার পকেটে যা আছে, বাপু, সব তুই নে।' অথচ পকেটে একটি সিকি পয়সা মাত্র নেই। ভাগ্যি ছিল না, তাই তো এতটা করুণরসের কথা শোনা গেল। 'পাছে কু লোক কু ভাবে ও সু লোক কু ভাবে এইজন্যেই কোনো স্ত্রীলোকের কোনো পরপুরুষের সহিত মেশা অবৈধ'— এর চেয়ে অযৌক্তিক কথা সচরাচর শোনা যায় না।

এমন কী কাজ করা যেতে পারে যা কু লোকে কু না ভাবতে পারে, এমন-কি সু লোকের কু ভাবতে আটক থাকে? বলো-না কেন, আহার করা অবৈধ— দুধেতে প্রুসিক আসিড মেশানো থাকতে পারে, মাছের ঝোলে খানিকটা আফিম গোলা থাকতে পারে, আর ভাতের মধ্যে খানিকটা হোর্তেল থাকাও নিতান্ত অসম্ভব নয়। যদি সম্পাদক-মহাশয় বলতেন পরপুরুষের সঙ্গে এমন করে মেশা কর্তব্য নয় যাতে করে সাধারণতঃ প্রকৃতিস্থ লোকে স্বভাবতই কু ভাবতে পারে, সে এক স্বতন্ত্র কথা হত; কিন্তু পাছে লোকে কু ভাবে সেইজন্যে একেবারে পরপুরুষের সঙ্গে মেশাই কর্তব্য নহে এ যে বড়ো ভয়ানক কথা! যদি বলো এমন স্থলে সাবধানে আহার করা উচিত যেখানে খাদ্যে বিষ থাকবার যথার্থ সম্ভাবনা আছে, তা হলে কথাটা মানি; কিন্তু খাদ্যে বিষ থাকা অসম্ভব নয় ব'লে আহার বন্ধ করতে পরামর্শ দিলে— আর যে-কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা পালন করুন-না কেন, আমি করি নে।" পাছে 'স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়' এ সম্বন্ধেও পূর্বোক্ত কথাটা খাটে, অর্থাৎ পরপুরুষের সহিত যদি এমন করে মেশা যায় যাতে করে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পাবার সম্ভাবনা থাকে তা হলে তার থেকে হানি হতে পারে, নতুবা নয়। সম্পাদক-মহাশয় বলেন 'স্বামীর হয়তো এইরূপ একটা মাত্রা নির্ধারিত আছে যে, পরপুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের এইটুকু মেলামেশাই ভালো, তাহা অপেক্ষা বেশি ঘনিষ্ঠতা ভালো না। যে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে সেই স্ত্রী সেই মাত্রাটি অতিক্রম করিয়া স্বামীর মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হইবে না তো কে হইবে?' সত্যই তো। সচরাচর তো এমন হয়েই থাকে। jealous স্বামীরা পাছে মনে আঘাত পায় এইজন্যে তো য়ুরোপে অনেক হতভাগ্য রমণী ইচ্ছা করেই হোক বা শাসনভয়েই হোক

সমাজে মেশে না। এখানেও অনেক সময়ে তাই ঘটবে। রমণীদের জীবন পর্যন্ত যখন স্বামীর ওপর নির্ভর করে তখন স্বামীর মন জুগিয়ে চলবার জন্যে প্রাণপণ করতে, ভালোবাসায় না হোক, দায়ে পড়ে হয়। সম্পাদক-মহাশয় বলেন 'সে মাত্রা (মেলা-মেশার মাত্রা) কতটুকু স্বামীই তাহা জানে, স্ত্রী তাহা জানে না'। সে কী কথা! স্ত্রী তাহা জানে না এমনও হয়? হতে পারে, কোনো স্ত্রীবিশেষ কোনো স্বামীবিশেষের মনের ভাব ভালো করে বুঝতে পারে নি; কী করা যাবে বলো? তার জন্যে তাকে কষ্ট সইতেই হবে। কিন্তু তাই বলে চুলটা কাটতে মাথাটা কাটবে কে বলো? দু চার জনের জন্যে সকলে কষ্ট পাবে কেন? অন্তঃপুরবদ্ধ এমন তো অনেক স্ত্রীলোক আছে যারা স্বামীর মনের ভাব ভালো করে আয়ত্ত করতে পারে নি বলে পদে পদে কষ্ট পায়, তবে কি তুমি বিবাহটা একেবারে উঠিয়ে দেবে! অতএব কথা হচ্ছে এই যে, পরপুরুষের সহিত এমন করে মেশা উচিত নয় যাতে করে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায় ও সাধারণতঃ প্রকৃতিস্থ কু লোক বা সু লোকে ন্যায্যরূপে কু ভাবতে পারে। এতেও একটা 'কিন্তু' আছে। লোকের কু ও সু ভাবা অনেক সময়ে আবার দেশাচারের ওপর নির্ভর করে। একজন স্ত্রীলোক অতি ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে শাড়ি পরলে কু লোকেও কু ভাবে না, সু লোকেও কু ভাবে না, স্বামীর মনেও কু-আশঙ্কা স্থান পায় না, কিন্তু সে যদি সেই ফিনফিনে শাড়িতে দৈবাৎ ঘোমটা দিতে ভুলে যায় তা হলে কু লোকেও কু ভাবে, সু লোকেও কু ভাবে, আর স্বামীর মনেও হয়তো কু-আশঙ্কা স্থান পায়! অতএব নিরর্থক দেশাচারের পান থেকে একটু চুন খসলে যদি কু লোকে কু বা সু লোকে কু ভাবে, তা হলে সেটা গ্রাহ্য করা যাবে না। আজ

আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে খোলা গাড়িতে একটু হাওয়া খেয়ে এলুম ব'লে যদি লোকে কু বলে তা তারা বলুক, কিন্তু যদি আমার স্ত্রী কোনো এক পুরুষের বাড়িতে সমস্ত দিন বা রাত্রি যাপন করে আসে তা হলে লোকে যদি কু ভাবে তা হলে সে কু ভাবাকে যথার্থ একটু সমীহ করে চলতে হয়। সম্পাদক-মহাশয় নানা উদাহরণ প্রয়োগ করে রাজকীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে যা বললেন, সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতের ঐক্য হয়। উদ্ধত গর্বিত বিকৃত নীচস্বভাব অ্যাংগ্লো-ইন্‌ডিয়ান্‌রা আমাদের যে রকম নিচু নজরে দেখে তারা যে আপনাদের স্বজাতি-প্রচলিত গ্যালান্ট্রি আমাদের পুরস্ত্রীদের প্রতি প্রয়োগ না করবে— তা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাতে বিশেষ কী এল গেল? স্ত্রী পুত্র পরিবার সমেত লাঙুল নাড়তে নাড়তে একটা গর্বস্ফীত অ্যাংগ্লো-ইন্‌ডিয়ানের পা চাটতে যাবার প্রয়োজন কী? অধীনতার প্রতি আমাদের যে রকম অনুরাগ, খোসামোদ আমাদের যে রকম উপজীব্য হয়ে উঠেছে, তাতে হয়তো আমাদের অনেকে স্ত্রীকন্যাগণকে স্বচ্ছন্দে একজন শ্বেতবদনের কাছে নিয়ে যাবেন, যদিও হয়তো নিজের কৃষ্ণচর্ম বন্ধুর কাছে বের করতে কুণ্ঠিত হবেন! সে রকম স্থলে তাঁরা ঠেকে শিখবেন। যদি আপনাদের নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করবার বল না থাকে তা হলে নাহয় ট্রেনে প্রভৃতি যাবার সময় বন্ধসন্ধ করে নিয়ে যাবেন, অ্যাংগ্লো-ইন্‌ডিয়ান্‌দের কাছ থেকে সহস্র হস্ত দূরে থাকবেন। আমি বলি কি, আমাদের আপনাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষে পরস্পর মেলা-মেশা আলাপ-পরিচয় হোক। নিমন্ত্রণসভায় স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকুন। যেখানে নানা প্রকার বিষয় আলোচনা চলছে সেখেনে তাঁরাও যোগ দেন। এই প্রকারে সংকীর্ণস্থানবদ্ধ তাঁদের কুঞ্চিত মন বিস্তার লাভ করুক, স্বাধীন মুক্তবায়ু-সেবনে স্বাস্থ্য উপভোগ করুন।

১ ইহা কোনো কালেই আমাদের অভিপ্রেত নহে— আমরা প্রখর স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী, এই পর্যন্ত। প্রখর স্ত্রীস্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। ভা. স.

২ আমাদের দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই, সুতরাং স্ত্রীস্বাধীনতাকে কতরূপে যে মারপ্যাঁচ হইতে বাঁচাইয়া চলিতে হয় সে বিষয়েও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই, এমত স্থলে যদি 'স্ত্রী-স্বাধীনতা চাই-ই চাই' এই ভাবটি তাঁহাদের মনের ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে খেপাইয়া তোলা হয়, তবে যাঁহারা ঐ মতানুসারে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার যে-একটি ভালো আদর্শ আছে তাহা অমান্য করিয়া প্রখর স্ত্রীস্বাধীনতার দিকেই আপনাদের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি বল পৌরুষ প্রয়োগ করিবেন ইহা সম্ভব বোধ হয়; এইজন্য আমরা বলিতে চাই যে, যখনই স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে মেলামেশার কথা উত্থাপন করা হয় তখনই এই বিষয়ে পাঠককে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে, স্ত্রীস্বাধীনতা মাত্রা অতিক্রম করিলে তাহা ঘোরতর বিষাক্ত হইয়া উঠে। ভা. স.

৩ স্ত্রীস্বাধীনতা মাত্রা অতিক্রম করিলে তাহা দোষাক্রান্ত হয় ইহা লেখক স্বীকার করেন— সে মাত্রা যে কতটুকু তাহা গড়ে জনসাধারণে বিদিত আছে, তাহার কোনো বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্ভবে না। ভা. স.

একাদশ পত্র

আমরা এখন লন্‌ডন ত্যাগ করে এসেছি। লন্‌ডনের জনসমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা খেলে তা জানো? বসন্তের আরম্ভ থেকে গর্মির কিছুদিন পর্যন্ত লন্‌ডনের জোয়ার-season। এই সময়ে লন্‌ডন উৎসবে পূর্ণ থাকে— থিয়েটার, নাচ, গান, প্রকাশ্য ও পারিবারিক 'বল', আমোদ-প্রমোদে চার দিক ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেসি। ধনী লোকদের বিলাসিনী মেয়েরা রাতকে দিন করে তোলে। আজ তাদের নাচের নেমন্তন্ন, কাল ডিনারের নেমন্তন্ন, পরশু থিয়েটরে যেতে হবে, তরশু রাত্তিরে ম্যাডাম প্যাটির গান শুনতে যেতে হবে— দিনের চেয়ে রাত্তিরের ব্যস্ত ভাব। সুকুমারী মহিলা, যাঁরা দু পা চললে হাঁপিয়ে পড়েন, দুটো কাজ করলে চোখ উলটে চৌকিতে এলিয়ে পড়েন, একটু গরম হলে অবসন্ন হয়ে পাখার বাতাস খেয়ে খেয়ে সারা হন, যাঁদের সুখশান্তির জন্য শত শত মহিলা-সেবকেরা দিন রাত্রি প্রাণপণ করছেন— চৌকিটা সরিয়ে দেওয়া, প্লেটটা এগিয়ে দেওয়া, দরজাটা খুলে দেওয়া, মাংসটা কেটে দেওয়া, পাখাটা কুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি উপায়ে যাতে কুসুমসুকুমারতনু অবলাদের তিলমাত্র শ্রম স্বীকার না করতে হয় তার চেষ্টা করছেন, তাঁরা রাত্তিরের পর রাত্তির নটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত গ্যাসের ও মানুষের নিশ্বাসে গরম ঘরের মধ্যে অবিশ্রান্ত নৃত্য করছেন; সে আবার আমাদের দেশের মতো অলস নড়ে চড়ে বেড়ানো বাই-নাচের মতো নয়, অনবরত ঘুরে ঘুরে দৌড়ে বেড়ানো। একে শ্যাম্পেনের তরঙ্গ মাথায় গিয়ে আবর্ত তুলেছে, তাতে আবার এই অবিশ্রাম ঘুরপাক, এতে মহা মহা জোয়ান পুরুষের মাথা ঘোরবার কথা (পুরুষদের আবার দু রকম মাথা ঘোরে, শ্যাম্পেন ও ঘুরপাকে

বাইরের মাথা ও পার্শ্বস্থ সুন্দরী সহনর্তকীর মধুর হাসির প্রভাবে ভিতরের মাথা ঘুরে যায়) এ রকম স্থলে ললিতা বালিকারা কিরকম করে টিঁকে থাকেন আমি তাই ভাবি— এ পরিশ্রমটা তাঁদের নিজে করতে হয়, কোনো মহিলাভক্ত পুরুষ তাঁদের হয়ে নেচে দেয় না। এই তো গেল আমোদ-প্রমোদ— তা ছাড়া এই সময়ে পার্ল্যামেণ্টের অধিবেশন হয়, ব্যান্‌ডের একতান স্বর, নাচের পদশব্দ, ডিনার-টেবিলের হাস্যালাপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটা political কোলাহল লন্‌ডনের প্রাসাদারণ্য ধ্বনিত করতে থাকে। আমরা নির্জীব পররাজ্যবাসী জাতি, এখানকার political উত্তেজনা না দেখলে হয়তো বুঝতে পারি নে। রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল দলভুক্তরা প্রতি রাত্রের পার্ল্যামেণ্টের রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধের বিবরণ কী আগ্রহের সঙ্গে পড়তে থাকে (এমন-কি দোকানদার ও গাড়োয়ান পর্যন্ত), এক-একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে কত সভার সৃষ্টি হয় ও কত তুমুল সংগ্রাম বাধে, conservative ও liberalরা দুই পক্ষেই দুই পক্ষের দুর্বল স্থান কী যত্নের সঙ্গে দিনরাত্রি অনুসন্ধান ও আক্রমণ করছে —সে ভাব আমাদের উত্তেজনাশূন্য ঝিমন্ত দেশে দুই প্রহরের রৌদ্রে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে হাই তুলতে তুলতে কল্পনা করা একেবারে অসম্ভব। seasonএর সময় লন্‌ডন এই রকম নানা প্রকার উত্তেজনায় সরগরম থাকে। তার পরে আবার ভাঁটা পড়তে আরম্ভ হয়, লন্‌ডনের কৃষ্ণপক্ষ আসে। তখন লন্‌ডনের আমোদ কোলাহল বন্ধ হয়ে যায়, লোকজন চলে যায়, কেবল অল্পস্বল্প লোক, যাদের শক্তি নেই বা দরকার আছে, বা বাইরে যাবার ইচ্ছে নেই, তারাই লন্‌ডনে পড়ে থাকে। যখন লন্‌ডনে season নয় তখন লন্‌ডন থেকে চলে যাওয়া একটা fashion। আমি একটা বইয়ে (*Sketches and Travels in London*: Thackeray)

পড়েছিলুম যে, এক পরিবার বাড়ির সুমুখে দরজা জানলা সব বন্ধ করে বাড়ির পেছন দিকের ঘরে লুকিয়ে-চুরিয়ে বাস করত, তার কারণ, অন্য লোকেরা তা হলে মনে করবে যে seasonএর সঙ্গে সঙ্গে তারা লন্‌ডন ছেড়ে চলে গেছে। season ফুরিয়ে গেলে লন্‌ডনে মুখ দেখাতে হয়তো অনেকের লজ্জা করে, সুতরাং লন্‌ডন শূন্যপ্রায় হয়ে আসে। South Kensington বাগানে যাও—ফিতে, টুপি, পালক, রেশম, পশম ও গাল-রঙ-করা-মুখের সমষ্টিরা চোখ ঝলসে প্রজাপতির ঝাঁকের মতো বাগান আলো করে বেড়াচ্ছে না; মহা মহা সুন্দরীরা অশ্ব ও রথের উপর থেকে পদাতিকদের প্রতি কটাক্ষের শতঘ্নী বর্ষণ করছেন না; কুঞ্জচ্ছায়ায় প্রণয়ীযুগল ফুস্ ফুস্ করে কথা কইতে কইতে আপনাদের তুলনায় পৃথিবীর আর-সকল লোককে হতভাগ্য মনে করছে না; বাগান তেমনি সবুজ আছে, সেখেনে তেমনি ফুল ফুটছে, কিন্তু তার জীবন্ত শ্রী চলে গিয়েছে। গাড়ি ঘোড়া লোকজনের হিজিবিজি ঘুচে গিয়ে লন্‌ডনটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সম্প্রতি লন্‌ডনের season ভেঙে গেছে, আমরাও লন্‌ডন ছেড়ে Tunbridge Wells বলে একটা পাড়াগাঁর মতো জায়গায় এসেছি। অনেক দিনের পর পাড়াগাঁয়ের বাতাস খেয়ে বাঁচা গেল। লন্‌ডনের বাতাসের মতো বাতাস কোথাও দেখলুম না। হাজার হাজার chimney অর্থাৎ ধূমপ্রণালী থেকে অবিশ্রান্ত পাথুরে কয়লার ধোঁওয়া ও কয়লার গুঁড়ো উড়ে উড়ে লন্‌ডনের বাতাসের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করেছে। দু দণ্ড লন্‌ডনের রাস্তায় বেড়িয়ে এসে হাত ধুলে সে হাত-ধোওয়া জলে বোধ করি কালীর কাজ করা যায়, কয়লার গুঁড়োয় বাতাস এমন ভরপুর। নিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্রান্ত কয়লার গুঁড়ো টেনে মাথায় এক-স্তর কয়লা জমে

যায়; মাথার ঘিয়ে ও কয়লার গুঁড়োয় মাথাটাও বোধ হয় অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক দিনের পরে এখানকার সূক্ষ্ম বাতাস টেনে লন্‌ডনের ভারগ্রস্ত বাতাসের প্রভেদ বুঝতে পারছি। Tunbridge Wells অনেক দিন থেকে তার লৌহপদার্থ-মিশ্রিত স্বাস্থ্যকর উৎসের জন্যে বিখ্যাত। এই উৎসের জল খাবার জন্যে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। আমরা এখেনে এসে কল্পনা করলেম— উৎসটা না জানি কী সুন্দর দৃশ্য হবে— চার দিকে পাহাড় পর্বত গাছপালা থাকবে, 'সারসমরালকুলকূজিত কনককমলকুমুদকহ্লারবিকসিত সরোবর' 'কোকিলকূজন' 'মলয়-বীজন' 'ভ্রমরগুঞ্জন' দেখতে ও শুনতে পাব, ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে বসন্তসখা পঞ্চশরের প্রহার খেয়ে ও এক ঘটি জল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসব! ও হরি! গিয়ে দেখি, একটা হাটের মধ্যে একটা ছোটো গর্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো, সেখেনে একটু একটু করে জল উঠছে, একটা বুড়ি একটা কাঁচের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে!— একটা বুড়ি!— একটি গজেন্দ্রগমনা বিম্বোষ্ঠী কম্বুকণ্ঠী শুকচঞ্চুনাসা কেশরীমধ্যা কোকিলভাষিণী মধুরহাসিনী বিলাসিনী ষোড়শী নলিনীপত্রের ঠোঙা হাতে করে দাঁড়িয়ে নেই ('ঠোঙা' কথাটা বড়ো গ্রাম্য হয়ে পড়ল, ওর সংস্কৃতটা কী?)— একটা গাউন-জুতো-পরা বুড়ি এক এক পেনি নিয়ে কাঁচের গেলাসে করে জল বিতরণ করছে ও অবসর-মতে একটা খবরের কাগজে গত রাত্রের পার্ল্যামেন্টের সংবাদ পড়ছে। চার দিকে দোকান বাজার, গাছপালার কোনো সম্পর্ক নেই; সুমুখেই একটা কশাইয়ের দোকান, সেখেনে নানা চতুষ্পদ ও দ্বিপদের মধ্যে 'হংসমরালকুলের' ডানা-ছাড়ানো মৃতদেহ দড়িতে ঝুলছে; এই-সব দেখে আমার মন এমন চটে উঠল যে আমার কোনো

মতে বিশ্বাস হল না যে, এ জল খেলে আমার কোনো প্রকার রোগ নিবারণ হবে বা শরীরের কোনো প্রকার উন্নতি হবে।

Tunbridge Wells কতকটা পাড়াগাঁয়ের মতো। এটা একটা পাহাড়ে জায়গা। এখেনে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এখানকার আকাশ মুখ-গোঁ-করা নয়, বাড়িগুলো অনাতিথ্যভাবসূচক নয়, পথিকদের মুখ ঘোরতর ব্যস্তভাবময় নয়, রাস্তাগুলো ঘর্ঘরধ্বনিত পাষাণহৃদয় নয়। আসল শহরটা খুব ছোটো, দু পা বেরোলেই গাছপালা মাঠ জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়। শহরটা অবিশ্যি কতকটা লন্‌ডনের ছাঁচে গড়া। বাড়িগুলো লন্‌ডনের মতো থাম-বারন্দা-শূন্য, ঢালু-ছাত-ওয়ালা সারি সারি একঘেয়ে ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে; অত্যন্ত শ্রীহীন দেখতে। দোকানগুলো তেমনি সুসজ্জিত, পরিপাটী, কাঁচের-জানলা-দেওয়া। কাঁচের ভিতর থেকে সাজানো পণ্যদ্রব্য দেখা যাচ্ছে; কসাইয়ের দোকানে কোনো প্রকার কাঁচের আবরণ নেই, চতুষ্পদদের আস্ত আস্ত শ্রীচরণ ঝুলছে— ভেড়া গোরু শুয়োর বাছুরের নানা অঙ্গ নানা প্রকার ভাবে চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে, হাঁস প্রভৃতি নানা প্রকার বিচিত্র মরা পাখি লম্বা লম্বা গলাগুলো নীচের দিকে ঝুলিয়ে আছে, আর খুব একটা জোয়ান ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তি হাতে একটা প্রকাণ্ড ছুরি নিয়ে কোমরে একটা আঁচলের মতো কাপড় (apron) ঝুলিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বিলেতের ভেড়া গোরুগুলো তাদের মোটাসোটা মাংস-চর্বি-ওয়ালা শরীরের জন্যে ও সুস্বাদের জন্য বিখ্যাত, যদি কোনো মানুষ-খেগো সভ্য জাত থাকত তা হলে বোধ হয় বিলেতের কসাইগুলো তাদের হাটে অত্যন্ত মার্ঘি দামে বিকোত। আমি একটা কসাই রোগা দেখি নি, এমন জোয়ান মোটা ভীষণাকার জানোয়ার খুব অল্প আছে। এখানকার

কসাইয়ের দোকানগুলো দেখলে আমার গা শিউরে ওঠে, এখানকার সূক্ষ্মস্নায়ুবিশিষ্ট বিবিরা এ দৃশ্য কী করে সহ্য করেন বলতে পারি নে। অনেক বিবি ইচ্ছে করে বাজার করতে আসেন। ফলের দোকানে বা তরকারীর দোকানে শখ করে বাজার করতে পারা যায়; কিন্তু কসাইয়ের দোকানের মতো অমন নিষ্ঠুর জায়গায় ভদ্রলোকদের কোমলহৃদয়া মেয়েরা কী করে সাধ করে আসেন আমি তাই ভাবি— সকলই অভ্যেস। একজন বিবি বলেন যে, কসাইয়ের দোকান দেখলে তাঁর বেশ তৃপ্তি হয়; তাঁর মনে হয় যে, দেশে আহারের অপ্রতুল নেই, দেশের পেট ভরবার মতো খাবার প্রচুর আছে, দুর্ভিক্ষের কোনো সম্ভাবনা নেই। ইংরেজদের খাবার টেবিলে যে রকম আকারে মাংস এনে দেওয়া হয় তাতেও কেমন অহৃদয়তা প্রকাশ পায়। কেটে কুটে মসলা দিয়ে মাংস তৈরি করে এনে দিলে এক রকম ভুলে যাওয়া যায় যে, একটা সত্যিকার জন্তু খেতে বসেছি; কিন্তু মুখ-পা-বিশিষ্ট একটা আস্ত প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে একটা জীবন্ত প্রাণীর মৃতদেহ খেতে বসেছি বলে গা কেমন করতে থাকে। কশাইয়ের দোকানের ওপর অনেক কথা বললুম, কেননা বিলেতে এসে অবধি আমার ঐটের ওপর অত্যন্ত ঘৃণা আছে— সেই ঝাল ঝাড়তে গিয়ে কথাটা অত্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ল। নাপিতের দোকানের জানলায় নানা প্রকার কাঠের মাথায় নানা প্রকার কোঁকড়ানো পরচুলো বসানো রয়েছে, দাড়ি গোঁফ ঝুলছে, শত শত মার্কা-মারা শিশিতে টাক-নাশক চুল-উঠে-যাওয়া-নিবারক শত প্রকার অব্যর্থ ওষুধ রয়েছে, দীর্ঘকেশী মহিলারা এই দোকানে গেলে সেবকেরা (সেবিকা নয়) তাঁদের মাথা ধুয়ে দেবে, চুল বেঁধে দেবে, চুল কুঁকড়ে দেবে— এবং এই রকম নানা প্রকার

বাহার করে দিতে পারে। এখেনে মদের দোকানগুলোই সব চেয়ে জমকালো দেখতে, সন্ধের সময় সেগুলো আলোয়-আলোয়-আলাকীর্ণ হয়ে যায়; বাড়িগুলো প্রায় প্রকাণ্ড হয়; ভিতরটা খুব বড়ো ও সাজানো ও খদ্দেরের ঝাঁক দোকানের বাইরে ও ভিতরে সর্বদাই, বিশেষতঃ সন্ধেবেলায়, লেগে থাকে। দরজীর দোকানও মন্দ নয়। নানা ফেশানের কোট প্যাণ্টলুন কাঁচের জানলার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে, বড়ো বড়ো কাঠের মূর্তিকে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মেয়েদের কাপড়-চোপড় এক দিকে সাজানো; সে-সকল নানা প্রকার সাজসজ্জা টুকরো-টাকরা আমার মতো একজন বিদেশী bachelorএর কাছে ঘোরতর রহস্য, তার মধ্যে দন্তস্ফুট করা আমার সাধ্য নয়— এইখানে যে কত লুব্ধ নেত্র দিন রাত্রি তাকিয়ে আছে তার সংখ্যা নেই, সাজসজ্জার দিকে সকল দেশের মেয়েদেরই সমান টান। এখানকার বিলাসিনীরা, যাদের নতুন ফেশানের দামী কাপড় কেনবার টাকা নেই, তারা দোকানে এসে দামী কাপড়গুলো ভালো করে দেখে যায়; তার পরে বাড়িতে গিয়ে সস্তায় নিজের হাতে তৈরি করে। এখানকার দোকান-বাজার-গুলো এই রকম লন্‌ডনের ছাঁচে তৈরি। আমাদের বাড়ির কাছে একটা খোলা পাহাড়ে জায়গা আছে, সেটা common অর্থাৎ সরকারী জায়গা; চার দিক খোলা, বড়ো গাছ খুব অল্প, ছোটো ছোটো গুল্মের ঝোপ ও ঘাসে পূর্ণ, চার দিক সবুজ, বিচিত্র গাছপালা নেই বলে কেমন ধূ ধূ করছে, কেমন বিধবার মতো চেহারা, উঁচু নিচু জমি, কাঁটাগাছের ঝোপঝাপ— জায়গাটা আমার বেশ লাগে। মাঝে মাঝে এই রকম কাঁটাখোঁচা এবড়ো-খেবড়োর মধ্যে এক-এক জায়গায় এক রকম ছোটো ছোটো নীল ফুল ঘেঁষাঘেঁষি ফুটে সবুজের মধ্যে স্তূপাকার নীল রঙ ছড়িয়ে রেখেছে; কোথাও বা

ঘাসের মধ্যে সাদা সাদা ডেজি ও হলদে বাটার-কপ এক রাশ ফুটে রয়েছে— চার দিকে এই রকম একটা অমুর্বর সৌন্দর্য প্রকাশ পাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝোপঝাপের মধ্যে ও গাছের তলায় এক-একটা বেঞ্চি রয়েছে, এইটে সাধারণের বেড়াবার জায়গা। কী ভাগ্যি গাছপালা বসিয়ে এটা বাগান করে তোলা হয় নি, 'আশ্রম-বাসিনী' প্রকৃতিকে সাজিয়ে-গুজিয়ে 'শুদ্ধান্তযোগ্যা' করে তোলা হয় নি। এখানে মানুষ এত অল্প ও জায়গা এত বড়ো যে মানুষের ঘেঁসাঘেঁসি নেই, লন্ডনের বড়ো বড়ো বেড়াবার বাগানের মতো যে দিকে চাই সেই দিকেই ছাতা-হস্ত টুপি-মস্তক চোক-ধাঁধক ভিড়ের চার দিক থেকে আনাগোনা নেই; দূর-দূর বেঞ্চির মধ্যে নিরালা যুগলমূর্তি রোদ্দুরে এক ছাতার ছায়ায় বসে আছে; কিম্বা হাত ধরা-ধরি করে নিরিবিলি বেড়াচ্ছে, পাছে পাশের লোক শুনতে পায় বলে গলা নাবিয়ে কথা কইতে হচ্ছে না কিম্বা প্রাণ খুলে হাসির ব্যাঘাত হচ্ছে না। যাঁরা বলেন গাছ-পালা লতা-পাতা ঘাস-গুল্ম কেবল ছাগল-গোরুদের কাছেই আমোদজনক, আরক্তকপোল আকর্ণচক্ষু আকুঞ্চিতকুন্তলের দিকেই যাঁদের আন্তরিক টান, তাঁরাও যে এখেনে এসে নিতান্ত নিরাশ হবেন তা নয়; তাই বলছি সব-সুদ্ধ জড়িয়ে common জায়গাটা খুব উপভোগ্য। এখনও গর্মিকাল শেষ হয় নি। এখেনে গর্মিকালে সকাল ও সন্ধে অত্যন্ত সুন্দর। গর্মির পূর্ণযৌবনের সময় রাত দুটো-তিনটের পরে আলো দেখা দিতে আরম্ভ করে, চারটের সময় রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে ও রাত্রি নটা-দশটার আগে দিনের আলো নেভে না। আমি একদিন ৫টার সময় উঠে commonএ বেড়াতে গিয়েছিলুম। উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর একটা গাছের তলায় গিয়ে বসলুম, দূরে ছবির মতো শহর দেখা যাচ্ছে, একটি লোকও তখন ওঠে নি, একটুও কোয়াশা

নেই, চার দিক অত্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ঘুমন্ত শহরটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তার নির্জন রাস্তাগুলি, গির্জের উন্নত চূড়া, রৌদ্ররঞ্জিত বাড়িগুলি নীল আকাশের পটে যেন একটি অতি স্পষ্ট ছবির মতো আঁকা। খুব ভালো লাগছে বটে, কিন্তু ভালো লাগার প্রধান কারণ হচ্ছে— একটা শহরের ঘুমন্ত ভাব কল্পনা করা। একটা ঘুমন্ত গ্রামের চেয়ে একটা ঘুমন্ত শহরের গাম্ভীর্য আছে; পরিশ্রম নড়াচড়া ও যুঝাযুঝি ব'লে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য অসহায় শিশুটির মতো ঘুমিয়ে আছে, তার কপাল থেকে ভাবনার ভ্রূকুঞ্চন মিলিয়ে গেছে; মুখের একটা দৃঢ়ভাব চলে গিয়েছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়েছে। দিনের বেলায় আফিসের মূর্তিতে যাকে খারাপ দেখাচ্ছিল এই ঘুমন্ত অবস্থায় তার মুখেই একটু সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে দেখে আমার ভালো লাগে, নইলে আসলে এই শহরটা কিছুই ভালো দেখতে নয়— এখানকার বাড়িগুলো আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে। জানলা-কাটা-কাটা চারটে দেয়াল, একটা ঢালু ছাত ও তার ওপরে ধোঁওয়া বেরোবার কতকগুলো কুশ্রী নল হচ্ছে এখানকার বাড়ির বাহ্য আকার— এ আর কী ভালো দেখাবে বলো। ক্রমে ক্রমে যতই বেলা হতে লাগল শত শত chimney থেকে অমনি ধোঁওয়া বেরোতে লাগল, ধোঁওয়াতে ক্রমে শহরটা অস্পষ্ট হয়ে এল। রাস্তায় ক্রমে মানুষ দেখা দিলে, গাড়ি ঘোড়া বেরোতে আরম্ভ হল, হাতগাড়ি কিম্বা ঘোড়ার গাড়িতে করে দোকানিরা মাংস রুটি তরকারি বাড়িতে বাড়িতে বিতরণ করে বেড়াতে আরম্ভ করলে (এখানে দোকানিরা বাড়িতে বাড়িতে জিনিসপত্র দিয়ে আসে), ক্রমে commonএ লোক জমতে আরম্ভ হল— আমি বাড়ি ফিরে এলেম।

আমার এখানে একটি সাধের বেড়াবার জায়গা আছে, আমি

সেখেনে রোজ বিকেলে বেড়াতে যাই। সেটা একটা পাড়াগাঁর রাস্তা, পাথর দিয়ে বাঁধানো কিম্বা খুব সমতল করা নয়, গাড়ির চাকার দাগে এবড়ো-খেবড়ো উঁচুনিচু পাহাড়ে রাস্তা, দুধারে blackberry ও ঘন লতাগুল্মের বেড়া, বড়ো বড়ো গাছে ছায়া করে আছে, রাস্তার আশে পাশে ঘাস উঠেছে ও ঘাসের মধ্যে daisy প্রভৃতি বুনো ফুল ফুটে আছে, পাড়াগাঁয়ের ছোটোলোকেরা ধুলো-কাদা-মাখানো ময়লা কোট প্যাণ্টলুন ও ময়লা মুখ নিয়ে আনাগোনা করছে (বর্ণনার এ অংশটা বড়ো romantic হল না), ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলো তাদের লাল লাল ফুলো ফুলো মুখে বাড়ির দরজার বাইরে কিম্বা রাস্তায় খেলা করছে— এমন মোটাসোটা গোলগাল ছেলে কোনো দেশে দেখি নি। তাদের গাল-দুটোর অযথা প্রাদুর্ভাবে নাক ও চোখ নিতান্ত হীন অবস্থায় উপত্যকার অন্ধকারে পড়ে আছে, হাত-পা-গুলো অত্যন্ত মোটা, গাল দুটো অত্যন্ত লাল— এক-একটা জীবন্ত মাংসের ঢিবি আর-কি। এক-একটা বাড়ির কাছে ছোটো ছোটো পুকুরের মতো আছে, সেখেনে পোষা হাঁসগুলো ভাসছে; মাঠগুলো যদিও পাহাড়ে উঁচু-নিচু, কিন্তু চষা জমি— এমন সমতল ও পরিষ্কার যে আমাদের দেশের কোনো সমভূমিতে এমন দেখি নি। ঘাসগুলো অত্যন্ত সবুজ ও তাজা, এখানে রৌদ্র তেমন তীব্র নয় বলে ঘাসের রঙ আমাদের দেশের মতন হেজে যায় না; তাই জন্যে এখানকার মাঠের দিকে চেয়ে থাকতে অত্যন্ত ভালো লাগে, অজস্র সবুজ রঙে চোখ যেন ডুবে যায়, উঁচুনিচু পাহাড় যতদূর দেখা যাচ্ছে ঘাসের সবুজ প্লাবনে প্লাবিত। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো গাছ ও সাদা সাদা বাড়িগুলো দূর থেকে ছোটো ছোটো দেখাচ্ছে, এই রকম শূন্য মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে এক-একটা প্রকাণ্ড পাইন

(pine, কেলু) গাছের অরণ্য পাওয়া যায়, ঘেঁসাঘেঁসি pine গাছে অনেক দূর জুড়ে অন্ধকার করে আছে— সে খুব গম্ভীর দেখতে। বাড়িগুলো আমাদের দেশের কুঁড়েঘরের মতো গরিবানা ও গাছ-পালা ঘাস মাঠের মধ্যে থাকবার উপযুক্ত সুন্দর দেখতে না— সোজা, খাড়া, পরিপাটি দোতালা বাড়ি, বাস করতে খুব আরামের বটে, কিন্তু গাছপালার মধ্যে দেখতে ভালো লাগে না, তবে এক-একটা বাড়ি আপাদমস্তক লতা ও ফুলে ঢেকে গিয়ে খুব ভালো দেখতে হয়েছে।

বর্ণিমা নিয়ে আর বেশি বকাবকি করব না। তুমি হয়তো এতক্ষণ মনে করছ যে, 'এ ব্যক্তি কোথা থেকে আকাশ-থেকে-পড়া গোটাকতক কথা পেড়ে তাই নিয়ে অনর্গল বকে যেতে লাগল। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে নি, কেউ জানতে চায় নি, অথচ গায়ে পড়ে ধরে-বেঁধে কতকগুলো লম্বাচৌড়া information দিতে আরম্ভ করলে।' যা হোক, এখন আমি ছেড়ে দিলুম তুমি কেঁদে বাঁচ

দ্বাদশ পত্র

গর্মি কাল। আজ অতি সুন্দর সূর্য উঠেছে। এখন দুপর দুটো বেজেছে। আমাদের দেশের শীতকালের দুপর বেলাকার বাতাসের মতো বেশ একটি মিষ্টি বাতাস বইছে, রোদ্দুরে চার দিক ঝাঁ ঝাঁ করছে। এমন ভালো লাগছে, আর এমন একটু কেমন উদাস ভাব মনে আসছে যে কী বলব। মনের sentimental অবস্থায় যে-যে লক্ষণ হয়ে থাকে তা আমার সব হয়েছে, যথা— নিশ্বাস পড়ছে, একটু চুপচাপ হয়ে আছি, মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে গেছে

ইত্যাদি। কিন্তু আজকের রোদ্‌দুরে, গরমে, চার দিকের গাছ-পালায়, বসন্তের বাতাসে, পাখির ডাকে, যদি আমার এ রকম ভাব হয়ে থাকে তা হলে কি 'লোকটা দেখছি নিতান্তই কবি হয়ে গিয়েছে' ব'লে আমার একটা বদনাম হবার সম্ভাবনা আছে? দেশে যদি আমার 'কান্ত' থাকত তা হলে আজ হয়তো এই দুরন্ত বসন্তে একান্ত প্রাণান্ত ও 'অন্ত'-অক্ষর-বিশিষ্ট আরও অসংখ্য ঘটনা ঘটত। এ দেশে 'বসন্ত' ব'লে বাস্তবিক একটা পদার্থ আছে। আমাদের দেশে বসন্ত নেই, কেবল বসন্ত বসন্ত বসন্ত* করে বিরহীগুলো ভারী গোলমাল করে— বলে, মলয় বাতাসে তাদের গা দগ্ধ হয়! আরে, হবে না কেন? সে চৈত্রি মাসের মলয় বাতাসে সহজ মানুষের গা পুড়ে যায়, তাদের তো তবু অনেক দিনকার একটা বাঁধা দস্তুর আছে! সেই বিরহীগণ একবার এখানে আসুন দেখি— দেখি কেমন করে চন্দন আর পঙ্ক মাখেন, আর নলিনীপত্রের বাতাস খান!

আমরা এখন Devonshireএর অন্তর্গত টর্কী (Torquay) বলে একটা নগরে আছি। এমন সুন্দর জায়গা আমি কখনও দেখি নি। সমুদ্রের ধারে। চার দিকে পাহাড়। অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কোয়াশা নেই, অন্ধকার নেই— চারি দিক হাস্য-ময়। চারি দিকে সবুজ বর্ণ, চারি দিকে গাছপালা, চারি দিকে পাখি ডাকছে, ফুল ফুটছে। যখন Tunbridge Wellsএ ছিলুম তখন ভাবতুম, এখেনে যদি মদন থাকে তবে সে ব্যক্তি তার ফুলশর তৈরি করবার জন্যে এত ফুল পায় কোথা? অনেক বনবাদাড় ঝোপঝাপ কাঁটাগাছ হাৎড়ে দু-চারটে বুনো ফুল নিয়েই কাজ চালাতে হয়। কিন্তু Torquayতে মদন যদি গ্যাট্‌লিঙের কামানের মতো এমন একটা বাণ উদ্ভাবন করে থাকে যার থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা করে তীর ছোঁড়া যায়, আর সেই বাণ দিন

রাত যদি কাজে ব্যস্ত থাকে, তবু মদনের ফুলশরের তহবিল এখেনে দেউলে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই— এত ফুল! যেখানে সেখানে পথে ঘাটে ফুল। ফুল মাড়িয়ে চলতে হয়। আমরা রোজ পাহাড়ে বেড়াতে যাই। গোরু চরছে, ভেড়া চরছে। এক-এক জায়গায় রাস্তা এত ঢালু যে, উঠতে নাবতে কষ্ট হয়। এক-এক জায়গা খুব সংকীর্ণ পথ, দু ধারে গাছ উঠে আঁধার করে আছে, ওঠবার সুবিধের জন্যে জায়গায় জায়গায় ভাঙা ভাঙা সিঁড়ির মতন আছে, পথের মধ্যেই লতাগুল্ম উঠেছে, ফুল ফুটে রয়েছে। চার দিকে এমন মধুর রোদ্দুর (হাসছ কী! রোদ্দুর মধুর হতে পারে কিনা এখেনে এসে একবার দেখে যাও দিকি!)— এত অগণ্য ফুল যে মনের মধ্যে বসন্ত জেগে ওঠে, মলয় বাতাস বইতে থাকে। এখানকার বাতাস বেশ গরম! ভারতবর্ষ মনে পড়ে। এইটুকু গরমেই লন্‌ডনের প্রাণীদের চেয়ে এখানকার জীবজন্তুদের কত নির্জীব ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘোড়াগুলো আস্তে আস্তে যাচ্ছে, মানুষগুলোর তেমন ভারী ব্যস্ত ভাব নেই, গড়িমসি করে চলেছে। আমি আজ কাল এমন আলস্যচর্চায় ব্যস্ত আছি যে তোমাদের একটু ভালো করে চিঠি লেখবার সময় পেয়ে উঠি নে। দিনের মধ্যে তিন শো হাই উঠছে, এক-একটা বই খুলছি ও তার ওপরে আধ ঘণ্টা চোখ বুলিয়ে দু ঘণ্টা চোখ বোজবার বন্দোবস্ত করে নিচ্ছি, দোয়াতে কলম ডুবিয়ে কালী তুলে লেখা সমুদ্রমন্থনের মতো একটা ঘোরতর ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে, চোখের পাতা ফেলতে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পরিশ্রম বোধ হচ্ছে। তুমি এখেনে এলে বড়ো আরামেই থাকো। এখানকার মতো দৃশ্য, নদীর ধার, মাঠ, পড়বার বই, গল্প করবার সময়, গান করবার নির্জনতা, পরনিন্দা করবার অবসর আর যদি কোথাও আছে!

এখানকার সমুদ্রের ধার আমার বড়ো ভালো লাগে। যখন জোয়ার আসে তখন সমুদ্রতীরের খুব প্রকাণ্ড পাথরগুলো জলে ডুবে যায়, তাদের মাথা বেরিয়ে থাকে। খুব ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো দেখায়। জলের ধারেই ছোটো বড়ো কত পাহাড় উঠেছে। ঢেউ লেগে লেগে পাহাড়ের নীচে সব গুহা তৈরি হয়ে গেছে, যখন ভাঁটা পড়ে যায় তখন আমরা এক-এক দিন এই গুহার মধ্যে গিয়ে বসে থাকি। বেশ নির্জন। সুমুখে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। গুহার মধ্যে জায়গায় জায়গায় অতি পরিষ্কার একটু-একটু জল জমে রয়েছে, ইতস্ততঃ সমুদ্রউদ্ভিদ (seaweeds) পড়ে রয়েছে, সমুদ্রের এক রকম স্বাস্থ্যজনক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, চার দিকে পাথর ছড়ানো আছে। আমরা সবাই মিলে এক-এক দিন সেই পাথর-গুলো ঠেলাঠেলি করে নড়াবার চেষ্টা করি, নানা শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি। এক-একটা পাহাড় সমুদ্রের জলের ওপর খুব ঝুঁকে পড়েছে, আমরা প্রাণপণ করে এক-এক দিন সেই অতি দুর্গম পাহাড়গুলোর ওপর উঠে বসে নীচে সমুদ্রের ঢেউয়ের উত্থান-পতন দেখি। সমুদ্রের একটা হু হু শব্দ উঠছে, জলে এক-একটা ছোটো ছোটো নৌকা পাল তুলে চলে যাচ্ছে, চার দিকে রোদ্দুর হাসছে, মাথার ওপর এক-একটা ছাতা খোলা রয়েছে, পাথরের ওপর মাথা দিয়ে আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প করছি। আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা আর পাবে? তুমি যে Thomsonএর *Castle of Indolence* পড়েছ— এখানটা তার একটা জীবন্ত ছবি। এক-এক দিন পাহাড়ে যাই আর পাথর-দিয়ে-ঘেরা ঝোপ-ঝাপে-ঢাকা একটি প্রচ্ছন্ন জায়গা দেখলে সেইখানটিতে গিয়ে একটি বই নিয়ে পড়তে বসি। কিন্তু অতি একমনে বই পড়বার জায়গা টর্কী নয়। মনের এমন শিথিল অলস অবস্থায় অত মনো-

যোগ দেওয়া পোষায় না। তাই যদি পারবে তবে এক দিকে এমন সুনীল সমুদ্র কী করতে, এমন রোদ্দুর উঠেছে কেন, এমন অতি পরিষ্কার আকাশ কী জন্যে? দু ছত্র বই পড়বে আর দু দণ্ড সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকবে, চেয়ে থেকে থেকে সাত শো ভাবনা ভাববে, অথচ ভাবছ কি না ভাবছ তা বিশেষ মনোযোগ না দিলে টের পাওয়া যাবে না, হঠাৎ বইয়ের দিকে চোখ পড়বামাত্র আবার পড়া আরম্ভ করবার জন্যে খুব দৃঢ় সংকল্প করবে, কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রের একটা কমা পর্যন্ত যেই পৌঁচেছ অমনি মনটা অলক্ষিত ভাবে তোমার হাত ফসকে এমন একটা অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে হাজির হবে যে জায়গার বিষয় ইতিপূর্বে তুমি কখনও ভাবও নি। মনটা সমস্ত দিন এই রকম লুকোচুরি খেলে বেড়ায়, একটা বইয়ের দেড় পাতা পড়তে আড়াই দিন লাগে।

আমি বড়ো বাজে কথা বকে যাচ্ছি, এ কিন্তু টর্কীর বাতাসের গুণে। মনের ভিতর হাজারটা কথা চলাফেরা করে বেড়ায়, কিন্তু কথাগুলো হাত ধরাধরি করে আসে না, পরস্পরের মধ্যে চেনাশুনো নেই, খাপছাড়া দলছাড়া কথাগুলো মনের বড়ো রাস্তা দিয়ে খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছে, কিন্তু পথিকদের মতো কেউ কারও কোনো এলাকা রাখে না। এমন ভাঙাচোরা কথার জোড়াতাড়া চিঠি পড়তে কি তোমাদের ভালো লাগছে?

তুমি যদি এখানে আসতে, ভাই, তা হলে সমুদ্রের শব্দ শুনতে শুনতে, সমুদ্রের ঢেউ গুনতে গুনতে, ফুলের রাশে মাথা রেখে, ফুলের রেণু গায়ে মেখে, ফুলের মালা গেঁথে গেঁথে, ফুলের মধু খেতে খেতে, সন্ধে বেলায় সাগরবেলায়, দুজনেতে গলায় গলায়, ঘাসের 'পরে গাছের তলায়— গল্প হত, হাসি হত— ঠাণ্ডায় যদি কাশি হত বাড়ি যেতেম, চা খেতেম, হেসে খেলে দিন কাটাতেম। কেমন! লোভ

হচ্ছে কি ? আমি, ভাই, কবি নই—একটা ঘোরতর কাজের লোক। তবে যে, এ জায়গাটা খুব ভালো লাগছে বলছি তার কারণ হচ্ছে বরাবর শুনে আসছি ভালো জায়গা দেখলে লোকের ভালো লাগা উচিত। না ভালো লাগলে বড়ো লজ্জার বিষয়। তুমি হচ্ছ কবি মানুষ, ছড়াটড়া লিখে থাক, তুমি এখানে এলে বাস্তবিক তোমার লাগত ভালো।

একটা গল্প বলি শোনো। আমাদের এখেনে দিন কতক Miss H ও Miss N ছিলেন। Miss H একজন চিত্রকরী। তাঁর বড়ো সুন্দর ছবি আঁকা আসে। তিনি প্রায় প্রত্যহ breakfast খেয়েই সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে ছবি আঁকতে বেরোতেন। Miss N ক্রমিক কবিতা ও নভেল পড়েন ও তিনিও নাকি শুনেছি কাগজে খুব ভালো ভালো sonnet মাঝে মাঝে লিখে পাঠান। মাঝে মাঝে আমরা তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেম। কোনোখানে একটা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, কোথাও বা একটা ভাঙাচুরো বেড়া, কোথাও বা খানিকটা বনজঙ্গল ঝোপঝাপ, কখনো বা এক খণ্ড মেঘের বিশেষ একটা রঙ দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যেতেন ও শতমুখে ব্যাখ্যা করতেন। আমার তো ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যেত, আমি তাদের বিশেষ সৌন্দর্য বড়ো একটা বুঝতে পারতেম না ; ঝট্ করে একটা মত ব্যক্ত করতে বড়ো ভয় করত। দ্বিরুক্তিমাত্র না করে তাঁদের মতে সায় দিয়ে যেতেম। রোজ রোজই আমি অতি ভালো-মানুষটির মতো তাঁদের প্রতি কথায় বিনীত ভাবে সায় দিয়ে যেতেম। শেষকালে আমার বড়ো লজ্জা বোধ হতে লাগল। একদিন বেড়াতে বেরোবার সময় প্রতিজ্ঞা করলেম, 'আজ আমি নিজে হতে প্রকৃতির একটা কিছু সৌন্দর্য বের করে আগে থাকতে তাঁদের দেখাব, তাঁদের মুখ থেকে বাহবা নিতেই হবে।' এই পণ করে

তো বেরোনো গেল। চার দিকে নজর ক'রে দেখতে দেখতে চলেছি। চার দিকে ফুল আছে, গাছপালা আছে, পাহাড় পর্বত আছে, কিন্তু সে-সব তো পুরোনো— একটা নতুন কিছু বের করতে হবে। খানিক দূর গিয়ে দেখি একজনদের বাড়ির সুমুখে তারা একটি বাগান তৈরি করেছে, গাছগুলোর ডালপালা কেটে নানাবিধ আকারে পরিণত করা হয়েছে। কোনোটা গোল, কোনোটা বা অষ্টকোণ, কোনোটা মন্দিরের চুড়োর মতো। দেখে তো আমার তাক লেগে গেল। পাছে তাঁরা আগে থাকতে কিছু বলে ফেলেন এই ভয়ে তাঁরা মুখ খুলতে না খুলতে তাড়াতাড়ি আমি চেঁচিয়ে উঠেছি, 'How beautiful !' Miss Hকে তার একটা ছবি নিতে অনুরোধ করলেম। Miss H ও Miss N তো একেবারে হেসে আকুল; তাঁরা বলে উঠলেন, 'Oh Mr. T, surely you are joking !' Mr. T তো কালবিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি হেসে উঠলেন; যেন তিনি ঘোরতর একটা ঠাট্টা করে নিয়েছেন ও তার জন্যে মনে মনে ভারী তৃপ্তি ও গর্বের উদ্রেক হয়েছে। ভালো করে সামলাতে পেরেছি কিনা বলতে পারি নে। কিন্তু বড়ো লজ্জা হল! 'যাবৎ কিঞ্চিৎ' বাক্যব্যয় না করেছিলেম 'তাবচ্চ' যথাকথঞ্চিৎ রূপে শোভা পেয়েছিলেম, কিন্তু প্রথম যে দিনই মুখ খুললেম সেই দিনই এই রকম হাস্যভাজন হতে হল! আমি কিন্তু Miss H ও Miss N-এর ভাব আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলেম না; তাঁরা একটা যাচ্ছেতাই বনবাদাড় দেখলে হাঁ করে চেয়ে থাকতেন আর অমন সুন্দর নানা আকৃতিতে ছাঁটা গাছ-পালা তাঁদের পছন্দসই হল না! সেদিন একটা ভিক্ষুক একটা ছেঁড়া টুপি পরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল; হঠাৎ তাঁদের খেয়ালে কেমন লেগে গেল, তৎক্ষণাৎ তাকে আট গণ্ডা পয়সা (এক শিলিং) দিয়ে

দাঁড় করিয়ে ছবি নেওয়া হল। আর, রাস্তা দিয়ে কত মহা মহা সুন্দরী চলে যায়, যাদের একদিন দেখলে তিরিশ দিন মলয় সমীরণ ও চাঁদের কিরণে দগ্ধ করতে থাকে, তাদের সম্বন্ধে তাঁরা একটি কথাও কন না। কেন বলো দেখি। যা হোক, অপ্রস্তুত হয়ে বাড়ি গিয়েই একটা বাংলা কবিতা লিখতে বসলেম। Miss N আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি বাড়িতে চিঠি লিখছি? আমি বিনয়-সহকারে হাসতে হাসতে বললেম যে, 'আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে চেষ্টা করে থাকি, তাই দুই-এক ছত্র কবিতা লিখছি।' শুনে অবধি Miss Nএর আমার প্রতি ভারী ভক্তি হয়েছে। তিনি মনে করলেন, লোকটা খুব ভাবুক হবে। তিনি তাঁর লেখা দুই-একটা sonnet আমাকে শোনাতে আরম্ভ করলেন। কবিতা পড়তে পড়তে যেখানটা ভালো লাগত আমাকে চেঁচিয়ে শোনাতেন। আমার উচ্ছ্বাস দেখে কে! আমার পূর্বকৃত কোনো ত্রুটি তাঁর আর মনে রইল না। ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ভারী পরিপক্ব হয়ে উঠতে লাগল— এত দূর পর্যন্ত যে, একটা ফুস্‌ফাস্‌ উঠল। ম— সন্দেহ করলেন যে, Miss Nএর নেত্র রূপ ও বাক্য-বাণ-বর্ষণের মধ্যে পড়ে আমার বুকটা দু-তিন টুকরো হয়ে গেছে। আমি তাঁকে বোঝাতে গেলেম, 'মাথা নেই তার মাথাব্যথা। আমি একটা হৃদয়হীন শীতলশোণিত জীব। আমার হৃদয় দগ্ধও হয় না, ভস্মও হয় না, হারায়ও না, ভাঙেও না, চুরেও না। অমন একটা বিষম নট্‌খোটে পদার্থের আমি কোনো সম্পর্কই রাখি নে।' তিনি তো বিশ্বাসই করলেন না। তিনি বললেন, 'courtship চালাও।' আমার মতো চুপচাপ লাজুক মানুষ কি courtship চালাবার উপযুক্ত নাবিক? আমি কি মশায় তার দিকে হাঁ করে চেয়ে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করে নিশ্বেস ফেলতে পারি! ডিনার-টেবিলে আমার দিকে

একটা লবণ-দানি সরিয়ে দিলে এমনি অতিমাত্র কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ঢলঢল নেত্রে অত্যন্ত কোমল ভাবপূর্ণ হাস্যরসে মুখখানা টস্‌টোসে করে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা কি আমার কর্ম! বায়রন থেকে বেছে বেছে এমন কবিতা পড়ে শোনানো যাতে আমার মনের ভাব ব্যক্ত হয়, পড়তে পড়তে বিশেষ একটা লাইনে থেমে অতিশয় করুণরসের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা, সে-সব কি আমার পোষায়! আমি কি হাঁটু গেড়ে বলতে পারি: সুন্দরি, ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং! তোমরা কবি মানুষ তোমরা হলে পারতে। কিন্তু এ কথা নিয়ে আর বেশি ঠাট্টা উচিত নয়— বিষয়টি গুরুতর, একটা মনুষ্যমনের সুখশান্তি নিয়ে কথা হচ্ছে। আমার আলাপী অনেক লোকের মুখেই এই রকম একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি যে, আমি ভালোবাসায় পড়েছি ও সেই জন্যে মনে মনে আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। সংবাদটা অত্যন্ত ভাবনাজনক এবং শুনে অবধি আমি ভারী চিন্তিত আছি। কী করব বলো দেখি? বিবাহের প্রস্তাব করব কি? অবিশ্যি, লোকের মুখে এক কথা শুনেই আমি তাড়াতাড়ি করে বিয়ে করতে যাচ্ছি নে। আমি প্রথমতঃ তদারক করব যে আমি ভালোবাসায় পড়েছি কি না, তার পরে যদি প্রমাণ হয় তা হলে তোমাদের এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শ নিয়ে যা হয় স্থির করা যাবে। কী বল? তার পরে গল্পের শেষ দিকটা শোনো। সেই বাংলা কবিতাটা লিখছিলেম। চতুর্থ ছত্রে লাইনের শেষে ডেজি (daisy) কথাটা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার আর কোনো মিল না পেয়ে সেইখেনেই কবিতাটা বন্ধ থাকে। এ দিকে Miss N রোজই আমাকে পীড়াপীড়ি করেন; বলেন, 'তোমার কবিতাটা অনুবাদ করে শোনাও।' আমি তো আজকাল করে রোজই স্থগিত রাখি। পরশু দিন তাঁরা এখান

থেকে লন্‌ডনে চলে গিয়েছেন ও আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ করে গিয়েছেন, কবিতাটা অনুবাদ-সমেত লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কী করা যায় বল তো। ভারী মুশকিলেই পড়েছি। আমি বলি কী, তুমি, ভাই, আমার হয়ে যত শীঘ্র পারো একটা কবিতা লিখে পাঠাও। বিষয়টা কী জান? টর্কী না দেখে টর্কীর বর্ণনা কি অসম্ভব মনে করছ? কিচ্ছুই না। ভালো জায়গা মাত্রেরই যে রকম বর্ণনা করা হয়, সেই রকম করলেই চুকে যাবে। অর্থাৎ, ফুল ফুটছে, পাখি ডাকছে, বাতাস বয়, জ্যোৎস্না ওঠে। যত প্রকার মিষ্টি জিনিস আছে, কোনো প্রকারে কবিতাটার মধ্যে গুঁজে দেওয়া। গাছপালার বর্ণনা সমাপ্ত করে যদি কোনো রকম করে খানিকটা অশ্রুজল, হৃদয়-ভাঙাভাঙি, নিরাশা, প্রিয়তমা, নিবিড় কুন্তল, সুদীর্ঘ নয়ন বসাতে পারো, তা হলেই জিনিসটা সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। দেখো, nightingale, violet, forget-me-not, hyacinth প্রভৃতি কথাগুলো বাংলা কবিতার মধ্যে ভালো শোনাবে না। কিন্তু তার জন্যে বেশি ভেবো না। তুমি তো, কোকিল, পাপিয়া, মালতী, মল্লিকা, চামেলি, চম্পা লিখে দিয়ো; তার পরে অনুবাদ করে দেবার সময় আমি যা হয় একটা উপায় করে দেব।

সমস্ত গল্পটা কি নিতান্ত আজগুবি মনে হচ্ছে? তবে আসল কথাটা খুলে বলছি। এটা আমার কথা নয়। এক ব্যক্তি তাঁর নিজের ঘটনা চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন, তাঁর চিঠি থেকে আমি উদ্‌ধৃত করে দিলেম। ব্যক্তিটি কে শুনবে? না— কাজ নেই বাপু, তোমরা আবার দশ জনের কাছে গল্প করে বেড়াবে। তোমাদের পেটে যদি একটি কথা থাকে! ভারী কৌতূহল হচ্ছে? আচ্ছা তাঁর নামের প্রথম অক্ষর লিখছি— শ। বুঝেছ?

ভারী কাজে-ব্যস্ত। হাই তোলবার সময় নেই। সময় যদি নিলেমে বিক্রি হয় তা হলে যত ব্যস্ত লোক সংসারে আছে আমি সকলের চেয়ে চড়া দাম ডাকি— এত কাজ! এমন অবস্থায় তোমাদের চিঠি লেখা সামান্য কথা? এত ব্যস্ত অবস্থায় লিখতে বসলে কী বিপদ ঘটে জানো? মনের বাক্সের চাবি পকেট হাৎড়ে খুঁজে পাওয়া যায় না; যদি বা বাক্স খোলা গেল তাড়াতাড়ি ব্যস্তসমস্ত ভাবে, হাঁস্-ফাঁস্ করতে করতে, হুট্‌পাট্ ক'রে, যেখানে যত ভাব গোছানো ছিল খুঁজতে গিয়ে সমস্ত ওলটপালট বিপর্যস্ত করে ফেলি— এটা তুলছি, ওটা তুলছি, কিন্তু যেটা আবশ্যক সেইটে পাওয়া যায় না। লিখতে গেলে কথা পড়ে যায়। তাড়াতাড়িতে কর্তার আগে ক্রিয়াকে আসন দেওয়া হয় ও কর্তা জায়গা না পেয়ে হয়তো কর্মের পিছনে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আজকেরকার চিঠিতে এই রকম নানা ত্রুটি হবার সম্ভাবনা আছে, তবু কোনো প্রকারে আজকের মধ্যে চিঠিটা লিখতেই হবে। মনে আছে, তিন চার মেল আগে তোমাকে লাইন দশেকের যে-একটি চিঠি লিখেছিলেম তাতে তোমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেম যে, 'শীঘ্রই তোমাকে একখানি বড়ো চিঠি লিখব।' 'লিখব' ভবিষ্যৎকালবাচক ক্রিয়া। আজ থেকে প্রলয়কাল পর্যন্ত ভবিষ্যতের সীমা। তা ছাড়া যেমন একটি বাঁধা নিয়ম আছে যে, পয়সা চৌষট্টিটা হলেই টাকায় পরিণত হয়; তেমন কোনো শাস্ত্রেই এমন একটা ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট নিয়ম নেই যাতে অবিসম্বাদে বলা যায় যে, 'শীঘ্র' এত আনা হলে 'দেরি' টাকায় পরিণত হয়। অতএব তোমাদের এমন একটি অনিশ্চিত অনির্দিষ্ট আশায় আর বেশি দিন ফেলে রাখতে চাই নে।

Christmas ফুরোলো, আবার দেখতে দেখতে আর-একটা

উৎসব এসে পড়ল। আজ নূতন বর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু তার জন্যে কিছুই গোলমাল দেখতে পাচ্ছি নে। নূতন বৎসর যে এখানে এমন নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসবে তা জানতেম না। শুনেছি ফ্রান্সে লোকে নতুন বৎসরকে খুব সমাদরের সঙ্গে আবাহন করে। কাল পুরাতন বৎসরের শেষ রাত্রে আমাদের প্রতিবেশীরা বাড়ির জানলা খুলে রেখেছিল। তার কারণ এই হতে পারে যে, পাছে পুরানো বৎসর ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে, তার চলে যাবার ব্যাঘাত হয়— আর, পাছে নতুন বৎসর এসে জানলার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তার ঘরে ঢুকতে বিশেষ কষ্ট হয়। এখেনে শীতে জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ থাকে কি না, সুতরাং দরজা খুলে না দিলে নতুন বৎসর ঘরে ঢুকতে পান না, বাইরে দাঁড়িয়ে সর্দিতে মারা যান। আর পুরানো বৎসরের বাড়ি যাবার সময় হয়েছে, তাকে যদি অমন দরজা বন্ধ করে রাখো তবে সে ব্যক্তি দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে বাড়িময় দাপা-দাপি করে বেড়াতে থাকবে। কিন্তু দুর্দশার কথা কী বলব, আমরা হচ্ছি ঘোরতর অসভ্য অজ্ঞান লোক— আমাদের বাড়ির জানলা কাল রাত্রে খুলে রাখা হয় নি, আমাদের চিমনির (ধোঁওয়ার নলের) ভিতর দিয়ে ছাড়া পুরাতন বৎসরের আর বেরোবার জায়গা ছিল না। আজ সকালে উঠে এই কথাটা আমাদের হঠাৎ মনে পড়ল। মনে পড়ে অবধি আমরা অনুতাপে সারা হচ্ছি। মনে করো প্রতি বাড়িতে ১৮৮০ খৃস্টাব্দ, আমাদের বাড়িতে ১৮৭৯। মনে করো যদি আমরা আর বাড়ির জানলা দরজা একেবারে না খুলি তা হলে আর পঁচাত্তর বৎসর বাঁচলেও ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে মরি। কিম্বা যদি চিত্রগুপ্তের খাতায় ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে তাঁর প্রভুর আলয়ে আমার শুভ পদার্পণ নির্দিষ্ট থাকে তা হলে সে শুভদিন আমার ভাগ্যে একেবারেই আসে না, চিরকালই আমি ১৮৭৯তে থাকি। মন্দ কী? চিরকালই যদি

১৮৭৯তে থাকতে পারি সে তো বেশ হয়। কিন্তু রোসো, একটু ভেবে দেখি। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে এমনিই কি আমার সুখের বৎসর গিয়েছে? আহা! এর আগে এমন কত বৎসর গিয়েছে যাদের ধরে রাখতে পারলে চিরজীবন ধরে রাখতুম! যা হয়ে গেছে তা তো হয়ে গেছে। এখন, আমার কুষ্টিতে লেখা আছে যে, ১৮৮১ খৃস্টাব্দে আমার ‘ধন-রত্নানি’ একটি ভার্যা ও অনেক মিত্র লাভ হবে; মনে করছি ১৮৮২কে আর ঘরে ঢুকতে দেব না। যা হোক, নতুন বৎসরকে অনেক ক্ষণ ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, আসবামাত্রেই তাঁকে আবাহন করতে পারি নি তার জন্যে আমরা তাঁর কাছে শত শত ক্ষমা চাচ্ছি। নতুন বৎসরের আগমনে আজকের দিনের মুখশ্রী বড়ো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। আজ ভারী মেঘ ও অন্ধকার করে আছে। নতুন বৎসরের উপক্রমণিকা যদি এই রকম অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তবে এর উপসংহার না জানি কিরকম হবে। টর্কি থেকে বহুদিন হল আমরা আবার লন্‌ডনে এসেছি। টর্কিতে বসন্তের সঙ্গে প্রকৃতির ফুলশয্যা দেখেছিলেম। সেই উৎসব থেকে লন্‌ডনের এই ব্যস্ত ভাবের মধ্যে এসে পড়ে বড়ো ভালো লাগবে না। এখন আমি Mr Kর পরিবারের মধ্যে বাস করি। Mr. K, Mrs. K, তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী, আমি ও Toby বলে এক কুকুর হচ্ছে এই বাড়ির জনসংখ্যা। Mr. K হচ্ছেন একজন ডাক্তার। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি প্রায় সমস্ত পেকে গিয়েছে। বেশ বলিষ্ঠ ও সুশ্রী দেখতে। যেমন অমায়িক স্বভাব তেমনি অমায়িক মুখশ্রী। তাঁর পরিবারের সকলেই বড়ো ভালো লোক। আমার সঙ্গে অল্প দিনের আলাপেই বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। Mrs. K আমাকে আন্তরিক যত্ন করেন। শীতের সময় আমি বিশেষ গরম কাপড় না পরলে তাঁর কাছে ভর্ৎসনা খাই। খাবার সময় যদি

তাঁর মনে হয় আমি কম করে খেয়েছি, তা হলে যতক্ষণ না তাঁর মনের মতো খাই ততক্ষণ পীড়াপীড়ি করেন। বিলেতে লোকে কাশিকে বড়ো ভয় করে; যদি দৈবাৎ আমি দিনের মধ্যে দুবার কেশেছি তা হলেই তিনি জোর করে আমার স্নান বন্ধ করান, আমাকে দশ রকম ওষুধ গেলান, শুতে যাবার আগে আমার পায়ে খানিকটা গরম জল ঢালবার বন্দোবস্ত করেন— তবে ছাড়েন। বাড়ির মধ্যে সকলের আগে বড়ো Miss K ওঠেন। তিনি নীচে এসে ব্রেক্‌ফাস্ট্‌ তৈরি হয়েছে কিনা তদারক করেন; অগ্নিকুণ্ডে দু চার হাতা কয়লা দিয়ে ঘরটি বেশ উজ্জ্বল করে রাখেন। খানিকক্ষণ বাদে সিঁড়িতে একটা দুদ্দাড় পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বুড়ো K শীতে হিহি করতে করতে খাবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি আগুনে হাত পা পিঠ বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাবার টেবিলে এসে বসলেন। তাঁর বড়ো মেয়েকে চুম্বন করলেন, আমার সঙ্গে সুপ্রভাত অভিবাদন হল। লোকটা ভারী প্রফুল্ল। আমার সঙ্গে খানিকটা হাসি-তামাসা হল, খবরের কাগজ থেকে এটা ওটা পড়ে শোনাতে লাগলেন। তাঁর এক পেয়ালা কফি শেষ হয়ে গেছে, এমন সময়ে তাঁর আর দুটি মেয়ে এসে তাঁকে চুম্বন করলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্দোবস্ত ছিল যে, তাঁরা যে দিন Mr. Kর আগে উঠবেন সে দিন Mr. K তাঁদের পাঁচ সিকে দেবেন, আর যেদিন Mr. K তাঁদের আগে উঠবেন সে দিন Mr. Kকে তাঁদের চার আনা দিতে হবে। যদিও এত অল্প দিতে হত তবু Mr. Kর তাঁদের কাছে প্রায় দু তিন পাউণ্ড পাওনা হয়েছে। রোজ সকালে Mr. K তাঁর পাওনার জন্যে দাবি করেন। কিন্তু তাঁর দেনদাররা হেসেই উড়িয়ে দেন। Mr. K বলেন 'এ ভারী অন্যায়!' তিনি আমাকে মাঝে মাঝে মধ্যস্থ মেনে বলেন, 'আচ্ছা,

Mr. T তুমিই বলো, এরকম debt of honour ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রতা!' যা হোক, রোজ রোজই Mr. Kর পাওনা বাড়ছে। তার পরে Mrs. K এলেন। আমাদের ব্রেক্‌ফাস্ট্ প্রায় সাড়ে নটার মধ্যে শেষ হয়। Mr. Kর বড়ো ছেলে আমাদের আগেই খাওয়া সেরে কাজে গিয়েছেন, আর Mr. Kর ছোটো ছেলেটি ও ছোটো মেয়েটি অনেকক্ষণ হল খাওয়া শেষ করেছে। একজনের কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। Toby কুকুরটি অনেক ক্ষণ হল এসে আগুনের কাছে আরামে বসে আছে। ছোট্ট কুকুরটি। তার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া রোঁওয়া। রোঁওয়াতে চোখ মুখ ঢাকা। বুড়ো হয়েছে আর তার একটা চোখ কানা হয়ে গেছে। আদর পেয়ে পেয়ে এই ব্যক্তির কতকগুলি নবাবি চাল হয়েছে। drawing-room ছাড়া অন্য কোনো ঘরে তার মন বসে না। কথা নেই বার্তা নেই, ঘরের সকলের চেয়ে ভালো কেদারাটিতে অম্লানবদনে লাফিয়ে উঠে বসা হয়; ঘরে যদি একঘর লোক হয় তবুও বসে আছে, এক ব্যক্তির হয়তো বসবার জায়গা হচ্ছে না কিন্তু Tobyর তাতে আসে যায় না। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ দৃক্‌পাত না করে দিব্য আরামে চৌকিতে তিনি বসেছেন; তার এক পাশে যদি আর কেউ এসে বসে অমনি তিনি মহা বিরক্ত হয়ে দর্পে সে চৌকি থেকে উঠে গিয়ে তৎক্ষণাৎ পাশের কৌচটির ওপরে গিয়ে বসে পড়েন। সকাল বেলায় ব্রেক্‌ফাস্টের সময় তাঁর তিনটি বিস্কুট বরাদ্দ আছে। সে বিস্কুটগুলি নিয়ে সে খাবার ঘরে বসে থাকে; যতক্ষণ না আমি গিয়ে সেই বিস্কুটগুলি নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা খেলা করি, একবার তার মুখ থেকে কেড়ে নিই, একবার গড়িয়ে দিই, ততক্ষণ তার খাওয়া হয় না। আমি খেলা না করলে সে কোনো মতেই খেতে রাজি হয় না। আমাকে সে বড়ো ভালোবাসে। আগে

আগে যখন আমার উঠতে দেরি হত সে তার বরাদ্দ বিস্কুট নিয়ে আমার শোবার ঘরের কাছে বসে ঘেউ ঘেউ করত। কিন্তু গোল করলে আমি বিরক্ত হতুম দেখে সে এখন আর ঘেউ ঘেউ করে না। আস্তে আস্তে পা দিয়ে দরজা ঠেলে; যতক্ষণ না আমি দরজা খুলে দিই, চুপ করে বাইরে বসে থাকে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরলেই সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেজ নেড়ে সুপ্রভাত সম্ভাষণ করে; তার পরে একবার বিস্কুটের দিকে চায় একবার আমার মুখের দিকে চায়। মনোগত ভাবটি এই যে, 'প্রাতঃকৃত্য সারা হয়েছে? তা বেশ হয়েছে। এখন আমার বিস্কুটটি একবার গড়িয়ে দেও; আমার বড়ো খেলা করবার ইচ্ছে গিয়েছে।' এক-এক সময় সন্ধে বেলায় পেছন দিকের দুটো পা গুটিয়ে সুমুখের দুটো পায়ের ওপর ভর দিয়ে মহাচিন্তিতভাবে বৃদ্ধ আগুনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। আধ ঘণ্টা যায়, এক ঘণ্টা যায়, Tobyর হুঁস নেই। তখন তাকে আদর করতে যাও, মাথায় হাত বুলোও, মহা-অসন্তুষ্ট-ভাবে গোঁ গোঁ করে, মাথা নাড়ে। 'বিরক্ত কর কেন? ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে এখন উনি আমার মাথায় হাত বুলোতে এলেন!' এ ব্যক্তি পূর্বজন্মে কী ছিল বলো দিকি? অ্যারিস্টট্ল্ ছিল না কি? যা হোক, সাড়ে নটার মধ্যে আমাদের ব্রেক্‌ফাস্ট্ শেষ হয়। তার পরে Mrs. K হাতে দস্তানা পরে দাসীদের নিয়ে চৌতলা থেকে একতলা পর্যন্ত, জিনিসপত্র গোছানো, ঘর দ্বার পরিষ্কার করানো ও সমস্ত গৃহকার্য তদারক করে উঠা-নাবা করেন। একবার রান্নাঘরে যান— সেখেনে শাকওয়ালা রুটি-ওয়ালা মাংসওয়ালার বিল দেখেন, যাকে যার চুকিয়ে দেবার দেন। মাঝে মাঝে ওপরে এসে Mr. Kর সঙ্গে গৃহকার্যের পরামর্শ হয়। রান্নাঘরের উপকরণ পরিষ্কার আছে কিনা ও যথাস্থানে আছে

কিনা দেখেন ; ভালো মাংস এনেছে কিনা, ওজনে কম বেশি হয়েছে কিনা সে সব দেখেন। রাঁধুনির সঙ্গে মাঝে মাঝে রান্নাতে যোগ দেন। এই রকম ব্রেক্‌ফাস্টের পর থেকে প্রায় বেলা একটা দেড়টা পর্যন্ত তাঁকে নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে তাঁর বড়ো মেয়ে যোগ দেন। মেজ মেয়ে Miss J দেখি, প্রত্যহ একটি ঝাড়ন নিয়ে drawing-room সাফ করেন। দাসীরা ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়, আর জিনিসপত্রে যা-কিছু ধুলো লাগে তা তিনি নিজের হাতে ঝেড়েঝুড়ে সাফ করেন। এখানকার অনেক ভদ্রপরিবারেই drawing-roomএর জিনিস-পত্র সাফ করবার ভার বাড়ির মেয়েরাই নেন, দাসীদের হাতে পাছে জিনিসপত্র ভেঙে যায় বা ভালোরূপে পরিষ্কার না হয়। তৃতীয় মেয়ে Miss A বালিসের আচ্ছাদন আসন মোজা কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ সেলাইয়ে নিযুক্ত হন, চিঠিপত্র লেখেন, এক-একদিন বাজনা ও গান অভ্যেস করেন। বাড়ির মধ্যে তিনিই গাইয়ে-বাজিয়ে। আজকাল স্কুল বন্ধ, ছোটো ছেলেটি ও মেয়েটি ভারী খেলায় মগ্ন। দেড়টার সময় আমাদের lunch খাওয়া আছে। lunch সমাপন করে আবার যিনি যাঁর কাজে নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে visitorদের আসবার সময়। হয়তো Mrs. K Mr. Kর এক জোড়া ছেঁড়া মোজা নিয়ে চশমা পরে drawing-roomএ বসে সেলাই করছেন। Miss A একটি পশমের জামা তাঁর ভাইপোর জন্যে তৈরি করে দিচ্ছেন। Miss J একটু অবসর পেয়ে আগুনের কাছে বসে হয়তো Green's *History of the English People* পড়তে নিযুক্ত হয়েছেন। বড়ো Miss K হয়তো তাঁর কোনো আলাপীর বাড়িতে visit করতে গিয়েছেন। তিনটের সময় হয়তো একজন visitor এলেন। দাসী drawing-

roomএ এসে বললে 'Mr. ও Mrs. A'। বলতে বলতে ঘরের মধ্যে Mr. ও Mrs. A এলেন। মোজা জামা রেখে বই মুড়ে Mrs. K ও তাঁর কন্যারা আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করলেন। weather ভালো কি মন্দ সে বিষয়ে পরস্পারের মতামত ব্যক্ত করলেন। Mrs. A বললেন, 'Mr. Xএর ৪৩ বৎসর তিন মাস বয়সে হাম হয়। হাম হয়েছিল বলে তিনি চার দিন আপিসে যেতে পারেন নি। কাল আফিসে গিয়েছিলেন। তাঁর হাম হয়েছিল বলে আফিসের লোকেরা তাঁকে নির্দয় রূপে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে।' Mrs. J বললেন, 'অমন ব্যামো হলে কী দুর্দশা! একে তো ব্যামোর কষ্ট, তার ওপর কারও মমতা পাবার জো নেই। শুধু তাই নয়, ব্যামো হলে আবার তাই নিয়ে হাসি তামাসা ঠাট্টা খেয়ে বেড়াতে হয়।' এই কথা থেকে ক্রমে হাম রোগের বিষয়ে যত কথা উঠতে পারে উঠল। Miss A বললেন, 'Mr. Zএর তৃতীয় ছেলেটির হাম হয়েছে।' তার থেকে কথা উঠল যে, Mr. Zএর যে এক cousin Miss Y অস্ট্রেলিয়ায় আছেন তাঁর Captain Wর সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেছে। এই রকম খানিক ক্ষণ কথোপকথন হলে পর তাঁরা চলে গেলেন। বিকেলে হয়তো আমরা সবাই মিলে একটু বেড়াতে গেলুম। বেড়িয়ে এসে সাড়ে ছটার সময় আমাদের ডিনার খাওয়া হয়। ডিনার খেয়ে ৭টার সময় আমরা সবাই মিলে drawing-roomএ গিয়ে বসি। আগুন জ্বলছে। ঘরটি বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আমরা আগুনের চার দিকে ঘিরে বসলুম। এক-এক দিন আমাদের গান বাজনা হয়। আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরাজি গান শিখেছি। জাঁক করতে চাই না, কিন্তু তবু সত্যি কথা বলতে কী, এখানকার লোকে আমার গলার বেশ প্রশংসা করে। আমি গান করি। Miss A

বাজানো Miss A আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধে বেলায় আমাদের একটু-আধটু পড়াশুনা হয়। আমরা পালা করে ৬ দিনে ছ রকমের বই পড়ি। বই পড়তে পড়তে এক-এক দিন প্রায় ১১॥ - ১২ হয়ে যায়। ছেলেরা এখন শুতে গেছে।

ছেলেদের সঙ্গে আমার ভারী ভাব হয়ে গেছে। তারা আমাকে Uncle Arthur বলে। Ethel ছোটো মেয়েটি আমাকে ভারী ভালোবাসে। তার ইচ্ছে যে, আমি কেবল একলা তারই Uncle Arthur হই। তার ভাই Tom যদি আমাকে Uncle Arthur বলে তবেই তার ভারী কষ্ট উপস্থিত হয়। একদিন Tom তার ছোটো বোনকে রাগাবার জন্যে একটু বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিল, 'He is my Uncle Arthur!' এই তো Ethel আমার গলা জড়িয়ে ধরে তার ছোটো ঠোঁট দুটি ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে। কত করে তাকে থামাই। Tom একটু অস্থির, কিন্তু ভারী ভালো মানুষ। খুব মোটাসোটা। মাথাটা খুব প্রকাণ্ড। মুখটা খুব ভারী-ভারী। সে এক-এক সময়ে আমাকে এমন এক-একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে যে কী বলব। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'আচ্ছা, Uncle Arthur, ইন্দুররা কী করে?' Uncle Arthur বললেন, 'তারা রান্নাঘর থেকে চুরি করে খায়।' সে একটু ভেবে বললে, 'চুরি করে? আচ্ছা, চুরি করে কেন?' Uncle বললেন, 'তাদের ক্ষিদে পায় ব'লে।' শুনে Tomএর বড়ো ভালো লাগল না। সে বরাবর শুনে আসছে যে, জিজ্ঞাসা না করে পরের জিনিস নেওয়া অন্যায়। আর একটি কথা না বলে সে চলে গেল। যদি তার বোন কখনো কাঁদে সে তাড়াতাড়ি এসে সান্ত্বনার স্বরে বলে, 'Oh, poor

Ethel, don't you cry! Poor Ethel!' এমন মজা করে বলে যে সে হাসি চেপে রাখা দুঃসাধ্য। Ethelএর মনে মনে জ্ঞান আছে যে, সে একজন Lady। সে কেমন গম্ভীর ভাবে কেদারায় গিয়ে ঠেস দিয়ে বসে। Tomকে এক এক সময়ে ভর্ৎসনা করে বলা হয়, 'আমাকে বিরক্ত কোরো না।' একদিন Tom পড়ে গিয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে বললেম, 'ছি! কাঁদতে আছে!' অমনি Ethel আমার কাছে ছুটে এসে জাঁক করে বললে, 'Uncle Arthur, Uncle Arthur, আমি একবার ছেলেবেলায় রান্নাঘরে পড়ে গিয়েছিলেম, কিন্তু কাঁদি নি।' উঃ! বয়স কত!

Mr. N ডাক্তারের আর-এক ছেলে বাড়িতে থাকেন, কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই নে। তিনি সমস্ত দিন আফিসে থাকেন। কিন্তু আফিস থেকে এলেও তাঁর বড়ো একটা দেখা পাওয়া যায় না। তার কারণ কী জানো? তিনি Miss Iএর সঙ্গে engaged। তাঁদের দুজনে কোর্টশিপ চলছে। রবিবার দু বেলা তাঁকে নিয়ে তাঁর চর্চে যেতে হয়। যখন বিকেলে একটু অবসর পান, তাঁর বাড়িতে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধে বেলা তাঁদের বাড়িতে তাঁর নেমন্তন্ন আছে। এই রকমে তাঁর সময় ভারী অল্প। উভয়ে পরস্পরকে নিয়ে এমন সুখী আছেন যে, অবসর কাল কাটাবার জন্যে অন্য কোনো জীবের সঙ্গ তাঁদের আবশ্যক করে না। শুক্রবার সন্ধে বেলায় যদি আকাশ ভেঙে পড়ে তবু Mr. N পরিষ্কার করে চুলটি ফিরিয়ে, পমেটম মেখে, কোট brush করে ফিট্‌ফাট্ হয়ে, ছাতা হাতে করে বাড়ি থেকে বেরোবেনই। একবার খুব শীত পড়েছিল, আর তাঁর ভারী কাশি হয়েছিল; মনে করলেম আজ বুঝি বেচারির আর যাওয়া হয় না। কী আশ্চর্য! ৭টা বাজতে না বাজতেই দেখি তিনি ফিট্‌ফাট্

হয়ে নেবে এসেছেন। তাঁর বাপ মা বোনরা সবাই বললে 'It is very foolish of you N', কিন্তু বললে হয় কী! 'নদী যবে চলে সিন্ধুপানে কার সাধ্য রোধে তার গতি।' নদী তো বাপ মা বোনের উপরোধের শিলাবাধা লঙ্ঘন ক'রে, কাশি হাঁচি ও রুমালে সর্দিঝাড়ার কলস্বর করতে করতে সিন্ধুর উদ্দেশে চলল। (উপমা কেমন হল বলো দেখি।) তখন বৃষ্টি পড়ছে, বরফ পড়ছে, রাস্তায় কাদা জমেছে। তার পরদিন সকালে সর্দিতে বেচারি মাথা তুলতে পারে না। এমন যন্ত্রণা!

যা হোক, আমার এই K-পরিবারের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সে দিন Miss N আমাকে বলছিলেন যে, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস করতে আসছে, তাঁদের ভারী ভয় হয়েছিল। 'ব্যক্তিটা কি-রকম হবে না জানি! তার সাক্ষাতে আবার কিরকম আদব-কায়দা রেখে চলতে হবে! আমাদের কথা সে ভালো করে বুঝতে পারবে কি না!'— এই রকম নানাবিধ ভাবনায় তাঁদের তো রাতে ঘুম হয় না। যেদিন আমার আসবার কথা ছিল সেই দিন Miss A ও Miss J তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি। তার পরে হয়তো যখন তাঁরা শুনলেন যে, একটা পোষমানা জীব তাঁদের বাড়িতে এসেছে, সে ব্যক্তির চেহারা দেখে বোধ হয় না যে তার কখনও মানুষের মগজের লাড়ু, মানুষের ঠ্যাঙের শিক-কাবাব বা খোকাখুকি-ভাজা খাওয়া অভ্যেস ছিল— মুখে ও সর্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলংকার পরে না— তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। Miss J বলেন যে প্রথম-প্রথম এসে যদিও আমার সঙ্গে কথা-বার্তা কয়েছিলেন তবুও দু দিন পর্যন্ত আমার মুখ দেখেন নি।

হয়তো তাঁর ভয় হয়েছিল যে, কী অপূর্ব ছাঁচে ঢালা মুখই না জানি দেখবেন। তার পরে যখন আমার মুখ দেখলেন তখন ? তখন কী ? আমার তো বিশ্বাস, তখন তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না যে এই মুখ দেখে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মাথা ঘুরতে পারে। কিন্তু সেটা তোমাদের ঘোরতর কুসংস্কার। ওই তো সুমুখের আয়নায় আমার মুখটা দেখতে পাচ্ছি। কেন, কী মন্দ ? এ মুখ দেখে তোমাদের কারও মাথা ঘোরে নি সত্যি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি— তোমাদের মাথা আছে ?

যা হোক, এই পরিবারে আমি বেশ সুখে আছি। সন্ধে বেলা বেশ আমোদে কেটে যায়— গান, বাজনা, বই পড়া। সকলের সঙ্গে ভারী বন্ধুত্ব হয়েছে। আর Ethel তার Uncle Arthurকে মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চায় না।

পরিশিষ্ট - গ্রন্থপরিচয়

পাশ্চাত্যভ্রমণ গ্রন্থের প্রবেশক

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত বন্ধুবরেষু—

আমার বয়স ছিল সতেরো। পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে গুরুজনের উদ্‌বেগ-ভাজন হয়েছি। মেজদাদা তখন আমেদাবাদে জজিয়তি করছেন। ভদ্রঘরের ছেলের মানরক্ষার উপযুক্ত ইংরেজি যে ক'রে হোক জানা চাই; সেজন্যে আমার বিলেত-নির্বাসন ধার্য হয়েছে। মেজদাদার ওখানে কিছুদিন থেকে পত্তন করতে হবে তার প্রথম ভিত, হিতৈষীরা এই স্থির করেছেন। সিভিল সার্ভিসের রঙ্গভূমিতে আমার বিলিতি কায়দার নেপথ্যবিধান হল।

বালক বয়সে আত্মপ্রকাশটা থাকে চাপা। জীবনে তখন উপরওয়ালাদেরই আধিপত্য; চলৎশক্তির স্বাতন্ত্র্যটা দখল করে আদেশ উপদেশ অনুশাসন। স্বভাবত মেনে চলবার মন আমার নয়; কিন্তু আমি ছিলুম ভোলা মনের মানুষ, আপন খেয়াল নিয়ে থাকতুম, আমাকে দেখতে হত নেহাত ভালোমানুষের মতো। ভাবীকালে বিস্তর কথাই কইতে হয়েছে, তার অঙ্কুরোদ্গম ছিল নিঃশব্দে। একদিন যখন বারান্দার রেলিং ধরে একলা চুপ করে বসে ছিলুম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে বড়দাদা আমার মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, 'রবি হবে ফিলজফর।' চুপ করে থাকার ক্ষেতে ফিলজফি ছাড়াও অন্য ফসল ফলে।

ক্ষেতে প্রথম দেখা দিল কাঁটা গাছ, চাষ-না-করা জমিতে। বিশ্বকে খোঁচা মেরে আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করবার সেই ঔদ্ধত্য। হরিণ-বালকের প্রথম শিঙ উঠলে তার যে চাল হয় সেই উগ্রচাল প্রথম কৈশোরের। বালক আপন বাল্যসীমা পেরোবার সময় সীমা লঙ্ঘন করতে চায় লাফ দিয়ে। তার পরিচয় শুরু হয়েছিল মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা যখন লিখেছিলেম পনেরো বছর বয়সে। এই সময়েই যাত্রা করেছি বিলেতে। চিঠি যেগুলো লিখেছিলুম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে খাঁটি স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে। বাঙালির ছেলে প্রথম বিলেতে গেলে তার ভালো লাগবার অনেক কারণ ঘটে। সেটা স্বাভাবিক, সেটা ভালোই। কিন্তু কোমর বেঁধে বাহাদুরি করবার প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসলে উল্টো মূর্তি ধরতে হয়। বলতে হয়, 'আমি অন্য পাঁচজনের মতো

নই, আমার ভালো লাগবার যোগ্য কোথাও কিছুই নেই।' সেটা যে চিত্ত-দৈন্যের লজ্জাকর লক্ষণ এবং অর্বাচীন মূঢ়তার শোচনীয় প্রমাণ, সেটা বোঝবার বয়স তখনো হয় নি।

সাহিত্যে সাবালক হওয়ার পর থেকেই ঐ বইটার 'পরে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। বুঝেছি, যে দেশে গিয়েছিলুম সেখানকারই যে সম্মান হানি করা হয়েছে তা নয়, ওটাতে নিজেরই সম্মানহানি। বিস্তর লোকের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বইটা প্রকাশ করি নি। কিন্তু আমি প্রকাশে বাধা দিলেই ওটা যে অপ্রকাশিত থাকবে এই কৌতূহলমুখর যুগে তা আশা করা যায় না। সেই জন্যে এ লেখার কোন্ কোন্ অংশকে লেখক স্বয়ং গ্রাহ্য এবং ত্যাজ্য বলে স্বীকার করেছে সেটা জানিয়ে রেখে দিলুম। যথাসময়ে ময়লার ঝুলি হাতে আবর্জনা কুড়োবার লোক আসবে, বাজারে সেগুলো বিক্রি হবার আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে। অনেক অপরাধের অনেক প্রায়শ্চিত্ত বাকি থাকে ইহলোকে; প্রেতলোকে সেগুলো সম্পূর্ণ হতে থাকে।

এ বইটাকে সাহিত্যের পংক্তিতে আমি বসাতে চাই, ইতিহাসের পংক্তিতে নয়। পাঠ্য জিনিষেরই মূল্য সাহিত্যে, অপাঠ্য জিনিষেরও মূল্য ইতিহাসে। ঐতিহাসিককে যদি সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে পারতুম তবে আমার পক্ষে সেটা পুণ্যকর্ম, সুতরাং মুক্তির পথ হত। নিজের কাব্য সম্বন্ধে এই ত্যাগের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে বারবার সংকল্প করেছি। কিন্তু দুর্বল মন, সংঘবদ্ধ আপত্তির বিরুদ্ধে ব্রত পালন করতে পারি নি। বাছাই করবার ভার দিতে হল পরশুপাণি মহাকালের হাতে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগে মহাকালেরও কর্তব্যে ত্রুটি ঘটছে। বইগুলির বৈষয়িক স্বত্ব হারিয়েছি বলে আরো দুর্বল হতে হল আমাকে।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারি নে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম। আজ এর বয়স হল প্রায় ষাট। সে ক্ষেত্রেও আমি ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ৎ দাখিল করব না। আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি-ভাষার সহজ-প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।

তার পরে লেখার জঞ্জালগুলো সাফ করবামাত্র দেখা গেল—এর মধ্যে শ্রদ্ধা বস্তুটাই ছিল গোপনে, অশ্রদ্ধাটা উঠেছিল বাহিরে আগাছার মতো নিবিড় হয়ে। আসল জিনিষটাকে তারা আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু নষ্ট করে নি। এইটে আবিষ্কার করে আমার মন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছে। কেননা, নিন্দা-নৈপুণ্যের প্রাখর্য ও চাতুর্যকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। ভালো লাগবার শক্তিই বিধাতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মানবজীবনে। সাহিত্যে কুৎসাবিলাসীদের ভোজের দাদন আমি নিই নি—আর কিছু না হোক, এই পরিচয়টুকু আমি রেখে যেতে চাই।

একটা কথা আপনাকে বলা বাহুল্য। ইংরেজের চেহারা সেদিন আমার চোখে যেমনটা ধরা পড়েছিল সেটা যে নেহাত আমার বাল্যবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতার সৃষ্টি সে কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না। এই প্রায় ষাট বছরের মধ্যে সেখানকার মানুষের যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে ক্রমশ-অভিব্যক্তির আখ্যা দেওয়া যায় না। এক-এক সময়ে ইতিহাস-সতরঞ্চের বোড়ে তার এক-পা চাল ছেড়ে দিয়ে লম্বা চালে চলতে শুরু করে। পাশ্চাত্যে তাই ঘটেছে। সেদিনকার পাস্‌পোর্টে তার যে ছবিটা ছিল সে ছবি আজ একেবারেই চলবে না।

সেই প্রথম বয়সে যখন ইংলন্‌ডে গিয়েছিলুম, ঠিক মুসাফেরের মতো যাই নি। অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বাহির থেকে চোখ বুলিয়ে যাওয়া বরাদ্দ ছিল না।— ছিলেম অতিথির মতো, ঘরের মধ্যে প্রবেশ পেয়েছিলুম। সেবা পেয়েছি, স্নেহ পেয়েছি, কোথাও কোথাও ঠকেছি— দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু তার পরে আবার যখন সেখানে গিয়েছি তখন সভায় থেকেছি, ঘরে নয়। আমার তৎপূর্বকালের অভিজ্ঞতা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ যদি বা না হয়, তবু সত্য। যে ডাক্তারের বাড়িতে ছিলুম তিনি ভদ্রশ্রেণীর এবং শ্রদ্ধেয়, কিন্তু সমুদয় ভদ্রশ্রেণীর প্রতীক তিনি না হতে পারেন। ইংলন্‌ডে আজও বর্ণসাম্য যতই থাক্‌, শ্রেণীভেদ যথেষ্ট। সেখানে এক শ্রেণীর সঙ্গে আর-এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি ও ব্যবহারের মিল না থাকাই স্বাভাবিক। সেদিনও নিঃসন্দেহ ছিল না। আমি সেদিনকার সাধারণ গৃহস্থ ঘরের এবং একটি বিলাসিনী-ঘরের পরিচয় কাছে থেকেই পেয়েছি। তার কিছু কিছু বর্ণনা চিঠিগুলির মধ্যে আছে।

কয়েকটি চিঠিতে তখনকার দিনের ইঙ্গবঙ্গের বিবরণ কিছু বিস্তারিত করেই দিয়েছি। আজ এরা লুপ্ত জীব। কোথাও কোথাও তার বর্তমান অভিব্যক্তির কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, এমন-কি যাঁরা বিলেতে যান নি তাঁদেরও কারও কারও চালে চলনে ইঙ্গবঙ্গী লক্ষণ অকস্মাৎ ফুটে ওঠে। সেকালের ইঙ্গ-বঙ্গদের অনেককে আমি প্রত্যক্ষ জানতুম তাঁদের অনেকখানি পরিচয় পেয়েছি তাঁদের নিজেরই মুখ থেকে। যদি এর মধ্যে কোনো অত্যুক্তি থাকে সে তাঁদেরই স্বকৃত। আমার সামনে বর্ণনায় নিজেদেরও বেআব্রু করতে ভয় পান নি, 'যেহেতু মুখচোরা ভালোমানুষ বালকটিকে তাঁরা বিপদ্‌জনক বলে সন্দেহ করেন নি। আজ তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। তাঁরা আছেন বৈতরণীর পরপারে।

আমার বিলাতের চিঠিতে 'এবার মলে সাহেব হব' গানটি উদ্‌ধৃত করেছিলেম। আমার স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ গানটি আমার রচনা বলে প্রচার করেছেন। তাতে অনামা রচয়িতার মান বেঁচে গেছে, কিন্তু আমার বাঁচে নি। আমার বিশ্বাস যথোচিত গবেষণা করলে আমার লেখা থেকে ওর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতেও পারে।

এই পত্রগুলি যখন লেখা হয়েছিল তার বারো বছর পরে আর-একবার বিলেতে গিয়েছিলেম। তখনো দেশের বদল খুব বেশি হয় নি। সেদিন যে ডায়ারি লিখেছি তাতে আছে আঁচড়-কাটা ছবি— এক্কাগাড়িতে চলতে চলতে আশেপাশে এক নজরে দেখার দৃশ্য।

বইগুলির পুনঃসংস্করণের মুখবন্ধে এই চিঠিখানি আপনাকে সম্বোধন করে লিখছি। তার কারণ, বিলেত সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক প্রশস্ত ও গভীর— সেই ভূমিকার উপর রেখে এই চিঠিগুলি ও ডায়ারির যথাযোগ্য স্থান নির্ণয় করতে পারবেন এবং ভুল ত্রুটি ও অতিভাষণের অপরিহার্যতা অনুমান করে ক্ষমা করাও আপনার পক্ষে কঠিন হবে না। ইতি ২৯ আগস্ট, ১৯৩৬

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ১৮০৩ শকাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়; 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' অনুযায়ী তৎকালীন বেঙ্গল লাইব্রেরি -কর্তৃক সংকলিত ও ক্যাল্‌কাটা গেজেটে মুদ্রিত প্রকাশকাল: ২৫ অক্টোবর ১৮৮১ খৃস্টাব্দ। 'হিতবাদীর উপহার' রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী-ভুক্ত হইয়া পুনরমুদ্রণ বাংলা ১৩১১ সনে। রবীন্দ্রশত-বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইহার নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল, ইহাকে সংশোধিত পুনরমুদ্রণও বলা চলে; পাদটীকাদির সন্নিবেশস্থান পূর্ব পূর্ব মুদ্রণের ন্যায় নহে, তাহা ছাড়া ইহা গ্রন্থপরিচয়-যুক্ত ও সচিত্র।

রবীন্দ্রনাথ আঠারো বৎসর বয়সে, ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ তারিখে, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত "পুনা" জাহাজে ইংলন্‌ড্‌-উদ্দেশে রওনা হন। ১৮৮০ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগেই দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। য়ুরোপ-যাত্রা ও ইংলন্‌ড্‌-প্রবাসের সেই অভিজ্ঞতাই 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' -সমূহে বর্ণিত হইয়াছে— 'কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই'।

এই গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ পরে কবি আর ইচ্ছা করেন নাই, এইজন্য ইহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে আর মুদ্রিত হয় নাই এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে 'হিতবাদীর উপহার রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র অঙ্গীভূত রূপে ইতিপূর্বে একবারই পুনরমুদ্রিত হইয়াছে। বহুকাল পরে 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' (আশ্বিন ১৩৪৩) গ্রন্থে পরিবর্তিত রূপে ইহা য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারির দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত প্রকাশিত হয়। উক্ত সম্পাদিত ও সার-সংকলিত পাঠ বর্তমানে প্রথম খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর অঙ্গীভূত আছে। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' পুনঃপ্রকাশে কবির অনভিপ্রায় ও পরে সম্মতির কারণ তিনি পাশ্চাত্যভ্রমণের ভূমিকায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন, প্রথম সংস্করণের ভূমিকার প্রথম কয় ছত্রেও সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রগুলি যখন ভারতীতে প্রকাশিত হয়, তখন কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভারতী-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রগুলির কোনো-কোনোটিতে প্রকাশিত মন্তব্যের বিশেষ সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পত্রগুলিতে 'ইঙ্গবঙ্গ'দের সম্বন্ধে যেমন কঠিন সমালোচনা ও ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, বিলাতের ধনীসমাজের মহিলাদের 'বিলাসিনী' শ্রেণীর সম্বন্ধে যেমন পরিহাস করিয়াছিলেন, বিদেশের তুলনায় দেশের সামাজিক রীতি

ও প্রথার (বিশেষতঃ স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব ও গুরুজনদের সহিত ব্যবহারের প্রচলিত রীতির) সম্বন্ধেও তেমনি বিরূপ মন্তব্য প্রকাশে বিরত হন নাই— ভারতী-সম্পাদক দেশীয় প্রথা ও রীতির সমর্থন এবং রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া টিপ্পনী প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী পত্রে তাহার উত্তর দেন। এইভাবে বাদ প্রতিবাদ চলিয়াছিল। প্রথম সংস্করণেও তাহা মুদ্রিত আছে এবং হিতবাদীর পুনর্মুদ্রণেও বর্জিত হয় নাই।

১৩৪৩ আশ্বিনে প্রচারিত 'পাশ্চাত্য-ভ্রমণ' গ্রন্থে ভারতী-সম্পাদকের মন্তব্যাদি-সহ সকল বাদপ্রতিবাদ সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে। তেমনি বিভিন্ন পত্রের—বিশেষতঃ ষষ্ঠ পত্রের— বহুলাংশ, সপ্তম পত্র, নবম পত্র ও দশম পত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রচারিত বর্তমান গ্রন্থে প্রথম সংস্করণ 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' অনুসৃত হইয়াছে। 'ভূমিকা'য় রবীন্দ্রনাথ যে শঙ্কা প্রকাশ করেন মুদ্রণকালে 'নিজে তদারক করিতে' না পারায় ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে, তাহা একেবারে অমূলক নয়। সংকলনকালে বহুশঃ বর্জন বা পরিবর্তন (যে-সব লেখকের ইচ্ছাকৃত) তাহা ছাড়াও এমন কতকগুলি 'পাঠভেদ' ঘটিয়াছে যাহা স্পষ্টই মুদ্রণপ্রমাদ বলিয়া বুঝা যায় ; এজাতীয় বহু মুদ্রণচ্যুতি 'ভারতী'র পাঠের সহিত মিলাইয়া বর্তমানে সংশোধন করা সম্ভব হইয়াছে। প্রধান প্রধান 'ছাড়' যাহা ঘটিয়াছিল এ স্থলে তাহার উল্লেখ থাকিলে রবীন্দ্ররচনার ভাবী পাঠভেদসংবলিত সংস্করণ -প্রণয়নের আনুকূল্য হইতে পারে। বর্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠা ও ছত্র -নির্দেশ-পূর্বক সেগুলি তালিকাবদ্ধ করা হইল।—

পৃ ৮৬, ছত্র ৭-৯ : আমাদের দেশের ··· ভাবের জন্ম,

পৃ ৯৪, নিম্ন হইতে ছত্র ৭-৬ : অনুরোধ করলেন, তিনি এই

পৃ ১১২, ছত্র ১২ : কেন

পৃ ১২৫, নিম্ন হইতে ছত্র ৯-৮ : ও স্ত্রীলোকদের ··· স্থান

পৃ ১৩৬, ছত্র ৬-৭ : ফিরে এলেন, স্ত্রীর কাছ থেকে

পৃ ১৬৬, শেষ ছত্র : তাহা হইলে ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইবে যে,

পৃ ১৯৬, ছত্র ১-২ : চার দিকে … চলেছি।

পৃ ২০১, নিম্ন হইতে ছত্র ৩ : আমার

উল্লিখিত তালিকার অনেকগুলি ‘ছাড়’ কেন ঘটিয়াছিল তাহা যে-কোনো মুদ্রণ-অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারিবেন মনে হয়।

‘ভারতী’ পত্রিকায় ও গ্রন্থে ‘পত্র’গুলি একই পারম্পর্যে প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থের অন্তর্গত কোন্ পত্র ‘ভারতী’র কোন্ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।—

প্রথম পত্র	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬
দ্বিতীয় পত্র	আষাঢ় ১২৮৬
তৃতীয় পত্র	শ্রাবণ ১২৮৬
	চতুর্থ পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদ ‘ভারতী’তে ইহার অঙ্গীভূত ভাবে ছাপা আছে।
চতুর্থ পত্র	ভাদ্র ১২৮৬
	পঞ্চম পত্রের সূচনা হইতে ‘একটা সমগ্র চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছি।’ পর্যন্ত (এই গ্রন্থে ৬১ পৃ. ২ ছত্র অবধি) ইহার অঙ্গীভূত।
পঞ্চম পত্র	অবশিষ্ট অংশ। আশ্বিন ১২৮৬
ষষ্ঠ পত্র	অগ্রহায়ণ ১২৮৬
সপ্তম পত্র	ফাল্গুন ১২৮৬
অষ্টম পত্র	কার্তিক ১২৮৬
নবম পত্র	পৌষ ১২৮৬
দশম পত্র	বৈশাখ ১২৮৭
একাদশ পত্র	জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭
দ্বাদশ পত্র	আষাঢ় ১২৮৭
ত্রয়োদশ পত্র	শ্রাবণ ১২৮৭

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে, ১৮০৩ শকে বা ১২৮৮ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রথম প্রকাশ-কালে, যে ‘উপহার’ (উৎসর্গপত্র) ও ‘ভূমিকা’

যুক্ত ছিল, বর্তমানে তাহা গ্রন্থসূচনায় পুনর্মুদ্রিত হইল ; ১৩৪৩ আশ্বিনের 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' গ্রন্থে সার-সংকলন-কালে পত্রাকারে রবীন্দ্রনাথ যে নূতন ভূমিকা রচনা করেন, তাহাতে প্রধানতঃ বর্তমান গ্রন্থের এবং তদ্‌বিষয়ীভূত প্রথম ইংলন্ড্-প্রবাসের কথাই আলোচিত হইয়াছে— 'শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত বন্ধুবরেষু' লেখা সেই পত্র গ্রন্থশেষে, তথা গ্রন্থপরিচয়ের অব্যবহিত পূর্বে সংকলন করা হইয়াছে।

—

প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক স্বপ্না প্রিণ্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণী। কলিকাতা ৯